নারীর ফাঁদ...
প্রখ্যাত সাহাবী হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা:)
এর বর্ণাঢ্য জীবনভিত্তিক ঐতিহাসিক উপন্যাস
নাঙ্গা তলোয়ার
১
এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-এর
বর্ণাঢ্য জীবনভিত্তিক ঐতিহাসিক উপন্যাস

নাঙ্গা তলোয়ার

(প্রথম খণ্ড)

মূল
এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

অনুবাদ
মাওলানা আলমগীর হোসাইন
উস্তাদ ঃ জামিয়াতুস সুন্নাহ
দক্ষিণকান্দি বাহাদুরপুর
শিবচর মাদারীপুর

মাকতাবায়ে এমদাদিয়া
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৭১-৩৭৮৫৩৩

তাঁদের উদ্দেশে নিবেদিত-

যাঁদের তাজা খুনে
ইসলামী বিশ্বের জন্ম;
আমরা মুসলমান... ।

ভূমিকা

'নাঙ্গা তলোয়ার'-এর প্রথম খণ্ড আপনার হাতে। দ্বিতীয় খণ্ডে (উর্দূ) এই ঈমানদীপ্ত দাস্তান সমাপ্ত হবে। হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) ইসলামের ঐ তলোয়ারের নাম যা কাফেরদের বিরুদ্ধে চিরদিন খোলা থাকে। হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাইফুল্লাহ "আল্লাহ্‌র তরবারী" উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি প্রাথমিক নাম করা ঐ সকল সেনাপতিদের অন্যতম যাঁদের অবদানে ইসলামের আলো দূর-দূরান্তে পৌঁছতে পেরেছে। শুধু ইসলামী ইতিহাস নয়; বিশ্ব সমরেতিহাসও হযরত খালিদ (রা.)-কে সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের কাতারে গণ্য করে থাকে। প্রখ্যাত সমরবিদ, অভিজ্ঞ রণকুশলী এবং স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞগণও হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-এর চাল, রণাঙ্গনের তুখোড় নেতৃত্ব এবং সমরপ্রজ্ঞা ও প্রত্যুৎপন্নমতীত্ব বিচক্ষণার উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন।

প্রতিটি ময়দানেই মুসলমান ছিল কম। কাফেরদের সংখ্যা কোথাও দ্বিগুণ, কোথাও তিনগুণ ছিল। ইয়ারমুকের যুদ্ধে রোম সম্রাটের সৈন্য এবং তার মিত্র গোত্রসমূহের সম্মিলিত সৈন্য ছিল ১ লাখ ৫০ হাজার। তাদের মোকাবেলায় মুসলিম সৈন্য ছিল মাত্র ৪০ হাজারের মত। শত্রুর সৈন্য সারি সুদূর ১২ মাইল প্রলম্বিত। এরমধ্যে কোথাও ফাঁক ছিল না। এর বিপরীতে মুসলমানরা শত্রুবাহিনীর দেখাদেখি নিজেদের সৈন্যদের ১১ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়। তাও প্রতি দু'জনের মাঝে যথেষ্ট ব্যবধান ছিল।

শত্রুসৈন্যের বিন্যাস্ততার সারিও বৃহদাকার ছিল। সৈন্যরা একের পর এক সাজানো ছিল। একজনের পিছনে আরেকজন দাঁড়ানো। যেন একটি প্রান্তের পিছে আরেক প্রান্ত খাঁড়া। এর বিপরীতে মুসলমানদের সৈন্য বিন্যাস্ততার গভীরতা ছিল না বললেই চলে।

ইতিহাস মুক। সমরবিশেষজ্ঞগণ বিস্মিত। সকলের অবাক জিজ্ঞাসা, ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলমানরা রোমীয়দের কিভাবে পরাজিত করল? রোমকদের সেদিন চূড়ান্ত পরাজয় ঘটেছিল। এ অবিশ্বাস্য ঘটনার পর বাইতুল মুকাদ্দাস পাকা ফলের মত মুসলমানদের ঝুলিতে এসে পড়েছিল।

এটা ছিল অভূতপূর্ব জঙ্গীচাল এবং সমর কুশলতার ফল। ইয়ারমুক যুদ্ধে হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) যে সফল চাল চেলেছিলেন আজকের উন্নততর রাষ্ট্রের সেনা প্রশিক্ষণে গুরুত্বের সাথে তা ট্রেনিং দেয়া হয়।

হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) এটা মানতে রাজি ছিলেন না যে, দুশমনের সৈন্যসংখ্যা বেশী হলে এবং তাদের রণসম্ভার অত্যাধুনিক ও উন্নত হলে আর মুসলমানরা সংখ্যায় কম হলে শত্রুর মুখোমুখী হওয়া উদ্বেগজনক ও আত্মঘাতী হবে। এমন ঘটনাও তার বর্ণাঢ্য জীবনে ঘটেছে যে, তিনি সরকারী নির্দেশ এড়িয়ে শত্রুর উপর আক্রমণ করে শ্বাসরুদ্ধকর বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন। এটা তাঁর প্রগাঢ় ঈমান এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের ফসল ছিল। ইসলাম এবং রাসূল (সা.)-এর প্রতি অগাধ ভালবাসার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ছিল।

হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-এর ব্যক্তিত্ব ছিল আরো অসাধারণ, নজিরবিহীন। যে কোন পাঠক শ্রোতাই তাতে চমৎকৃত হয়। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.) হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-কে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করলে তিনি একটুও বিচলিত কিংবা ভগ্নাহত হননি। খলিফার নির্দেশের সাথে সাথে সেনাপতির আসন থেকে নেমে গেছেন সাধারণ সৈনিকের কাতারে। সেনাপতি থাকা অবস্থায় যেমন শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করেছেন, সৈনিক অবস্থায় তার থেকে মোটেও কম করেননি। ইয়ারমুক যুদ্ধশেষে হযরত উমর (রা.) এক অভিযোগে হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-কে মদীনায় তলব করেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মদীনায় এসে উপস্থিত হন এবং আদালতের কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়ান। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সেনাপতির সাথে 'অসেনাপতিসুলভ' আচরণ করলেও হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-এর প্রতিক্রিয়া এমন শান্ত ছিল যে, হযরত উমর (রা.)-কে এরজন্য একটুও চাপের সম্মুখীন হতে হয় না। তিনি অবনত মস্তকে খলিফার নির্দেশ শিরোধার্য বলে মেনে নেন। প্রদত্ত শাস্তি অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেন।

হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) বরখাস্তের দরুন দুঃখিত হন ঠিকই কিন্তু তাই বলে খলিফার বিরুদ্ধে তিনি টুশব্দ করেননি। খলিফাকে ক্ষমতাচ্যুত করার কল্পনাও মাথায় আনেননি। নিজস্ব বাহিনী তৈরী করেননি। পৃথক রণাঙ্গন সৃষ্টি করেননি। তিনি এমন কিছু করতে চাইলে পুরো সেনাবাহিনী ছিল তাঁর পক্ষে। জাতির চোখে তিনি অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব এবং শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ইতিমধ্যে দু'টি বিশাল বিশাল সমরশক্তিকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়ায় তার জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচুম্বী। এক ছিল পরাক্রমশালী ইরানী শক্তি আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে অপর পরাক্রমশালী রোমক শক্তি। হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) তাদেরকে চরম নাকানি-চুবানি খাইয়ে পরাজিত করে ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমা ইরাক এবং সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও খেলাফতের প্রতি ছিল তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। তিনি খলিফার সিদ্ধান্তে রুখে দাঁড়ান না। তিনি নিজের সম্মান-মর্যাদার কথা বিবেচনা না করে মাননীয় খলিফার মর্যাদা সমুন্নত রাখেন।

হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-এর পরিচয়, ইসলামের প্রতি তাঁর অবদান এবং বর্তমান মুসলমানরা তাঁর থেকে কি আদর্শ গ্রহণ করতে পারে—বক্ষমাণ উপন্যাসে পাঠক তা মর্মে মর্মে অনুধাবন করবেন।

ইসলামী ইতিহাস অনেক সময় বাড়াবাড়ির সম্মুখীন হয়েছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক এবং জীবনীকার কোন কোন ঘটনায় পদস্খলনের শিকার হয়েছেন। একই ঘটনা একাধিকরূপে চিত্রিত হয়েছে। ফলে তা হতে সত্য ও বাস্তব তথ্য আহরণ পাঠকের জন্য গলদঘর্মের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।...

এ উপন্যাসের প্রত্যেকটি ঘটনা সত্য-সঠিকরূপে পেশ করতে আমরা বহু গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি, সম্ভাব্য যাচাই-বাছাই করেছি এবং অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তা লিখেছি। মাঝে মাঝে এমন স্থানে এসে হোচট খেয়েছি যে, কোন্‌টা বাস্তবভিত্তিক আর কোন্‌টা ধারণা নির্ভর—তা শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। সেক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য তথ্য-সূত্রের উপর ভিত্তি করে বাস্তবতা উদ্ধারের প্রয়াস পেয়েছি। এ কারণে মতান্তর ঘটবে; আর তা ঘটাই স্বাভাবিক। তবে এ মতবিরোধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং অপ্রসিদ্ধ ঘটনায় গিয়ে প্রকাশিত হবে মাত্র।

যে ধাঁচে এ বীরত্ব-গাঁথা রচনা, তার আলোকে এটাকে কেউ উপন্যাস বললে বলতে পারে কিন্তু এটা ফিল্মী স্টাইল এবং মনগড়া কাহিনী ভরপুর বাজারের অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের মত নয়। এর পাঠক উপন্যাসের চাটনীতে 'ঐতিহাসিকতার খাদ্য' গলধঃকরণ করবেন গোগ্রাসে। এতে ঐতিহাসিকতা বেশী, ঔপন্যাসিকতা কম।

এটা কেবল ইতিহাস নয়, ইসলামী ঐতিহ্যের অবয়ব। মুসলমানদের ঈমানদীপ্ত দাস্তান। পূর্বপুরুষদের গৌরব-গাঁথা এবং মুসলিম জাতির জিহাদী জযবার প্রকৃত চিত্র। পাঠক মুসলিম জাতির স্বকীয়তা জানবেন, সাহিত্য রস উপভোগ করবেন এবং উপন্যাসের শিহরণ অনুভব করবেন।

বাজারের প্রচলিত চরিত্রবিধ্বংসী উপন্যাসের পরিবর্তে সত্যনির্ভর এবং ইসলামী ঐতিহ্যজাত উপন্যাস পড়ুন। পরিবারের অপর সদস্যদের পড়ান। মানুষের হাতে হাতে তুলে দিন মুসলিম জাতির এ গৌরবময় উপখ্যান।

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ
লাহোর, পাকিস্তান।

প্রকাশকের কথা

ঔপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ এখন আর আমাদের কাছে অপরিচিত নন। নিয়মিত পাঠক মহলের কাছে এই নামটি যথেষ্টই পরিচিত। শুধু পরিচিতি ছিল না এই 'নাঙ্গা তলোয়ার' নামের বইটি। খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.)-এর নাম জানে না এমন মুসলমান পাওয়া দুস্কর। মুসলিম ইতিহাসে এই বীরের কীর্তিময় ইতিহাস কম বেশী সকলেরই জানা।

সেই ইতিহাস, সেইসব কীর্তিগাঁথা জানা অজানা সব তথ্য তুলে এনেছেন এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ এই 'নাঙ্গা তলোয়ার' বইটিতে।

হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) ছিলেন বিধর্মী। কিন্তু তাঁর হৃদয়, মন সবই ছিল সত্য পিপাসু। তিনি নিজের জ্ঞান, অনুসন্ধিৎসু মন সবই বিলিয়ে দিয়েছেন সত্যের অন্বেষণে। এক সময় ঠিকই তিনি সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন তথা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সান্নিধ্যে এসে কালেমা পড়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে নিজেকে ধন্য করেছিলেন।

এই বইটিতে সেই বীর সেনানীর জীবনীর সামান্য মাত্র আলতামাশ তাঁর দক্ষ শৈল্পিক হাতে তুলে ধরেছেন।

বইটি তাড়াহুড়ো করে পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ায় হয়তো কোন ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। স্বল্প সময়ে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি সুন্দর করতে। তবুও ভুল রয়ে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। পাঠকদের কাছে সবিনয় অনুরোধ আপনাদের দেয়া সঠিক তথ্য আমরা দ্বিতীয় সংস্করণে শোধরানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ্। পাঠকদের প্রতি আমাদের এই প্রত্যাশা।

মাওলানা মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম

২৪.০২.০৪ ইং

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বই

- মুজাহিদে আযম হযরতুল্ আল্লাম
- শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.)-এর প্রকাশিত অন্যান্য বই
- ভুল সংশোধন
- আদর্শ মুসলিম পরিবার
- তাছাউফ তত্ত্ব
- জীবন পাথেয়
- শত্রু থেকে হুঁশিয়ার
- হজ্জের মাসায়েল
- মসজিদ ও জীবন্ত মসজিদ
- হালাল হারাম
- অসৎ পীর ও অসৎ আলেম
- তারীখে মিল্লাত খেলাফতে বনু উমাইয়া
- নাঙ্গা তলোয়ার দ্বিতীয় খণ্ড

॥ এক ॥

মুসাফির আরব মরুর বুক চিরে একাকী চলছেন...। ৬২৯ খৃস্টাব্দ। ৮ম হিজরী। মক্কা এবং মদীনার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ মরু অঞ্চলটি রুক্ষ, ভয়ঙ্কর। পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। একে তো মরুভূমির স্বাভাবিক রূঢ়তা তারপরে আবার লুটেরা কর্তৃক সর্বস্ব লুটপাটের সার্বক্ষণিক আশঙ্কা। এ কারণে একাকী সফর করার সাহস কারো হত না। কাফেলা বা দল বেঁধে মুসাফিররা এ পথে যাতায়াত করত। কিন্তু এ মুসাফির ব্যতিক্রম। তিনি একাকী চলছেন। উন্নত জাতের তাজি ঘোড়ায় সমাসীন। ঘোড়ার জিনের সাথে তার বর্মটি বাঁধা। কোমরে ঝুলানো তরবারী। হাতে ধরা বর্শা।

আগেকার যুগে পুরুষেরা দৈহিক দিক দিয়ে উঁচু-লম্বা, প্রশস্ত বক্ষ এবং ভারী শরীর বিশিষ্ট হত। এ নিঃসঙ্গ পুরুষ মুসাফিরও তার ব্যতিক্রম ছিল না। তবে তাঁর অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণের ভঙ্গিই বলে দিচ্ছিল, ইনি একজন বীর যোদ্ধা। কোন সাধারণ ব্যক্তি নন! লুটেরা আক্রমণ করতে পারে এমন কোন আশঙ্কাই তাঁর চেহারায় প্রতিভাত হচ্ছিল না। তাঁর মধ্যে ন্যূনতম এ ভীতিও ছিল না যে, যে কোন সময় তাঁর উন্নত জাতের ঘোড়াটি ছিনতাই হয়ে যেতে পারে আর তাঁকে পায়ে হেঁটেই বাকী পথ পাড়ি দিতে হবে। তাঁর চেহারায় ক্ষণে ক্ষণে একটি অস্বাভাবিক অবস্থা উঠানামা করছিল। তিনি ছিলেন চিন্তামগ্ন। হয়ত অতীতের স্মৃতি মন্থন করে ফিরছিলেন নতুবা কিছু স্মৃতি ভুলে যাবার জোর চেষ্টা করছিলেন।

মুসাফির ইতিমধ্যে একটি পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌছেন। তাঁকে বহনকারী ঘোড়াটি পাহাড় কেটে উপরে উঠতে থাকে। কিছুদূর গিয়ে আবার সমতল পথ শুরু হয়। আরোহী এখানে এসে হঠাৎ গোড়ার লাগাম টেনে ধরেন এবং ঘোড়া পশ্চাৎমুখী করেন। ঘোড়ার পিঠে থেকেই তিনি পিছনে ফিরে চান। পিছনে ফেলে আসা মক্কা দর্শনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু মক্কা দেখা যায় না। অনেক আগেই দূরের মেঘের আড়ালে সে নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছিল।

"আবু সুলাইমান! পিছে তাকিও না। মক্কার কথা সম্পূর্ণ ভুলে যাও। তুমি একজন বীর যোদ্ধা। নিজেকে দু'ভাগে কেটে বিভক্ত করো না। নিজ সিদ্ধান্তের উপর অটল-অবিচল থাক। তোমার মঞ্জিল-অভীষ্ট লক্ষ্য এখন মদীনা।" এ ধরনের আওয়াজ এ সময় তাঁর কানে ভেসে আসতে থাকে বারবার।

তিনি মক্কার দিক হতে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেন। ঘোড়াকেও মদীনামুখী করেন। যথানিয়মে অশ্বের বাগে মৃদু ঝাঁকি দেন। ঘোড়া ছিল সুশিক্ষিত ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত। প্রভুর ইশারা পেয়েই সে ধূলিঝড় উড়িয়ে ছুটতে শুরু করে।

ইতিহাসখ্যাত এ মুসাফিরের বয়স ৪৩। কিন্তু বয়সের তুলনায় তাকে বেশী যুবক দেখাচ্ছিল। 'সুলায়মান' তাঁর পুত্রের নাম। পিতার নাম ওলীদ। তবে 'খালিদ বিন ওলীদের' তুলনায় 'আবু সুলাইমান' ডাকটা তাঁর কাছে বেশী প্রিয় ছিল। তাঁর জানা ছিল না যে, ইতিহাস তাঁকে 'খালিদ বিন ওলীদ' নামে স্মরণ রাখবে এবং এই নামটি ইসলামের অন্যতম গৌরব গাঁথা ও জিহাদী অনুপ্রেরণার উৎসে পরিণত হবে।

৪৩ বছর বয়স্ক হযরত খালিদ মদীনা পানে চলছেন। এখনো তিনি মুসলমান হননি। ইতিমধ্যে ছোট-খাটো আক্রমণসহ উহুদ এবং খন্দক নামক দু'টি বড় যুদ্ধে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন। যুদ্ধ করেছেন অমিততেজে, বীরবিক্রমে। অপূর্ব রণকৌশলে।

৬১০ খৃস্টাব্দে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম ওহী লাভকালে হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) এর বয়স ছিল মাত্র ২৪। দুরন্ত টগবগে এক যুবক। যৌবনের আভা সারা দেহে প্রতিভাত ছিল। এ সময়েই তিনি স্বীয় গোত্র বনু মাখযুমের সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন। কুরাইশের অন্যান্য সম্ভ্রান্ত গোত্রসমূহের মধ্যে বনু মাখযুম ছিল অন্যতম। কুরাইশদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনা এই গোত্রেরই অধীনে ছিল। কুরাইশ জাতি হযরত খালিদের পিতা ওলীদের নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত মেনে চলতো। ২৪ বছর বয়সী খালিদ নিজ যোগ্যতা ও দক্ষতাবলে পিতার ন্যায় কুরাইশ জাতির শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জন করেন। কিন্তু এই বিরাট সামাজিক মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে বরং তা চিরতরে বর্জন করে হযরত খালিদ আজ মদীনার পানে ধাবমান।

দীর্ঘ পথ অতিক্রমকালে কখনো তাঁর মনে হত, একটি অদৃশ্য শক্তি যেন পশ্চাৎ থেকে তাকে টেনে ধরছে। যখন এই শক্তির উপস্থিতি তাঁর অনুভূত হত তখন তিনি ঘাড় ফিরিয়ে পিছে চাইতেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ দেহাভ্যন্তর থেকে আরেকটি আওয়াজ তিনি শুনতে পেতেন, "খালিদ! পিছে নয়, সামনে তাকাও।

মনে রেখো, তুমি যদিও ওলীদের পুত্র কিন্তু এখন সে মৃত। এখন তুমি সুলাইমানের পিতা। আর সে জীবিত।"

তাঁর স্মৃতির পর্দায় দু'টি নাম বারবার ভেসে উঠতে থাকে। ১. মুহাম্মাদ (সা.); যিনি এক নতুন ধর্মমতের সূচনা করেছেন। ২. ওলীদ; যে একদিকে তাঁর পিতা এবং অপরদিকে মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর নয়া ধর্মমতের কট্টর শত্রু ছিল। পিতা উত্তরাধিকার হিসেবে এই শত্রুতা হযরত খালিদ (রা.)-এর দায়িত্বে অর্পণ করে মৃত্যুবরণ করে।

হযরত খালিদ (রা.)-এর ঘোড়াটি দূরে পানির কূপ দেখে সেদিকে চলতে থাকে। তিনি ঘোড়ার গমন পথে দৃষ্টি প্রসারিত করেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্থানটি পর্যবেক্ষণ করেন। বৃত্তকায় একটি এলাকায় কিছু খর্জুর বৃক্ষ আর ইতস্তত কতক মরুকাণ্ড তাঁর গোচরীভূত হয়। ঘোড়ার গতি ছিল সেদিকেই।

খর্জুর বীথিকায় পৌছে হযরত খালিদ (রা.) ঘোড়া থেকে অবতরণ করেন। মাথার পাগড়ী খুলে কূপের নিকটে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েন। কোষ ভরে পানি উঠিয়ে মাথায় দেন। দু'চার ঝাপটা মুখেও দেন। তৃষ্ণার্ত ঘোড়াটিও ছাতি ভরে পানি পান করছিল। হযরত খালিদ (রা.) মানুষের ব্যবহারযোগ্য একটি ঝর্ণা থেকে পানি পান করেন। সব মিলিয়ে এটি একটি ছোট জঙ্গল ছিল। হযরত খালিদ (রা.) ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন নামিয়ে রাখেন। জিনের সাথে বাঁধা ক্ষুদ্র কার্পেটটি খুলে একটি বড় বৃক্ষের নিচে বিছিয়ে তার উপর শুয়ে পড়েন।

॥ দুই ॥

তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। একটু ঘুমাতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু পারলেন না। স্মরণীয় মুহূর্তগুলো দল বেঁধে একের পর এক তার স্মৃতিতে উপস্থিত হতে লাগল। শুধু চোখই যা বুজে রইলেন। ঘুম এলোনা একটুও। সাত বছর পূর্বের একটি ঘটনা তাঁর বিশেষভাবে মনে পড়ে যায়। তাঁর গোত্রের লোকেরা মুহাম্মাদ (সা.)-কে হত্যার নীলনক্সা প্রণয়ন করেছিল। কুটিল ষড়যন্ত্র এঁটেছিল। এ পরিকল্পনা প্রণয়নে তাঁর পিতার ভূমিকা ছিল অন্যতম।

৬২২ খৃস্টাব্দের এক গভীর রজনী। কুরাইশরা আল্লাহ্র রাসূল (সা.)-কে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যার জন্য কতক লোক নিয়োগ করে। এদের সবাই ছিল মানুষরূপী পশু। হিংস্র, নিষ্ঠুর। হযরত খালিদ (রা.) কুরাইশদের প্রভাবশালী গোত্রের সন্তান ছিলেন। এ সময় তাঁর বয়স ২৭। তিনিও রাসূল হত্যার ষড়যন্ত্রে শরীক ছিলেন কিন্তু হত্যাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। দীর্ঘ সাত বছর পূর্বের অতীত রাতটির কথা গতকালের রাতের মত তাঁর মনে জেগে আছে। তিনি এ

হত্যাকাণ্ডের প্রতি এক দৃষ্টিকোণ থেকে সন্তুষ্ট থাকলেও অপর দৃষ্টিকোণ থেকে ছিলেন বেজায় নাখোশ। সন্তুষ্টির কারণ হল, তাঁরই গোত্রের এক ব্যক্তি তাদের ধর্মবিশ্বাস, মূর্তিপূজার সমালোচনা ও তাকে বাতিল আখ্যা দিয়ে নিজেকে আল্লাহ্‌র নবী বলে দাবী করে আরব সমাজ ও তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের শত্রুতে পরিণত হয়েছিলেন। এরূপ শত্রুর হত্যায় কে না খুশী হয়?

পক্ষান্তরে অখুশীর কারণ হলো, তিনি প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে শত্রুকে সামনা-সামনি হত্যায় বিশ্বাসী ছিলেন। এভাবে গুপ্তহত্যা ছিল তাঁর ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিরোধী। তারপরেও তিনি এর বিরোধিতা করেন না। গুপ্তহত্যাকারীরা যে রাতে রসূল (সা.)-এর গৃহে হানা দেয় সে রাতে তিনি সেখানে ছিলেন না।[১] গৃহস্থ আসবাবপত্রও ছিল না। ঘোড়া, উট কিছুই ছিল না। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ হত্যাকারীদের পাঠিয়ে অনেক দিন পর এ আশায় গভীর ঘুমে হারিয়ে যায় যে, আগামীকাল সকালের প্রথম শিরোনাম হবে 'মূর্তিপূজার সমালোচক ও নতুন ধর্মমতের প্রবর্তক নিহত'। কিন্তু পরের সকাল তাদের জন্য কোন সুসংবাদ বয়ে আনে না। তিক্ত হলেও এক চরম দুঃসংবাদ তাদের গলাধঃকরণ করতে হয়। হতাশা ছড়িয়ে পড়ে সারা মক্কায়। নিরাশার আবরণ পড়ে সকলের চোখে-মুখে। চরমভাবে ব্যর্থ হয় তাদের জঘন্য ষড়যন্ত্র। পাছে মানুষ ব্যর্থতার সমালোচনা করে এই ভয়ে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। পরস্পর সাক্ষাতে শুধু এতটুকুই কানাকানি করে যে—"মুহাম্মাদ গেল কোথায়?"

এদিকে ঘটনা এই হয়েছিল যে, নবী করীম (সা.) হত্যার নির্দিষ্ট ক্ষণের অনেক পূর্বেই ওহী মারফৎ 'হত্যা-ষড়যন্ত্র' সম্পর্কে অবগত হয়ে মক্কা থেকে ইয়াসরিবে (মদীনায়) হিজরতের উদ্দেশে রওনা হন। প্রভাত পর্যন্ত অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

সাত বছর পর আজ হযরত খালিদও মদীনায় যাচ্ছেন। তাঁর স্মৃতিজুড়ে এখন মুহাম্মাদ (সা.)-এর অবস্থান। অথচ উহুদ যুদ্ধে তিনি হুবল ও উযযা দেব-দেবীর প্রধান দুশমন মুহাম্মাদ (সা.)-কে হত্যার প্রাণান্তক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু রাসূল (সা.) আহত অবস্থায় তাঁর নাগপাশ এড়াতে সক্ষম হন। ফলে তাঁর চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

টীকা ঃ ১. অন্যান্য সীরাত ও ইতিহাস গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, এ রাতে নবী করীম (সা.) নিজ বাসভবনেই ছিলেন। কিন্তু সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করে মাটিতে ফুঁ দিয়ে হত্যাকারীদের দিকে উড়িয়ে দেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে তাদের সামনে দিয়েই বেরিয়ে যান। কিন্তু তারা তাঁকে দেখতে পারে না।

-অনুবাদক

হযরত খালিদ (রা.)-এর স্মৃতির পর্দা দ্রুত উঠানামা করছিল। সব ক'টি পর্দা ছিল অতীত ঘটনা-দৃশ্যে ভরপুর। স্মৃতির মণিকোঠায় সবই ছিল সংরক্ষিত। একটু অবসর পেয়ে এসব অতীত স্মৃতি এক এক করে তার সামনে বর্তমান ও মূর্তমান হয়ে উঠতে থাকে। এক পর্যায়ে স্মৃতি তাকে নিয়ে দাঁড় করায় ১৬ বছর পূর্বের একটি ঘটনা ও দৃশ্যের সামনে। তাঁর স্পষ্ট মনে পড়ে ৬১৩ খৃস্টাব্দের এক অপরাহ্নে নবী করীম (সা.) কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে তাঁর বাসভবনে এক প্রীতি ভোজানুষ্ঠানে দাওয়াত দেন। ভোজন পর্ব সমাপ্তির পর নবী করীম (সা.) আগত মেহমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন ঃ

"বনু আব্দুল মুত্তালিবের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ! আমি আপনাদের সামনে যে উপঢৌকন পেশ করে চলেছি (অর্থাৎ ইসলামের প্রতি যে আহ্বান করে যাচ্ছি) সমগ্র আরবের আর কেউ তা পেশ করতে পারবে না। আল্লাহ্ পাক এর জন্য আমাকে নির্বাচিত করেছেন। তিনি আমাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি আপনাদেরকে যেন এমন এক ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি আহ্বান করি, যা আপনাদের ইহকালের সাথে সাথে পরকালের জীবনকেও আনন্দময় ও সাফল্যমণ্ডিত করবে।"

ওহী অবতীর্ণের ৩ বছর পর এটা ছিল নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের প্রতি নবী করীম (সা.)-এর সর্বপ্রথম দাওয়াতী আহ্বান। হযরত খালিদ (রা.) এ অনুষ্ঠানে শরীক ছিলেন না। তাঁর পিতা ছিল আমন্ত্রিত মেহমান। পিতাই তাঁকে তাচ্ছিল্য ভরে জানিয়েছিল যে, আব্দুল মুত্তালিবের পৌত্র মুহাম্মাদ দাবী করছে যে, সে নাকি আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী!

"আমরা স্বীকার করি যে, আব্দুল মুত্তালিব কুরাইশদের একজন প্রভাবশালী নেতা ছিলেন।" ওলীদ পুত্র খালিদকে লক্ষ্য করে বলছিল—"নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ অভিজাত বংশের সন্তান। কিন্তু তাই বলে নবুওয়াতের মত বিষয়ের দাবী এই বংশের লোক করবে কেন? আল্লাহ্‌র শপথ! হুবল ও উযযার কসম! আমার বংশের মর্যাদা কারো থেকে কম নয়। নবুওয়াতের দাবী করে কেউ আমাদের থেকে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে-এটা কিছুতেই হতে পারে না।"

"আপনি তাকে কি বললেন?" হযরত খালিদ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন।

"প্রথমে আমরা নীরব থাকলেও পরে সবাই তার দাবী হেসে উড়িয়ে দিই।" ওলীদ বলছিল—কিন্তু মুহাম্মাদের চাচাত ভাই আলী বিন আবু তালেব মুহাম্মাদের নবুওয়াত মেনে নেয়।" তাঁর পিতার সে বিদ্রূপাত্মক হাসি হযরত খালিদের স্পষ্ট মনে পড়ে।

৬২৯ খৃস্টাব্দের আরেক দিনের ঘটনা। হযরত খালিদ (রা.)-এর হৃদয়ের পর্দায় ভেসে ওঠে। সেদিনও তিনি মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী খেজুর বাগানে শায়িত ছিলেন। নবী করীম (সা.)-এর নবুওয়াত ও রেসালাত নেতৃপর্যায়ের লোকেরা মেনে না নিলেও অন্যান্যরা তার ঠিকই স্বীকৃতি দিচ্ছিল। এদের অধিকাংশ যুবক শ্রেণীর। কতক নিঃস্ব-গরীব লোকও ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এতে নবী করীম (সা.)-এর হিম্মত আরো বেড়ে যায়। তিনি ইসলামের প্রচার-প্রসার আরো তীব্রতর করেন। মূর্তিপূজার তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। মুসলমানগণ কা'বা গৃহের বাইরে ও ভিতরে স্থাপিত ৩৬০ টি মূর্তির অসারতা ও নিন্দামন্দ করতেন।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব জাতি এক আল্লাহকে মানলেও অগণিত মূর্তির পূজাও করত। পুরুষরূপীগুলোকে 'দেব' আর নারীরূপীগুলোকে 'দেবী' হিসেবে স্মরণ করত এবং তাদেরকে আল্লাহ্র পুত্র-কন্যা মনে করত। আরবেরা কথায় কথায় আল্লাহ্র শপথ করত।

শত বাধার পরও ইসলামের ক্রমোন্নতি দেখে কুরাইশরা আক্রোশে ফেটে পড়ে। ইসলামের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং মুসলমানদের অস্তিত্বকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। হযরত খালিদের একথাও মনে পড়ে যায় যে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল (সা.)-কে মক্কার অলি-গলি এবং শহর-নগরে মানুষ সমবেত করে ইসলামের দাওয়াত দিতে এবং এ কথা বলতে দেখেন যে, মূর্তি তাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। ইবাদাতের উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি এক, অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। কাউকে তিনি তাঁর ইবাদাতের মাধ্যমও বানাননি।

নবী করীম (সা.)-এর বিরোধিতার নেতৃত্ব দিচ্ছিল চার শীর্ষ কুরাইশ নেতা। ১. হযরত খালিদের পিতা ওলীদ। ২. রাসূল (সা.)-এর আপন চাচা আবু লাহাব। ৩. আবু সুফিয়ান ও ৪. হযরত খালিদের চাচাত ভাই আবুল হিকাম। মুসলমানদের প্রতি নির্যাতন-নিপীড়নের শ্রেষ্ঠ রেকর্ডটি এই নরাধম পাপীষ্ঠেরই দখলে ছিল। ইসলাম বিদ্বেষ ও মুসলিম নিধনে তার বর্বরতা ও জঘন্য আচরণ মূর্খতার স্তর ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ফলে মুসলমানরা তার নাম দেয় আবু জাহল্। এ নাম এত ব্যাপকতা লাভ করে যে, মানুষের হৃদয়ের পাতা থেকে তার প্রকৃত নামটি ধুয়ে-মুছে যায়। সবচে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এই উঁচু-লম্বা, মোটা-তাজা এবং লৌহবৎ দেহবিশিষ্ট লোকটি ইতিহাসেও 'আবু জাহল' নামেই স্থান পায়।

॥ তিন ॥

অতীতের এ স্মৃতিগুলো হযরত খালিদ (রা.)-কে অস্থির করে তুলছিল। সম্ভবত ভিতরে ভিতরে তিনি অনুশোচনায় দগ্ধও হচ্ছিলেন। কুরাইশরা একাধিকবার তাঁর বাসভবনে নাপাকী মল-মূত্র ছুঁড়ে মারে। যেখানেই কোন মুসলমান দাওয়াতী কাজ করত, সেখানেই কুরাইশরা উপস্থিত হয়ে হৈ চৈ জুড়ে দিত। বেয়াদবি ও শোরগোল করে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-কে বাধাদান ও কষ্ট দিত।

হযরত খালিদ (রা.) এ ব্যাপারে পূর্ণ আশ্বস্ত ছিলেন যে, তার পিতা মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি এ ধরনের কোন অসৌজন্যমূলক ও ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করেননি। সর্বোচ্চ ভূমিকা তার এই ছিল যে, সে দু'বার কুরাইশদের তিন-চার নেতাকে সাথে নিয়ে রাসূল (সা.)-এর চাচা আবু তালেবের নিকট গিয়ে তাকে এই মর্মে সতর্ক করে যে, তিনি যেন স্বীয় ভাতিজাকে মূর্তির সমালোচনা এবং ইসলামের দাওয়াত থেকে বিরত রাখেন। নতুবা সে কারো হাতে কতল হয়ে যেতে পারে। আবু তালেব দু'বারই তাদেরকে ফিরিয়ে দেন। তাদের দাবী গ্রাহ্য করেননি।

হযরত খালিদ (রা.)-এর মনে পড়ে যায় তাঁর পিতার ত্যাগ ও কুরবানীর কথা। আম্মারা নামে হযরত খালিদ (রা.)-এর একজন সুদর্শন টগবগে যুবক ভাই ছিল। সে ছিল যেমনি মেধাবী তেমনি সৌখিন ও বিলাসপ্রিয়। হযরত খালিদ (রা.)-এর পিতা ওলীদ তার এই সোনার চাঁদ ছেলে আম্মারাকে দুই কুরাইশ নেতার হাতে তুলে দিয়ে বলে, একে মুহাম্মাদ এর চাচা আবু তালিবের কাছে নিয়ে গিয়ে বল, ওলীদের পুত্রটি দিয়ে গেলাম, তার বদলে মুহাম্মাদকে আমাদের হাতে তুলে দিন।

সেদিন হযরত খালিদ (রা.) তাঁর পিতার সিদ্ধান্তের কথা শুনে ভীষণ কেঁপে ওঠেন এবং যখন তাঁর ভাই আম্মারা দুই কুরাইশ নেতার সাথে চলে যায় তখন তিনি নিভৃতে গিয়ে খুব ক্রন্দন করেন।

"আবু তালেব।" দুই নেতা আম্মারাকে রাসূল (সা.)-এর চাচা আবু তালিবের সামনে উপস্থিত করে বলে—"যুবকটিকে নিশ্চয় তুমি চেন। এ আম্মারা বিন ওলীদ। তোমার এটাও অজানা নয় যে, তোমার নেতৃত্বাধীন হাশেম বংশে এর মত জ্ঞানী ও বিচক্ষণ পুত্র একটিও নেই। একে সারা জীবনের জন্য তোমার হাতে তুলে দেয়ার জন্য এসেছি। পুত্র হিসেবে গ্রহণ করলে সে জীবনভর তোমার অনুগত হয়ে থাকবে। আর গোলাম হিসেবে গ্রহণ করলেও আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলতে পারি, সে তোমার জন্য জীবন উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিত হবে না।"

"কিন্তু আগে তো বল তোমরা তাকে কেন আমার হাতে তুলে দিচ্ছ?" আবু তালেব উৎসুক হয়ে জানতে চাইলেন—"মাখযুম গোত্রের মায়েরা কি সন্তান নিলাম দিতে শুরু করেছে?...বলো, এর বিনিময়ে কত মূল্য চাও?"

"তার বিনিময়ে তোমার ভাতিজাকে দিয়ে দাও" এক নেতা বলে—"নিঃসন্দেহে ভাতিজা তোমার অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে তোমার পিতৃপুরুষের ধর্ম প্রত্যাখ্যান করে নতুন ধর্মের অবতারণা করেছে। দেখছো না, সে গোত্রের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে পরস্পরকে শত্রুতে পরিণত করেছে?"

"ভাতিজাকে নিয়ে তোমরা কি করবে?" আবু তালিব জানতে চাইলেন।

"কতল-হত্যা।" দ্বিতীয় নেতা জবাবে বলে—"আমরা মুহাম্মাদকে হত্যা করব। এটা অবিচার কিংবা কোনরূপ অসঙ্গত হবে না। কেননা ভাতিজার পরিবর্তে আমরা তোমাকে নিজেদের সন্তান দিচ্ছি।"

"এটা অত্যন্ত অসঙ্গত প্রস্তাব।" আবু তালিব বলেন—"তোমরা আমার ভাতিজাকে নিয়ে হত্যা করবে আর আমি তোমাদের সন্তান প্রতিপালন করব, তার পিছে অর্থ ব্যয় করব এবং তার সুন্দর জীবন গড়ে দিব! তোমরা আমার কাছে এ কেমন বেমানান প্রস্তাব নিয়ে এসেছো?... সম্মানের সাথে আমি তোমাদের বিদায় দিচ্ছি।

হযরত খালিদ (রা.) নেতৃদ্বয়ের সাথে ভাইকে ফিরে আসতে দেখে এবং এ বিনিময় প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় তিনি সেদিন মনে মনে বড্ড খুশী হয়েছিলেন।

॥ চার ॥

"আবু সুলাইমান! মুহাম্মাদকে তুমি কি মনে করেছ?" হযরত খালিদ (রা.)-এর ভিতর থেকে একটি প্রশ্ন উত্থিত হয়। তিনি চিন্তার জগতে থেকেই মাথা নাড়ান এবং মনে মনে বলেন—"কিছু নয় ... এটা অনস্বীকার্য যে, মুহাম্মাদ (সা.)-এর শরীরে বিরাট শক্তি আছে। কিন্তু তাই বলে রিকানা বিন আব্দে ইয়াযিদের মত বাহাদুরকে উঁচু করে আছাড় দেয়ার জন্য শারীরিক শক্তিই কখনো যথেষ্ট হতে পারে না।

রিকানা নবী করীম (সা.)-এর চাচার নাম। সে তখনো অমুসলিম ছিল। বাহাদুর হিসেবে তার খ্যাতি ছিল সারা আরব জুড়ে। বিভিন্ন সময়ে অনেক বীর বাহাদুর তাকে চ্যালেঞ্জ করেছে। কিন্তু কেউ তার সামনে টিকতে পারেনি। প্রত্যেককে দুগ্ধপোষ্য বাচ্চার ন্যায় পাঁজাকোলা করে এমন আছাড় দেয় যে, তারা আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। সে ছিল অত্যন্ত দুর্ধর্ষ। লড়াই-মারামারিই ছিল তার পেশা।

হযরত খালিদ (রা.)-এর স্পষ্ট মনে পড়ে যে, একদিন মুসলিম বিদ্বেষী ৩/৪ জন লোক রিকানাকে খুব পানাহার করিয়ে বলে যে, তোমার ভাতিজা কারো কথায় কর্ণপাত করে না। কাউকে মানে না। সে কাউকে ভয় করে না। ইসলামের প্রচার-প্রসার থেকে বিরতও হয় না। মানুষ তার কথার জাদুতে শুধু ফেঁসে যাচ্ছে। তাকে একটু শায়েস্তা করতে পার?"

"তোমরা আমার হাতে তার হাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ করাতে চাও?"

রিকানা চেহারা কিঞ্চিৎ বিকৃত করে অহমিকার স্বরে লোকদেরকে লক্ষ্য করে বলে—"তাকে আমার মোকাবেলায় এনে দাঁড় করাও তো...। সে আমার নাম শুনলেই মক্কা থেকে পলায়ন করবে। না, না; তার সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়াকে আমি নিজের জন্য বদনামের কারণ মনে করি।"

রিকানা প্ররোচকদের কথায় সাড়া দেয় না। বস্তুত সে কাউকেও নিজের সমকক্ষ বলে স্বীকার করত না। রিকানাকে রাজি করাতে না পেরে মুসলিম বিদ্বেষীরা চুপসে যায়। কিন্তু তাই বলে আশা ছাড়ে না। যে কোন উপায়ে রিকানার হাতে রাসূল (সা.)-কে পরাভূত করে তাঁকে শায়েস্তা করতে বদ্ধপরিকর। মক্কার ইহুদীরা ছিল নবী করীম (সা.)-এর ভয়ঙ্কর দুশমন। কিন্তু তারা কখনো প্রকাশ্যে দুশমনী করত না। মনে মনে কুরাইশদের বিভক্তি ও তাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করতে চাইত। তাদের কানে এ খবর পৌঁছে যায় যে, কুরাইশদের কিছু লোক রাসূল (সা.)-এর সাথে কুস্তি লড়তে রিকানাকে উত্তেজিত করছে, কিন্তু সে রাজি হচ্ছে না।

এর কিছুদিন পর এক রাতে মক্কার এক গলি দিয়ে রিকানা যাচ্ছিল। তার একেবারে গা ঘেঁষে অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারিণী এক ষোড়শী কন্যা অতিক্রম করে। চাঁদনী রাতে মেয়েটি রিকানাকে চেনে এবং মুচকি হাসি দেয়। রিকানা ছিল বর্বর। সে নিজেও থেমে যায় এবং মেয়েটিরও পথ রোধ করে দাঁড়ায়।

"তুমি কি জান না, কোন নারী পুরুষের দিকে চেয়ে মুচকি হাসলে তার অর্থ কি দাঁড়ায়?" রিকানা বাহাদুর তার প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বলে "তুমি কে সুন্দরী? তোমার পরিচয়ইবা কি?"

"তার অর্থ হল, নারীটি এ পুরুষকে কাছে পেতে চায়।" যুবতী জবাবে বলল—"আমি আরমানের কন্যা সাবত।"

"ওহ্...আরমান ইহুদীর মেয়ে?" রিকানা একথা বলতে বলতে যুবতীর কাঁধে হাত রেখে তাকে কাছে টেনে বলে—"আমার শরীর কি তোমার এতই প্রিয়? আমার শক্তি কি ...।"

"তোমার শক্তি আমাকে নিরাশ করেছে।" রিকানার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তার কাছ থেকে সরে যেতে যেতে সাবত বলে—"তোমার ভাতিজা মুহাম্মাদকে তুমি ভয় কর জানি।"

"কে বলে এমন কথা?" রিকানা গর্জে উঠে জিজ্ঞাসা করে।

"সকলেই বলে।" সাবত বলে—"প্রথমে মুহাম্মাদকে পরাজিত করে দেখাও। আমার দেহটা তোমাকে উপহার হিসেবে প্রদান করব।"

"খোদার পুত্র এবং কন্যাদের শপথ! তোমার দাবী পূরণ করে তবেই তোমার সামনে এসে দাঁড়াবো।" রিকানা বলে—"তবে এটা বাস্তব যে, 'আমি মুহাম্মাদকে ভয় করি বলে যে কথা তুমি শুনেছ তা সম্পূর্ণ ভুল। আসল কথা হলো, আমার চেয়ে দুর্বলের সাথে লড়াকে আমি নিজের জন্য অপমানজনক মনে করি। তবে এখন আমার এর পরোয়া নেই। তোমার দাবী পূরণ করবই।"

॥ পাঁচ ॥

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে হিশামের অভিমত, রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং রিকানাকে কুস্তি লড়ার জন্য আহ্বান করেন। কিন্তু অপর ঐতিহাসিক ইবনুল আছীর নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রিকানাই সর্বপ্রথম নবী করীম (সা.)-কে কুস্তি লড়ার জন্য আহ্বান করে এবং তাঁকে একথাও বলে যে—"ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি বড় হৃদয়বান এবং সাহসী। জানি তুমি মিথ্যা বলাকে ঘৃণা কর। কিন্তু মানুষের বাহাদুরী আর সততার বাস্তব প্রমাণক্ষেত্র হল লড়াইয়ের ময়দান এবং কুস্তিমঞ্চ। কুস্তির মঞ্চে আস। আমাকে পরাভূত ও ভূপাতিত করতে পারলে তোমাকে আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী বলে মেনে নিব। খোদার শপথ করে বলছি, তোমার ধর্ম কবুল করব।"

"এটা চাচা-ভাতিজার লড়াই হবে না।" নবী করীম (সা.) রিকানার আহ্বানের জবাবে বলেন—"এক মূর্তিপূজক বনাম এক সত্য নবীর লড়াই হবে। দেখ, হেরে গিয়ে যেন আবার ওয়াদার কথা ভুলে না যাও।"

মরুভূমির আঁধারের মত মক্কার সর্বত্র এ খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, মহা কুস্তিগীর রিকানা বনাম মুহাম্মাদের মধ্যে কুস্তি হবে। এতে বিজিত ব্যক্তি বিজয়ীর ধর্ম গ্রহণ করবে। নির্দিষ্ট ক্ষণে মক্কার ছোট-বড়, নারী-পুরুষ এবং ইহুদীরা কুস্তিমঞ্চের কাছে এসে প্রচণ্ড ভীড় জমাতে থাকে। সবাই অপেক্ষমাণ। সকলের দৃষ্টি মঞ্চের দিকে নিবদ্ধ। কখন লড়াই শুরু হবে। প্রাণভরে উপভোগ করবে দুই অসম লড়াকুর কুস্তিলড়াই। মুসলানদের সংখ্যা ছিল খুবই স্বল্প। হাতে গোনা

কয়েকজন মাত্র। তারা তলোয়ার এবং বর্শায় সশস্ত্র হয়ে কুস্তিমঞ্চের আশেপাশে সতর্ক অবস্থান নেয়। কারণ, তারা আশঙ্কা করে যে, কুরাইশরা কুস্তির বাহানা দিয়ে রাসূল (সা.)-কে হয়ত প্রাণে মেরে ফেলতে পারে। হত্যা করতে পারে।

আরবের সবচে বীর্যবান এবং বিশাল বাহুধারী কুস্তিগীর রিকানা ইবনে আব্দে ইয়াযিদ নবী করীম (সা.)-এর সাথে কুস্তি লড়তে মঞ্চে আসে। রাসূল (সা.)-ও যথাসময়ে উপস্থিত হন। রিকানা রাসূল (সা.)-এর প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং বিদ্রূপাত্মক উক্তির মাধ্যমে উপহাস করতে থাকে। রাসূল (সা.) সম্পূর্ণ নীরব থাকেন। তিনি পূর্ণ স্থিরচিত্তে রিকানার চোখে চোখ রাখেন, যেন সে তাঁর অগোচরে আক্রমণ করতে কিংবা আঘাত হানতে না পারে। রিকানা রাসূল (সা.)-এর চতুষ্পার্শে এভাবে ঘুরতে থাকে যেভাবে বাঘ শিকারীর চারপাশে তাকে বধ করার জন্য ঘুরে।

কৌতূহলী দর্শকেরা রাসূল (সা.)-কে উপহাস করলেও মুসলমানরা ছিল নীরব। তারা মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করছিল। সর্বোচ্চ সতর্কতা হিসেবে তাদের সকলের হাত ছিল তলোয়ারের বাটে।

আল্লাহ্ পাকই জানেন এরপর হঠাৎ কি হল! রাসূল (সা.) এমন পাল্টা আঘাত হানলেন যে, মুহূর্তেই লড়াইয়ের গতি ঘুরে গেল। জনতার উচ্চকিত আওয়াজ সহসা স্তব্ধ হয়ে যায়। অবাক বিস্ময়ে জনগণ প্রত্যক্ষ করতে থাকল রাসূল (সা.)-এর অপূর্ব কৌশল আর শক্তির বিশালতা। ইবনুল আছীর লেখেন, রাসূল (সা.) রিকানাকে দু'হাতে উঁচু করে জোরে আছাড় মারেন। এতে রিকানা আহত বাঘের ন্যায় গর্জে উঠে রাসূল (সা.)-এর প্রতি আক্রমণে উদ্যত হয়। তিনি এবারও অপূর্ব কৌশলে আঘাত হানেন এবং তাকে ধরে আবার মাটিতে ছুঁড়ে মারেন। সে পুনরায় আক্রমণ করতে উঠে দাঁড়ালে রাসূল (সা.) তৃতীয় বারের মত পুনরায় তাকে উর্ধ্বে তুলে আছাড় মারেন। বিশাল শরীরে পরপর তিনবার প্রচণ্ড আঘাত খাওয়ায় রিকানা আর কুস্তি লড়ার যোগ্য থাকে না। সে মাথা নিচু করে কুস্তিমঞ্চ হতে নেমে আসে।

উপস্থিত জনতার উপর কবরের নীরবতা ছেয়ে যায়। সবাক মুখগুলো সহসা নির্বাক হয়ে যায়। ঘটনার আকস্মিকতা এবং ফলাফল বিপর্যয়ে কুরাইশরা চুপসে যায়। মাথা হেট হয়ে যায় ইহুদীবাদীর। অপরদিকে মুষ্টিমেয় মুসলমানরা খুশীতে নাঙ্গা তলোয়ার এবং বর্শা উর্ধ্বপানে উঁচিয়ে থেকে থেকে গগনবিদারী 'নারা' লাগাতে থাকে।

"চাচা রিকানা!" রাসূল (সা.) সজোরে আহ্বান করে বলেন—"স্বীয় অঙ্গীকার পূরণ করুন এবং এখানেই ঘোষণা দিন যে, আজ থেকে আপনি মুসলমান।"

কিন্তু রিকানা ইসলাম গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে।

॥ ছয় ॥

"এটা কেবল শারীরিক শক্তিতে সম্ভব হতে পারে না।" হযরত খালিদ (রা.) খর্জূর বীথিকায় শুয়ে শুয়ে মনে মনে বলছিলেন—"রিকানাকে এভাবে তিন তিনবার আছড়ে ফেলা তো দূরের কথা, তাকে কেউ আজ পর্যন্ত চিৎও করতে পারেনি।"

এ মুহূর্তে হযরত খালিদ (রা.)-এর চোখের সামনে নবী করীম (সা.)-এর চেহারা কমনীয় হয়ে ভেসে ওঠে। শৈশবকাল থেকেই তিনি রাসূল (সা.)-কে উত্তমরূপে চিনতেন এবং জানতেন। কিন্তু ক্রমে রাসূল (সা.)-এর জীবনের গতি অন্যদিকে মোড় নেয়। নবুওয়াত লাভের পর তাঁর জীবন যেরূপে বিকশিত হতে থাকে হযরত খালিদ (রা.) সে রূপের সাথে আদৌ পরিচিত ছিলেন না। মক্কায় তিনি নবুওয়াতের দাবী করার পর হযরত খালিদ (রা.) এক রকম তাঁর সাথে কথা বলাই ছেড়ে দেন। তিনি রাসূল (সা.)-কে উত্তম শিক্ষা দিতে চান কিন্তু রিকানার মত কুস্তিগীর তিনি ছিলেন না। তিনি ছিলেন রণাঙ্গনের লড়াকু বীর যোদ্ধা। ময়দানে সশস্ত্র যুদ্ধ করা এবং যুদ্ধ পরিচালনায় সেকালে তাঁর জুড়ি ছিল না। কিন্তু তখন মুসলমানরা যুদ্ধ করার পরিস্থিতিতে ছিল না।

যখন মুসলমানরা রণাঙ্গনে নামার উপযোগী হয় এবং কুরাইশদের সাথে তাদের প্রথম ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তখন হযরত খালিদ (রা.) এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন যে, তাঁর পক্ষে ঐ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এ জন্যে তাঁর আফসোস ছিল সীমাহীন। এটি ছিল ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ। এ যুদ্ধে ৩১৩ জন মুসলিম মুজাহিদ ১০০০ কুরাইশকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। সেদিন হযরত খালিদ (রা.) এ অপ্রত্যাশিত সংবাদ দাঁতে দাঁত পিষে সহ্য করেছিলেন। কিন্তু আজ তিনি এক খর্জূর বীথিকায় শায়িত। তাঁর এখনো ভাবতে অবাক লাগে যে, নিরস্ত্রপ্রায় মুষ্টিমেয় লোক কিভাবে সশস্ত্র এক বিশাল বাহিনীকে এভাবে পর্যুদস্ত করে? তাইতো সেদিন তিনি পরাজিত কুরাইশ যোদ্ধাদের কাছে জানতে চান যে, তাদের মাঝে এমন কোন্ বিশেষত্ব রয়েছে, যার ফলে তারা এমন অসম যুদ্ধেও বিজয়ের মুকুট ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হল?

হযরত খালিদ (রা.) এ সমস্ত কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ উঠে বসেন এবং আঙ্গুলির সাহায্যে বালুকাময় জমিনের উপর বদর রণাঙ্গনের ছক কেটে কুরাইশ ও মুসলমানদের পজিশন এবং যুদ্ধ চলাকালীন গৃহীত বিভিন্ন কৌশল পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। পিতাই তাঁকে সমরবিদ্যায় পারদর্শী ও বিশেষজ্ঞ বানিয়েছিল। শৈশবে অশ্বারোহণ শিক্ষা দেয়। বেয়াড়া এবং দুরন্ত ঘোড়া বাগে আনার প্রশিক্ষণও তাঁকে দিয়েছিল। ফলে যৌবনে পদার্পণের সাথে সাথে তিনি একজন বিখ্যাত অশ্বারোহীতে পরিণত হন। উষ্ট্রারোহী হিসেবেও ছিলেন সমান দক্ষ। পিতাই ছিল তাঁর উস্তাদ। সে হযরত খালিদ (রা.)-কে শুধু সৈনিকই নয়, যোগ্য সিপাহসালার হিসেবে গড়ে তুলেছিল। ফলে হযরত খালিদ (রা.) এমন যুদ্ধপ্রিয় হয়ে ওঠেন যে, সমরীয় বিভিন্ন কলা-কৌশল নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতেও তিনি শুরু করেন। সমর বিদ্যায় আশাতীত সাফল্যের কারণে যুবক বয়সেই তিনি সৈন্য পরিচালনায় সর্বোচ্চ যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হন।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারার গভীর আফসোস ছিল হযরত খালিদ (রা.) এর। এ যুদ্ধে কুরাইশদের পরাজয় তাকে এমন পীড়িত ও বেদনাহত করে যে, তিনি এর চরম প্রতিশোধ গ্রহণের দৃঢ় শপথ করেন। কিন্তু বর্তমান চিন্তা-ভাবনা তাঁর ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। মক্কা হতে রওনার ক'দিন পূর্বে তিনি দু'টি বিষয়ে গভীর চিন্তা করেন। এক. রাসূল (সা.) কর্তৃক বিখ্যাত কুস্তিগীর রিকানাকে উপর্যুপরি তিনবার ধরাশায়ী করা। দুই. বদর যুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জন কর্তৃক প্রায় হাজার খানেক সৈন্যের সশস্ত্র বাহিনীকে পরাজিত করা। তিনি কিছুতেই একে দৈহিক শক্তির ফল বলে মেনে নিতে পারছিলেন না। তাঁর সব সময় মনে হয়েছে, এটা অদৃশ্য শক্তিরই কারসাজি, যার কাছে তারা বারবার পরাস্ত হচ্ছে। অকেজো হয়ে যাচ্ছে তাদের অস্ত্রগুলো। অসহায় হয়ে পড়ছে আরবখ্যাত বীর-যোদ্ধারা, তারপরেও বদর যুদ্ধের প্রতিশোধের আগুন তাঁর মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলছিল।

বদর রণাঙ্গন হতে এক বিরাট সংখ্যক কুরাইশের বন্দীর ব্যাপারটি কুরাইশ নেতৃবৃন্দের জন্য একটি সজোর চপেটাঘাত ছিল। হযরত খালিদ (রা.)-এর মাঝেও এর বিরাট প্রভাব পড়েছিল। তাঁর স্পষ্ট মনে আছে, বদর যুদ্ধ চলাকালে মক্কার সাথে কুরাইশ বাহিনীর যোগাযোগ ছিল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। রণাঙ্গনের খবর মক্কাবাসীরা কিছুই জানত না। এদিকে মক্কাবাসী অত্যন্ত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে এক একটি দিন অতিবাহিত করতে থাকে। তারা প্রতিদিন এ আশায় বদর পানে নির্নিমেষ চেয়ে থাকে যে, ওদিক থেকে কোন ঘোড় সওয়ারের আগমন ঘটবে। আর সে বিজয়ের খবর শুনিয়ে সবাইকে আশ্বস্ত করবে।

দীর্ঘদিন পর কোন অশ্বারোহী নয়; বরং এক উষ্ট্রারোহী তাদের নজরে পড়ে। অপেক্ষমাণ জনতা তার দিকেই ছুটে যায়। কিন্তু এ আগন্তুক তাদের জন্য সুসংবাদ বয়ে আনে না। সমবেত জনতার আবেগ-উচ্ছ্বাস স্তিমিত হয়ে যায়, যখন তারা দেখে যে, সংবাদবাহীর গায়ের জামা ছিড়া-ফাঁড়া এবং সে ক্রন্দনরত। এতে সবাই বুঝতে পারে, আগন্তুক দুঃসংবাদ বৈ সুসংবাদ বয়ে আনেনি। কেননা, তৎকালীন আরবে নিয়ম ছিল, কেউ কোন দুঃসংবাদ নিয়ে এলে সে গাত্রস্থ বস্ত্র ফেঁড়ে ফেলত এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় আগমন করত। এটাই ছিল তখনকার বিপদ সংকেত। আগন্তুক জনতার মাঝে এসে কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে এই মর্মে সংবাদ প্রদান করে যে, কুরাইশ বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। যাদের নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন যুদ্ধে গিয়েছিল তারা একে অপরকে ডিঙ্গিয়ে আগন্তুকের কাছে এসে নাম ধরে ধরে তাদের জীবিত, মৃত কিংবা আহত হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চায়। রণাঙ্গন হতে পলায়নপর কুরাইশরাও এর কিছুক্ষণ পর শম্ভুক গতিতে ম্লান মুখে এক এক করে মক্কায় ফিরে আসে।

রণাঙ্গনে নিহত ১৭ জন ছিল হযরত খালিদ গোত্রীয় বনু মাখযুমের। তাদের সকলের সাথে হযরত খালিদ (রা.)-এর গভীর রক্তের সম্পর্ক ছিল। আবু জাহল ছিল হযরত খালিদের চাচাত ভাই এবং কুরাইশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। সেও নির্মমভাবে নিহত হয়। ওলীদ নামে হযরত খালিদের আরেক ভাই হয় যুদ্ধবন্দী।

উপচেপড়া জনতার মাঝে অন্যতম কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান ও তার স্ত্রী হিন্দাও উপস্থিত ছিল।

"এই দূত! আমার পিতা ও চাচা সম্পর্কে কিছু বলতে পারিস?" স্বভাবসুলভ চির উদ্ধত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে হিন্দা।

"আলী এবং হামযার হাতে আপনার পিতা নিহত হয়েছেন।" দূত জবাবে বলে—"আর আপনার চাচা শায়বাকে হামযা একাই হত্যা করেছে। আপনার পুত্র হানজালা মারা গেছে আলীর হাতে।"

আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা প্রথমে হযরত আলী ও হযরত হামযা (রা.)-কে বেধড়ক গাল-মন্দ করে। অতঃপর শপথ করে বলে—"আল্লাহর কসম! পিতা, চাচা এবং পুত্রের হত্যার বদলা আমি নেবই।"

আবু সুফিয়ান ছিল সম্পূর্ণ নীরব। চুপ করে শোনা ছাড়া তার আর কোন গত্যন্তর ছিল না।

এদিকে দূত কথা যতই বলছিল হযরত খালিদ (রা.)-এর রক্ত ততই টগবগ করে ফুটছিল। পরাজয়ের খবরে তিনি ছিলেন ভীষণ মর্মাহত।

বদর রণাঙ্গনে কুরাইশদের বড় বড় নেতাসহ ৭০ জন নিহত হয়। যুদ্ধ-বন্দীদের সংখ্যাও ছিল প্রায় এমন।

॥ সাত ॥

হযরত খালিদ (রা.) গাত্রোত্থান করেন। শয্যার কার্পেটটি মুড়িয়ে ঘোড়ার জিনের সাথে বেঁধে রাখেন। অতঃপর নিজেও ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে মদীনাভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি স্মৃতির মণিকোঠা হতে সমস্ত স্মৃতি বের করে দিতে চান কিন্তু মন তার উড়ে উড়ে মদীনায় পৌঁছে যেতে থাকে। যা বর্তমানে মুসলমানদের হেড কোয়ার্টার এবং যেথায় নবী করীম (সা.) অবস্থান করছেন। রাসূল (সা.)-এর কথা মনে পড়তেই স্মৃতি আবার তাঁকে পিছনে নিয়ে যায়। স্মৃতিতে ভেসে ওঠে নবী করীম (সা.) পরিচালিত বদর রণাঙ্গনের দৃশ্য। তাঁর আরো মনে পড়ে হিন্দার ঐ কঠোর ঘোষণার কথা, যা সে স্বামী আবু সুফিয়ানকে শুনিয়ে বলছিল ঃ

"পিতা-চাচাকে ভুলতে পারি কিন্তু তাই বলে কলিজার টুকরা হানজালাকেও ভুলে যাব? মা সন্তানের কথা কিভাবে ভুলতে পারে? আল্লাহ্‌র শপথ! পুত্রের খুনের বদলা নিতে আমি মুহাম্মাদকে কিছুতেই ক্ষমা করব না। এ যুদ্ধ সেই করিয়েছে। হামযা এবং আলীকেও ক্ষমা করব না। তারাই আমার পিতা, চাচা এবং পুত্রের হত্যাকারী।"

"পুত্র হত্যার গভীর ব্যথা আমার রক্তে আগুন জ্বালিয়ে ফিরছে।" আবু সুফিয়ান বলছিল—"পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নেয়া আমার উপর ফরয হয়ে গেছে। আমার এখন প্রধান কর্তব্য হল, মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে বিশাল বাহিনী গড়ে তোলা এবং তাকে এমন শিক্ষা দেয়া, যাতে সে আর কোনদিন অস্ত্র ধরার সাহস না পায়।"

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এবং জীবনীকার আল্লামা ওকিদী লেখেন, আবু সুফিয়ান পরের দিনই সমস্ত সর্দারকে ডেকে পাঠান। এদের অধিকাংশই ছিল এমন, যারা অনিবার্য কারণে বদর যুদ্ধে অংশ নিতে পারেনি। কিন্তু প্রত্যেকেরই কোন না কোন নিকটতম আত্মীয় যুদ্ধে গিয়ে নিহত হয়েছে। প্রতিশোধ স্পৃহায় সকলেই এখন সমবেত।

"আমার বেশী কথা বলার প্রয়োজন নেই?" আবু সুফিয়ান উপস্থিত নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে—"আমার যুবক পুত্র নিহত। তার হত্যার প্রতিশোধ না নিলে তাকে জন্ম দেয়ার অধিকার আমার থাকে না।"

একযোগে সবাই তার কথা সমর্থন করে। এ বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ হয় যে, মুসলমানদের থেকে বদরের প্রতিশোধ নিতেই হবে।

"কিন্তু আপনাদের মধ্য হতে কেউ ঘরে বসে থাকতে পারবেন না। সবাইকে যুদ্ধে যেতে হবে।" হযরত খালিদ (রা.) সমবেত কুরাইশ সর্দারদের লক্ষ্য করে বলেন—"বদরে আমরা শুধু এ কারণেই জিল্লতির সম্মুখীন হয়েছি যে, নেতৃস্থানীয় অনেকেই যুদ্ধে না গিয়ে ঘরে বসে থাকেন। আর যুদ্ধের ময়দানে পাঠান তাদেরকে, কুরাইশী মর্যাদাবোধ যাদের মধ্যে ছিল না।"

"তবে কি আমার পিতার মধ্যেও কুরাইশী মর্যাদাবোধ ছিল না?" আবু জাহলের পুত্র এবং হযরত খালিদ (রা.)-এর চাচাত ভাই ইকরামা উত্তেজিত হয়ে বলে—"সফওয়ান বিন উমাইয়ার পিতারও কি জাতিগত মর্যাদাবোধ ছিল না?... এত মর্যাদাবোধের অধিকারী হয়ে তুমি কোথায় ছিলে ওলীদের পুত্র?"

"পরস্পরে লড়াই করতে আমরা এখানে সমবেত হইনি।" আবু সুফিয়ান বলে—"খালিদ! কারো আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত করে এমন কথা বলা তোমার উচিৎ হয়নি।"

"আমাদের কারো আত্মমর্যাদাবোধ আর বাকী নেই।" হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"মুহাম্মাদ ও তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গদের যতদিন খতম করতে না পারব ততদিন আমরা আত্মমর্যাদাশালী জাতি হিসেবে বিবেচিত হব না। ঘোড়ার বাগের শপথ করে বলছি, রক্তের উত্তাপ আমার চোখকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বানিয়ে দিয়েছে। মুসলমানদের তাজা রক্তই কেবল এ স্ফুলিঙ্গ নির্বাপিত করতে পারে।...আমি আবারও দাবী করছি যে, এবার আমাদের সর্দারদের প্রথম কাতারে থাকতে হবে। আর আমার জানা আছে যে, যুদ্ধের ময়দানে আমি কোথায় থাকব। তবে অবশ্যই নেতার অনুগত রব। কিন্তু নেতা যদি আমাদের জন্য ক্ষতিকর কোন আদেশ চাপিয়ে দেন তবে সে নির্দেশ আমি মানব না।"

অবশেষে আবু সুফিয়ানকে সর্বসম্মতিক্রমে সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত করে বৈঠক সেদিনের মত মুলতবী ঘোষণা করা হয়।

হযরত খালিদ (রা.)-এর মনে পড়ে বদর যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বেকার একটি ঘটনার কথা। মক্কাবাসীদের একটি কাফেলা ফিলিস্তিন থেকে মক্কা প্রত্যাবর্তন করছিল। এটা ছিল একটি বাণিজ্যিক কাফেলা। মক্কাবাসী বিশেষত কুরাইশদের প্রত্যেকেই এই বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে। কম-বেশী সকলেরই মূলধন এতে

ছিল। কাফেলাটিতে উটের সংখ্যা প্রায় এক হাজার এবং বাণিজ্যিক পণ্য ছিল প্রায় ৫০ হাজার দীনার সমমূল্যের। এ বাণিজ্য বহরের নেতা ছিল আবু সুফিয়ান। ৫০ হাজার দীনারে ৫০ হাজার দীনার লাভ করে বাণিজ্যিক সফলতার পূর্ণ স্বাক্ষর রাখে সে।

কাফেলার প্রত্যাবর্তন পথটি মদীনার নিকটবর্তী রাস্তার সাথে সংযুক্ত ছিল। মুসলমানরা তাদের প্রত্যাবর্তনের কথা জেনে যায়। পুরো কাফেলাটি গ্রেফতার করতে তাদেরকে এক স্থানে ঘিরে ফেলা হয়। কিন্তু স্থানটি অসমতল ও টিলা বিশিষ্ট থাকায় আবু সুফিয়ান বুদ্ধিমত্তার সাথে একটি-দু'টি করে সমস্ত উট তাদের ঘেরাও থেকে নিরাপদে বের করে দিতে সমর্থ হয়।[১]

॥ আট ॥

হযরত খালিদ (রা.)-এর ঘোড়া মন্থর গতিতে মদীনাপানে চললেও তাঁর স্মৃতির ফিতা পশ্চাৎমুখী ঘুরছিল দ্রুতবেগে। কুরাইশরা সমবেত হয়ে প্রতিশোধের স্কীম তৈরীকালে যে সমস্ত শব্দ উচ্চারণ করেছিল প্রতিটি শব্দ তাঁর কানে এখন বাজতে থাকে।

"আমাকে নেতারূপে মেনে থাকলে আমার প্রতিটি সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া তোমাদের জন্য আবশ্যক।" আবু সুফিয়ান বলে—"আমার প্রথম সিদ্ধান্ত হল, বাণিজ্যিক মুনাফা হিসেবে আয়লব্ধ ৫০ হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) এখনও আমি মালিকদের মাঝে বণ্টন করিনি। আমি এ অর্থ বণ্টন করব না। মুসলমানদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ে এ সমুদয় অর্থ ব্যয় করা হবে।"

"ব্যক্তিগতভাবে আমি এবং আমার গোত্রের সকলে এ সিদ্ধান্ত মেনে নিলাম।" সবার আগে হযরত খালিদ (রা.) বলেন।

তাঁর কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে চতুর্দিক থেকে "মেনে নিলাম" "মেনে নিলাম" সমর্থনসূচক আওয়াজ ওঠে।

"আমার দ্বিতীয় নির্দেশ হল।" আবু সুফিয়ান দ্বিতীয়বার গভীরকণ্ঠে বলে— "বদর যুদ্ধে যারা মারা গেছে তাদের আত্মীয়-স্বজন বেদনাহত। আমি শোকাহত পুরুষদেরকে কপাল চাপড়াতে দেখেছি এবং মহিলাদেরকে বিলাপ করতে শুনেছি।

টীকা ঃ ১. অন্যান্য সীরাত গ্রন্থে আছে, কাফেলার উদ্দেশে প্রেরিত মুসলিম সেনাবহর নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার পূর্বেই আবু সুফিয়ান এক গোপন সূত্রে খবর পেয়ে যায়। ফলে তারা সাধারণ সড়ক এড়িয়ে ভিন্ন পথে সম্ভাব্য আক্রান্ত এলাকা অতিক্রম করে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়।

মনে রেখ, অশ্রুজলের শীতলতায় প্রতিশোধের প্রজ্জ্বলিত বহ্নিতাপ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বদরে নিহতদের স্মরণে আর কান্নাকাটি চলবে না।... আমার তৃতীয় নির্দেশ, মুসলমানদের হাতে যারা যুদ্ধবন্দী হয়ে আছে তাদের মুক্তির উদ্যোগ নেয়া হবে না। আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন যে, মুসলমানরা বন্দীদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে এবং এই শ্রেণী অনুপাতে তাদের মুক্তিপণ এক হাজার থেকে চার হাজার দিরহাম নির্ধারণ করেছে। আমরা মুসলমানদের একটি পাইও দেব না। এ অর্থ আমাদের বিরুদ্ধেই ব্যয় হবে।

মদীনায় যাওয়ার পথে ঘোড়ার পিঠে বসে যখন হযরত খালিদের এই ক্ষণটির কথা মনে পড়ে, আপনাআপনিই তাঁর পাঞ্জা মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যায়। ক্রোধের তরঙ্গ ওঠে তাঁর সারা শরীরে। ঘটনাটি অনেক পূর্বের ছিল, তথাপি এ মুহূর্তেও তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠেন। তাঁর ক্রোধের কারণ এই ছিল যে, 'কোন বন্দীকে মুক্ত করতে কেউ মদীনায় যাবে না'—এই মর্মে সাধারণ বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও জনৈক ব্যক্তি গোপনে মদীনায় গিয়ে মুক্তিপণ দিয়ে তার পিতাকে মুক্ত করে আনে। এরপর থেকে গোপনে মদীনায় গিয়ে নিকটতম আত্মীয়কে মুক্ত করে আনার ধারা অবাধে শুরু হয়ে যায়। যার ফলে এক প্রকার বাধ্য হয়েই আবু সুফিয়ানকে তার নির্দেশই প্রত্যাহার করে নিতে হয়।

ওলীদ নামে হযরত খালিদ (রা.)-এর এক ভাই মুসলমানদের হাতে যুদ্ধবন্দী হয়। কুরাইশরা যদি এভাবে অসংখ্য যুদ্ধবন্দীকে মুক্ত করে না আনত, তাহলে হযরত খালিদ (রা.) কখনো তাঁর ভাইকে মুক্ত করতে যেতেন না। তাঁর অন্যান্য ভাইয়েরাই তাঁকে এ ব্যাপারে বাধ্য করে। হযরত খালিদ (রা.)-এর মনে পড়ে, তিনি নিজের মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন করতে মোটেই রাজি হচ্ছিলেন না। কিন্তু একটি চিন্তায় শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। তিনি চিন্তা করেন যে, রাসূল (সা.) তাঁরই বংশের একজন। তাঁর অনুসারী মুসলমানরাও কুরাইশ ও মক্কারই লোকজন। আসমান থেকে নেমে আসা কোন ফেরেশতা বা ভিন্ন কোন জাতি তারা নয়। এমন বীর ও বাহাদুর তো তারা ছিলো না যে, মাত্র ৩১৩ জন এক সহস্র সশস্ত্র সৈন্যকে পরাস্ত করতে পারে! তাদের মধ্যে এহেন শৌর্য-বীর্য কোত্থেকে এল যে, তারা আমাদের বিরুদ্ধে আমাদেরই লোকদের মুক্তিপণ নির্ধারণ করছে!

"তাদের এক নজর দেখব।" হযরত খালিদ (রা.) পরিকল্পনা করেছিলেন— "মুহাম্মাদকে নিরীক্ষণ করব আরো গভীরভাবে।"

এরপর তিনি ভাই হিশামকে সাথে নিয়ে মদীনায় যাত্রা করেন। চার হাজার দেরহামও সাথে নিতে ভুলেন না। কারণ, তিনি জানতেন, মাখযুম গোত্রপতি ওলীদের পুত্রের মুক্তিপণ চার হাজার দেরহামের কম হবে না।

বাস্তবেও এমনটি হয়। তিনি মুসলমানদের কাছে গিয়ে ভাইয়ের নাম বললে মুক্তিপণ আদায় ও যুদ্ধবন্দীর মুক্তির দায়িত্বপ্রাপ্ত সাহাবী চার হাজার দেরহাম অর্পণ করতে বলেন। "মুক্তিপণের পরিমাণ একটু কম করুন" হযরত খালিদের ভাই হিশাম দায়িত্বপ্রাপ্ত সাহাবীকে অনুরোধ করে বলে—"আপনারা তো পর নন; আমাদেরই লোক। অতীত সম্পর্কের কথা মনে করে একটু বিবেচনা করুন।"

"এখন তোমাদের সাথে আমাদের আর কোন সম্পর্ক নেই।" সাহাবী জবাবে বলেন—"আমরা আল্লাহ্র রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ পালনকারী মাত্র।"

"আমরা আপনাদের রাসূলের সাথে একটু কথা বলতে পারি কি?" হিশাম জানতে চাইল।

"হিশাম!" হযরত খালিদ (রা.) গর্জে উঠে বলেন—"নিজের মর্যাদার কথা বিবেচনা করে ভাইয়ের চিন্তা এক প্রকার ছেড়েই দিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি ছাড়লে না, তাকে ছাড়িয়ে নিতে আমাকে সাথে নিয়ে এলে। সে যত মুক্তিপণ চায় দিয়ে দাও। মুহাম্মাদের সামনে গিয়ে তাঁর কাছে আমি দয়া ভিক্ষা চাইতে পারব না।"

এরপর তিনি দেরহামপূর্ণ থলে সাহাবীর সামনে ছুঁড়ে মেরে বলেন, গুণে নিয়ে ভাইকে আমাদের হাতে তুলে দাও।

মুদ্রা বুঝে পেয়ে ওলীদকে হযরত খালিদ (রা.) ও হিশামের হাতে তুলে দেয়া হয়। তারা তৎক্ষণাৎ মক্কাভিমুখে রওনা হয়। পথিমধ্যে দু'ভাই ওলীদকে তাদের পরাজয়ের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তারা আশা করেছিল যে, ওলীদ যেহেতু বাহাদুর গোত্রের যুবক তাই সে যুদ্ধজ্ঞান ও সমর-বিচক্ষণতার আলোকে মুসলিম বাহিনীর রণ-কৌশল ও নিজেদের ত্রুটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিবে। কিন্তু ওলীদের ভাবখানা এমন এবং ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসির ধরন এমন ছিল যেন কেউ তাকে জাদু করেছে। কার প্রভাবে সে যেন প্রভাবিত।

"ওলীদ! কিছু বলো।" হযরত খালিদ (রা.) তাকে বলেন—"পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে আমরা বদ্ধপরিকর। কুরাইশের সকল নেতা আসন্ন যুদ্ধে সক্রিয় অংশ নেবেন। আশেপাশের সমস্ত গোত্রকেও আমরা সাথে নিচ্ছি। মক্কায় জমা হওয়া ইতিমধ্যে শুরুও হয়ে গেছে।"

"সমগ্র আরব একত্রিত করলেও তোমরা মুসলমানদের পরাজিত করতে পারবে না।" ওলীদ বলে—"বলতে পারি না যে, মুহাম্মাদের হাতে কোন জাদু

আছে কি-না বা তার ধর্মবিশ্বাসই সত্য কি-না যে, তাদের হাতে বন্দী হয়েও তাদেরকে আমার খারাপ লাগেনি।"

"তাহলে তো তুমি জাতির গাদ্দার।" হিশাম বলে ওঠে—"হয় তুমি গাদ্দার নতুবা জাদুগ্রস্ত। ঐ ইহুদী নেতা ঠিকই বলেছে যে, মুহাম্মাদের কাছে আসলে কোন নতুন আকীদা বিশ্বাস বা ধর্ম-মাযহাব নেই। সে এক অদ্ভুত জাদুর শক্তি লাভ করেছে মাত্র।"

"জাদুই হবে, নতুবা কুরাইশ বাহিনী বদরে পরাজিত হওয়ার ছিল না।" হযরত খালিদ (রা.) বলেন।

ওলীদ তাদের কথায় যেন কর্ণপাতই করছিল না। তার ঠোঁটে শোভা পাচ্ছিল মুচকি হাসির রেখা। সে বারবার ঘাড় ঘুরিয়ে মদীনার পানে তাকাচ্ছিল। মদীনার অদূরে জুলহুলায়ফা নামক স্থানে তিন ভাই যখন পৌঁছে তখন রাত গভীর। গাঢ় কালো আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিল পৃথিবীর শরীর। রাত কাটানোর উদ্দেশে তারা সেখানেই যাত্রাবিরতি করে।

সকাল হলে দেখা যায় ওলীদ লাপাত্তা। তার ঘোড়াটিও ছিল না। হযরত খালিদ (রা.) ও হিশাম কিছুক্ষণ চিন্তার পর এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, ওলীদ মদীনায় ফিরে গেছে। তারা তার উপরে এক ধরনের প্রভাব অনুভব করছিল। আর তা ছিল একমাত্র মুসলমানদেরই প্রভাব। অনন্তর দু'ভাই মক্কায় ফিরে আসে। কিছুদিন পর মদীনা হতে তারা এই মর্মে ওলীদের বাচনিক বার্তা পায় যে, সে মুহাম্মাদকে আল্লাহ্‌র রাসূল বলে মেনে নিয়েছে এবং রাসূল (সা.)-এর ব্যক্তিত্ব ও কথায় এতই অভিভূত হয় যে, অবশেষে ইসলামই গ্রহণ করে নেয়।

ঐতিহাসিকগণ লেখেন, হযরত ওলীদ বিন ওলীদ (রা.) নবী করীম (সা.)-এর বিশেষ দৃষ্টি লাভ করেন এবং দৃঢ় ধর্মীয় বিশ্বাসসহ কাফেরদের সাথে ঘোরতর যুদ্ধ করে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন।

দু' কারণে সেদিন হযরত খালিদ (রা.)-এর চরম গোস্বা হয়। প্রথমত তাঁর ভাই চলে গেছে। দ্বিতীয়ত অনর্থক চার হাজার দেরহাম খোয়া যায়। মুসলমান ও কুরাইশদের মাঝে চরম শত্রুতা সৃষ্টি হওয়ায় মুসলমানরা এ অর্থ ফেরৎ দেয় না। অর্থ ফেরৎ না দেয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো, ওলীদ (রা.) রাসূল (সা.)-কে জানিয়ে দেন যে, কুরাইশরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে এবং এ উদ্দেশে দেরহাম ও দীনারের পাহাড় জমা করা হয়েছে।

হযরত খালিদ (রা.) মদীনার দিকে চলছেন। সামনের দিক থেকে উটের **চুটের** মত বিশাল কি যেন জমিন ফুঁড়ে উপরে উঠতে থাকে। তাঁর জানা ছিল এটা কি! মদীনার ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত বিখ্যাত উহুদ পাহাড়। ইতিমধ্যে তাঁর ঘোড়া প্রলম্বিত এবং অপেক্ষাকৃত উঁচু টিলায় উঠতে শুরু করে।

"উহুদ... উহুদ।" হযরত খালিদ (রা.)-এর ওষ্ঠদ্বয়ের মাঝ হতে এক অস্ফুট আওয়াজ নির্গত হয় এবং এই কথা তাঁর কানে বাজতে থাকে—"আমি আবু সুলাইমান ... আমি সুলাইমানের পিতা।" এর সাথে সাথে একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ভয়ঙ্কর আওয়াজ এবং হাজার হাজার অশ্বের হ্রেষাধ্বনি ও তলোয়ার ঠুকাঠুকির আওয়াজও তার শ্রবণেন্দ্রীয়ের পর্দায় বাড়ি খেতে থাকে। তিনি এ যুদ্ধের জন্য বড় অস্থির হয়ে অপেক্ষমাণ ছিলেন এবং অপূর্ব রণকৌশলে যুদ্ধও করেন।

হযরত খালিদ (রা.)-এর স্মৃতির চাকা পশ্চাৎমুখী ঘুরতে থাকে।

চার বছর পূর্বেকার ঘটনা। তৃতীয় হিজরী মোতাবেক ৬২৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে মদীনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুতকৃত সেনাবাহিনী মক্কায় সমবেত। এদের সংখ্যা ৩ হাজার। ৭ শত বর্মধারী। দু'শর মত অশ্বারোহী। তিন সহস্র উট ছিল যুদ্ধাস্ত্র ও রসদপত্রে বোঝাই। এ বিশালবাহিনী যাত্রার জন্য নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল।

গতকালের ঘটনার মত হযরত খালিদ (রা.)-এর মনে পড়ে যে, তিনি এ বিশাল বাহিনী দেখে খুবই খুশী হয়েছিলেন। প্রতিশোধের দাবানল নির্বাপণের সময় এসে গিয়েছিল। আবু সুফিয়ান ছিল এ বাহিনীর চীফ কমান্ডার, সর্বাধিনায়ক। হযরত খালিদ (রা.) ছিলেন এক ব্যাটালিয়ন সৈন্যের কমান্ডার। তাঁর ভগ্নি এ বাহিনীর সহগামী হয়েছিল। এ ছাড়া আরো ১৪ জন নারী যেতে প্রস্তুত ছিল। এদের মধ্যে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাসহ আমর ইবনুল আস এবং আবু জাহলের পুত্র ইকরামার স্ত্রীরাও ছিল। অবশিষ্টরা ছিল শিল্পী-গায়িকা শ্রেণীর। সকলের কণ্ঠে ছিল করুণ আওয়াজ। তাদের সাথে বাদ্যযন্ত্রও ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে এসব নৃত্য ও বাদ্য পটিয়সী রমণীর কাজ ছিল উত্তেজনাকর ও আবেগঘন গীত গেয়ে গেয়ে সৈনিকদের মনোবল চাঙ্গা রাখা এবং বদর যুদ্ধে নিহতদের কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়া।

আফ্রিকার এক হাবশীর কথা হযরত খালিদ (রা.)-এর বিশেষভাবে মনে পড়ে। তার নাম ছিল ওয়াহাশী বিন হারব। সে কুরাইশ সর্দার যুবাইর বিন মুতঈমের গোলাম ছিল। সে দীর্ঘকায়, কৃষ্ণাঙ্গ এবং বলবান ছিল। বর্শা নিক্ষেপে

তার খ্যাতি ছিল দেশজুড়ে। আফ্রিকার তৈরী বর্শা ছিল তার কাছে। তার আফ্রিকী নাম ছিল ভিন্ন। যুদ্ধের পরাকাষ্ঠা দেখে মুনিব যুবাইর তার এই আরবী নাম রেখেছিল।

"বিন হারব।" যাত্রার প্রাক্কালে যুবাইর বিন মুতঈম তাকে বলে—"আমি আমার চাচার খুনের বদলা নিতে চাই। কিন্তু আমার সে সুযোগ হয়ত হবে না। বদর রণাঙ্গনে মুহাম্মাদের চাচা হামযা আমার চাচাকে হত্যা করেছে। এ যুদ্ধে হামযাকে হত্যা করতে পারলে তুমি আযাদ।

"হামযা আমার নিক্ষিপ্ত বর্শায় নিহত হবে।" মনিবের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে ওয়াহশী বলে।

সৈন্যদের সাথে আগত মহিলারা যেখানে উষ্ট্রারোহিত ছিল সেখান দিয়ে এই হাবশী গোলাম যাচ্ছিল।

"আবু ওসামা!" আচমকা কোন মহিলা ডাক দেয়।

এটা ওয়াহ্শীর আরেক নাম। ডাক শুনেই সে থেমে যায়। আওয়াজ অনুসরণ করে দৃষ্টিপাত করতেই দেখে যে, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী তাকে ডাকছে। সে তার নিকটে গিয়ে দাঁড়ায়।

"আবু ওসামা!" হিন্দা বলতে শুরু করে—"বিচলিত হয়ো না। আমিই তোমাকে ডেকেছি। আমার হৃদয়ে প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। তুমি এ আগুন ঠাণ্ডা কর আবু ওসামা!"

"বলুন, আমি কি করতে পারি!" গোলাম আবেগতাড়িত হয়ে বলে—"সেনাপতির স্ত্রীর নির্দেশে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে আমি প্রস্তুত।"

"বদরে আমার পিতাকে হত্যা করেছে হামযা।" হিন্দা বলে—"হামযাকে তুমি ভাল করেই চেন। চেয়ে দেখ, আমার সারা শরীর স্বর্ণালঙ্কারে আচ্ছাদিত। হামযাকে হত্যা করতে পারলে এসব অলঙ্কারের মালিক হবে তুমি।"

ওয়াহ্শী হিন্দার শরীরস্থ অলঙ্কারের প্রতি একবার লোভাতুর দৃষ্টি ঘুরিয়ে মুচকি হেসে দৃঢ়কণ্ঠে বলে—"হামযাকে আমিই হত্যা করব।"

উহুদ যুদ্ধে সৈন্যদের গমনাগমনের কথা হযরত খালিদ (রা.)-এর মনে পড়ে। যে পথে তিনি চলছেন সে পথ দিয়েই সৈন্যরা সেদিন মদীনায় গিয়েছিল। তিনি সেদিন একটি উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে সৈন্যদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তখন গর্বে তাঁর বুক ফুলে গিয়েছিল। মদীনার মুসলমানদের প্রতিও তাঁর অন্তরে কিছুটা দয়ার সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু এই দয়ানুভব সেদিন তাঁকে ব্যথিত করেছিল

না, বরং আনন্দিতই করেছিল। কারণ, এটা ছিল রক্তের শত্রুতা। সরাসরি মান-মর্যাদার প্রশ্ন। মুসলমানদের পিষে ফেলাই ছিল তাঁর দৃঢ় অঙ্গীকার।

॥ নয় ॥

উহুদ যুদ্ধের অনেক দিন পর হযরত খালিদ (রা.) জানতে পারেন যে, মক্কায় সৈন্যদের উপস্থিতি ও যুদ্ধ-প্রস্তুতির সংবাদ রাসূল (সা.) পূর্বেই লাভ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সৈন্যদের যাত্রা, চলার গতি, যাত্রাবিরতি এবং মদীনা হতে তাদের মাঝে দূরত্বের ব্যবধান কতটুকু তারও সঠিক খবর তিনি নিয়মিত রেখেছিলেন। মদীনার উদ্দেশে সৈন্যদের মক্কা ত্যাগের সংবাদ হযরত আব্বাস (রা.) সুকৌশলে নবী করীম (সা.)-কে জানিয়েছিলেন।

মদীনার অনতিদূরে উহুদ পাহাড়ের নিকটবর্তী একটি স্থানে কুরাইশ বাহিনী এসে তাঁবু স্থাপন করে। স্থানটি ছিল সবুজ-শ্যামলা এবং চমৎকার। পানিও ছিল পর্যাপ্ত। হযরত খালিদ (রা.) ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন না যে, ইতিমধ্যে দু' মুসলিম গুপ্তচর এসে পুরো বাহিনীর উপর একটি হাল্কা জরীপ চালিয়ে মদীনায় গিয়ে নবী করীম (সা.)-কে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রদান করেছে।

৬২৫ খৃস্টাব্দের ২১ শে মার্চ। এদিন নবী করীম (সা.) মুসলিম বাহিনীকে যাত্রার নির্দেশ দেন। 'শাইখাইন' নামক একটি পাহাড়ের পাদদেশে এসে মুসলিম বাহিনী তাঁবু স্থাপন করে। তাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার। প্রায় সবাই পদাতিক। একশ সৈন্যের মাথায় শোভা পাচ্ছিল লৌহ-টুপি; শিরস্ত্রাণ। ঘোড়া ছিল মাত্র দু'টি।

এ যুদ্ধে মুনাফিকদের চেহারা থেকে কপটতার মুখোশ খসে পড়ে। মদীনার কিছু লোক বাহ্যত ঈমান আনলেও আন্তরিকভাবে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন না। কিন্তু তারা এত ধূর্ত ও সতর্ক ছিল যে, তাদেরকে পৃথক ও চিহ্নিত করা ছিল বড়ই দুষ্কর। উহুদ যুদ্ধ মুনাফিকদের কপটতা ফাঁস করে দেয়। কে সাচ্চা মুসলমান আর কে কপটচারী তা চিহ্নিত হয়ে যায়। মুজাহিদ বাহিনী মদীনা হতে 'শাইখাইন' পাহাড়ের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই নামে মদীনার এক প্রভাবশালী ব্যক্তি নবীজীর কাছে এসে এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করে যে, সংখ্যার দিক দিয়ে কুরাইশ বাহিনী মুসলিম বাহিনীর তুলনায় তিনগুণ। এমতাবস্থায় মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ঠিক হবে না; বরং আমরা মদীনার অভ্যন্তরে বসে শত্রুর আগমনের অপেক্ষায় থাকি। এখানে বসেই আমরা সম্মিলিতভাবে শত্রুর মোকাবেলা করব।

নবী করীম (সা.) অন্যান্য মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের কাছে পরামর্শ তলব করেন। কিন্তু অধিকাংশের রায় আসে মদীনার বাইরে গিয়ে লড়াই করার পক্ষে। যদিও ব্যক্তিগতভাবে নবী করীম (সা.)-এর রায় ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই-এর মত, তথাপি রায়ের আধিক্যের দিক বিবেচনায় তিনি মুসলিম বাহিনীকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেন। নবীজীর (সা.) এ সিদ্ধান্ত আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মেনে নিতে পারে না। সে মুসলিম বাহিনীর সাথে যেতে অস্বীকার করে। তার দেখাদেখি আরও তিনশ সৈন্য তার অনুসরণ করে মূল বাহিনী হতে পশ্চাদপসারণ করে। এভাবে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এরা সবাই মুনাফিক। আর আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই তাদের নেতা।

মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা মাত্র ৭০০। অপরদিকে কুরাইশ সৈন্যসংখ্যা ৩০০০। তারপরেও নবী করীম (সা.) ঘাবড়ান নি; বিচলিত হননি। তিনি এই মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়েই এগিয়ে যান এবং উহুদ পাহাড়ের কাছে শাইখাইন নামক স্থানে গিয়ে পুরো বাহিনীকে বিন্যস্ত করেন। হযরত খালিদ (রা.) পাহাড়ের এক উঁচু শৃঙ্গে দাঁড়িয়ে মুসলিম বাহিনীর এই বিন্যাস স্বচক্ষে অবলোকন করেন এবং কমান্ডার আবু সুফিয়ানের অনুমতিক্রমে নিজ অধীনস্থ সৈন্যদের জন্য একটি কৌশলী স্থান বেছে নেন।

নবী করীম (সা.) মুসলিম বাহিনীকে প্রায় এক হাজার গজ দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দেন। পশ্চাতে উপত্যকা। এক পাশে পাহাড়ের সারি, যা প্রাকৃতিক ঢাল হিসেবে পশ্চাৎ দিক হতে মুসলিম বাহিনীর রক্ষার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু অপর পাশ ছিল সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। যে কোন সময় এ প্রান্ত দিয়ে শত্রুপক্ষের আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। নবী করীম (সা.) সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করলেন। তিনি উন্মুক্ত ও গিরিপথের এক স্থানে ৫০ জন নিপুণ তীরন্দাজ নিযুক্ত করেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) ছিলেন এ তীরন্দাজ বাহিনীর কমান্ডার।

"দায়িত্ব বুঝে নাও আব্দুল্লাহ্!" নবী করীম (সা.) তাঁকে জরুরী দিক-নির্দেশনা দান করতে গিয়ে বলেন—পশ্চাতে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। আমাদের পিছন হতে দুশমনের আনাগোনা হতে পারে, যা আমাদের জন্য উদ্বেগজনক। তাদের অশ্বারোহীর কমতি নেই। তারা পিছন থেকে আমাদের উপর আক্রমণ করতে পারে। তোমার তীরন্দাজ বাহিনীকে এই অশ্বারোহী সৈন্যদের মোকাবেলায় সতর্ক ও সশস্ত্র রাখবে। শত্রুপক্ষের পদাতিক বাহিনী নিয়ে আমার কোন আশঙ্কা নেই।"

আল্লামা ওকিদী এবং ইবনে হিশামসহ প্রায় সকল নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক লেখেন যে, নবী করীম (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.)-কে স্পষ্ট

ভাষায় এ কথা বলেছিলেন যে, "আমাদের পশ্চাৎ একমাত্র তোমার সতর্কতা ও বিচক্ষণতার ফলেই সংরক্ষিত থাকবে। তোমার সামান্য ত্রুটি কিংবা অসতর্কতা আমাদের বিরাট ক্ষতি ও চরম অবমাননাকর পরাজয়ের দিকে ঠেলে দিতে পারে।... আব্দুল্লাহ্! ভাল করে শোন, শত্রুদের পলায়ন এবং আমাদের বিজয়ী হতে দেখলেও নিজ স্থান ত্যাগ করবে না। অনুরূপ আমাদের পরাজয়ের সম্মুখীন হতে দেখে তোমার বাহিনীর মাধ্যমে আমাদের সাহায্য করা জরুরী মনে হলেও নিজেদের স্থান ত্যাগ করবে না। পাহাড়ের এই উপরিভাগ যেন শত্রুপক্ষের নিয়ন্ত্রণে চলে না যায়। এটা তোমাদের দখলে। এখান থেকে নীচে যতদূর পর্যন্ত তীরন্দাজদের তীর পৌঁছতে পারে সবটাই থাকবে তোমাদের কর্তৃত্বে।"

হযরত খালিদ (রা.) মুসলমানদের সৈন্যবিন্যাস গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে আবু সুফিয়ানকে বলেন, আমার বিশ্বাস মুসলমানরা বিস্তীর্ণ ময়দানে লড়াই করবে না। আবু সুফিয়ানের ছিল সৈন্যাধিক্যের গর্ব। ফলে সে চাচ্ছিল যুদ্ধ বিস্তীর্ণ ময়দানে হোক। যাতে তার পদাতিক ও অশ্বারোহী বিশাল বাহিনী মুসলমানদেরকে পদতলেই নিশ্চিহ্ন ও নিষ্পেষিত করতে পারে। অপরদিকে হযরত খালিদ (রা.) ছিলেন অভিজ্ঞ সমরকুশলী। তাঁর পিতাই শৈশবকাল থেকে তাঁকে সমরবিদ্যায় পারদর্শী করে তুলেছিল। অতর্কিতে পশ্চাৎ কিংবা কোনো পার্শ্বভাগে আক্রমণ, গেরিলা পন্থায় হামলা, নেতৃত্বাধীন সৈন্যের বিন্যাস এবং তাদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ-এসবই ছিল তাঁর সমরবিদ্যার অন্তর্গত। তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যবিন্যস্ততা দেখেই অনুধাবন করেন যে, মুসলমানরা রণাঙ্গনে পূর্ণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে যাচ্ছে নিঃসন্দেহে।

আবু সুফিয়ান তার বাহিনীকে মুসলিম বাহিনীর সামনাসামনি নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায়। সে প্রথমে অশ্বারোহী সৈন্যদেরকে মুসলমানদের দু'পার্শ্ব হতে আক্রমণ করতে পাঠায়। এক পার্শ্ব আক্রমণের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত খালিদ (রা.) আর অপর পার্শ্ব আক্রমণের নেতৃত্বে থাকে ইকরামা। উভয়ের অধীনে ছিল ১০০ অশ্বারোহীর এক একটি বিশেষ বহর। সকল অশ্বারোহীর কমান্ডার ছিল আমর ইবনুল আস। পদাতিক বাহিনীর সামনে থাকে ১০০ ধুরন্ধর তীরন্দাজ। তলহা বিন আবু তালহা কুরাইশ বাহিনীর পতাকা উড্ডীন রেখেছিল। তৎকালে রণাঙ্গনে পতাকার বিরাট গুরুত্ব ছিল। পতাকা ছিল প্রতিটি সৈন্যের প্রাণ-স্পন্দন। যতক্ষণ পতাকা পতপত করে উড়ত ততক্ষণ সৈন্যরা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ চালিয়ে যেত। আর পতাকা ভূপাতিত হলে সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে যেত এবং বিদ্যুৎ গতিতে ভীতি সঞ্চারিত হয়ে সৈন্যরা রণে ভঙ্গ দিত।

॥ দশ ॥

কুরাইশদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূচনা হয়। কাতার ডিঙ্গিয়ে আবু আমের নামক এক পাপাচারী মুজাহিদদের অদূরে এসে দাঁড়ায়। তার পিছনে কুরাইশ-ভৃত্যদের একটি দলও ছিল। আবু আমের মূলত মদীনার অধিবাসী। আউস গোত্রের সর্দার ছিল সে। নবী করীম (সা.) হিজরত করে মদীনায় গেলে সে শপথ করে, যে কোন মূল্যে নবী করীম (সা.) ও মুসলমানদেরকে মদীনা হতে বিতাড়িত করে তবেই ক্ষান্ত হবে। সে এক রূপসী সুন্দরী ইহুদী রমণীর প্রেমে দিওয়ানা ছিল। তদুপরি ইহুদীদের অর্থ-সম্পদও তাকে এ ব্যাপারে উত্তেজিত করে তুলে। ইসলামের শত্রুতায় ইহুদীদের পদক্ষেপ ছিল অতি জঘন্য ও মারাত্মক। অবশ্য বাহ্যিকভাবে তারা মুসলমানদের সাথে আনুগত্য ও শান্তির চুক্তি করে রেখেছিল। আবু আমের ছিল এই ইহুদীবাদের হাতের কাঠের পুতুল। ইহুদীরা সুকৌশলে তাকে কুরাইশদের মিত্র হিসেবে প্রস্তুত করেছিল।

মুজাহিদ বাহিনী কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে মদীনা থেকে যাত্রা করলে আবু আমের কুরাইশদের কাছে চলে যায়। তার আউস গোত্রের অনেকে ইতিমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করে। মুসলিম বাহিনীর হয়ে যুদ্ধ করতে তারাও কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবু আমের মুসলিম বাহিনীর মধ্যে তার গোত্রের লোকদের কাছে গিয়ে উচ্চকিত আওয়াজে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

"আউস গোত্রের আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন বীর-বাহাদুরগণ!" আবু আমের বলে—"নিঃসন্দেহে আমার পরিচয় তোমরা ভাল করে জান। আমার কথা মন দিয়ে শ্রবণ কর এবং ...।"

তার কথা পূর্ণ না হতেই মুজাহিদ বাহিনীর মধ্য হতে আউস গোত্রের এক বীর মুজাহিদ এই বলে গর্জে ওঠে যে, "পাপীষ্ঠ, নরাধম চুপ কর। তোর নাম আমাদের থুকদানিতে পরিণত হয়েছে।"

হযরত খালিদ (রা.)-এর দৃষ্টিতে ভেসে ওঠে একটি দৃশ্য। আবু আমের আর তার সাথে গমনকারী গোলামদের প্রতি বৃষ্টির মত পাথর বর্ষিত হওয়ার কথা তার আবার মনে পড়ে। ঐতিহাসিকদের অভিমত, মুসলিম বাহিনী হতে আউস গোত্রের লোকেরাই এই পাথর বর্ষণ করে। পাথরের আঘাতের মুখে টিকতে না পেরে আবু আমের ও তার সাথের গোলামরা দ্রুত স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

ইহুদীরা উত্তেজনায় সময় পার করছিল। যুদ্ধের গতি ও ফলাফল জানতে তারা ছিল অত্যন্ত অধীর। আবু আমের যে ইহুদী রমণীর রূপের জাদুতে বন্দী ছিল সে আবু আমেরের মাধ্যমে তার মিশন সফল হওয়ার সংবাদ শুনতে ভীষণ

উদগ্রীব ছিল। তার এখনও অজানা ছিল যে, তার রূপ-যৌবনের যাদু মুসলমানরা অনেক পূর্বেই প্রস্তর বর্ষণ করে ব্যর্থ করে দিয়েছে। তার অপেক্ষা অর্থহীন।

আবু আমেরের এই ঘটনার পূর্বে কুরাইশদের সাথে আগত মহিলারা সুমধুর কণ্ঠে গান পরিবেশন করে। বদরে নিহতদের বীরত্ব আর ত্যাগের বর্ণনায় ভরপুর ছিল গানের কলিগুলো। নর্তকীরা এমন স্প্রীট আর এমন ভঙ্গিতে নিহতদের বিবরণ তুলে ধরে, যার প্রতিটি কথাই শ্রোতাদের রক্তে আগুন এবং লোমকূপ জাগিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট ছিল। তাদের কেউ কেউ জ্বালাময়ী ভাষণের মাধ্যমেও কুরাইশদের বীরত্বে বিস্ফোরণ আর রক্তে তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল।

নর্তকীদের পর্দার অন্তরালে চলে যাবার নির্দেশ আসে। মঞ্চে আবির্ভূত হয় আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা। চমৎকার ঘোড়ায় আরোহিতা। কণ্ঠে আকর্ষণীয় সংগীত। তার কণ্ঠ যেমন ছিল উচ্চকিত তেমনি স্বরের মধ্যেও ছিল বেশ মাদকতা। ঐতিহাসিকগণ তার গানের কলিগুলো লিপিবদ্ধ না করলেও সবাই এটা বর্ণনা করেছেন যে, তার সঙ্গীত ছিল অশ্লীলতায় ভরপুর। নারী-পুরুষের গোপন তত্ত্বের বিবরণ ছিল তার সঙ্গীতে। ইতিহাসে তার গানের কলির মধ্যে আব্দুদ্দার নামক এক ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য বনূ আব্দুদ্দার গোত্র। এই গোত্রটি কুরাইশ বংশের একটি সম্ভ্রান্ত গোত্র হিসেবে বিবেচিত ছিল। বনূ উমাইয়া এই গোত্রেরই একটি শাখা বিশেষ। হিন্দা সূরের মূর্ছনায় গেয়ে চলছিল ঃ

আব্দুদ্দারের সূর্য সন্তানেরা!
পরিবারের কর্ণধারগণ!
আমরা আঁধার রাতের অপ্সরী,
চার দেয়ালের অভ্যন্তরে আমরা জাদু প্রদর্শন করি।
এই জাদু বড়ই তৃপ্তিকর এবং দারুণ উপভোগ্য।
শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে আমাদের বক্ষ তোমাদের জন্য উৎসর্গিত,
পশ্চাদপসারণ করলে আমাদের ছায়াও পাবে না।

॥ এগার ॥

সঙ্গীত পরিবেশন সমাপ্ত হলে আবু আমের আউস গোত্রকে বিভ্রান্ত করতে যায়। কিন্তু আউস গোত্র তীরের মাধ্যমে তাকে জবাব দিলে সে চরম ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। সে ফিরে আসতেই কুরাইশরা মুজাহিদদের প্রতি তীর নিক্ষেপ

করতে শুরু করে। মুজাহিদরাও তীরের জবাব তীরের মাধ্যমে দিতে থাকে। হযরত খালিদ (রা.) যে প্রান্তভাগে অবস্থান করছিলেন ঐ প্রান্তের মুসলিম বাহিনীর উপর আক্রমণ করতে তিনি অধীনস্থ একশ অশ্বারোহী নিয়ে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হন। পাহাড়ের উপরিভাগে মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনীর গোপন অবস্থানের কথা তাঁর জানা ছিল না। পূর্ণ উদ্যমে অগ্রসর হচ্ছিল তাঁর বাহিনী। সুড়ঙ্গ ছিল সংকীর্ণ। একত্রে এ পথ অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। ফলে বাধ্য হয়ে অশ্বারোহীদেরকে লাইন বেঁধে এক একজন করে পথ চলতে হয়।

হযরত খালিদ (রা.) অনেক ভেবে-চিন্তেই তাঁর অধীনস্থ বাহিনীকে এ প্রান্তভাগে নিয়ে এসেছিলেন। পিতার প্রশিক্ষণ এবং নিজ প্রজ্ঞার আলোকে তাঁর পরিকল্পনা ছিল, পার্শ্বদেশ হতে আক্রমণ করে তিনি মুসলমানদের পিছু হটতে বাধ্য করবেন। যদি তাদের দৃঢ়তায় চিড় ধরানো যায় এবং বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে তবে সহজেই তারা কুরাইশ বাহিনীর অশ্বের পদতলে পিষ্ট হতে থাকবে। কিন্তু তার সকল পরিকল্পনা ভণ্ডুল এবং আশা দুরাশায় পরিণত হয় যখন এ অশ্বারোহী দল মুসলিম বাহিনীর অদূরে থাকতেই মাথার উপর দিয়ে তীরের ঝাক উড়ে এসে প্রথম অশ্বারোহীকে চালনীতে পরিণত করে। এক একজন অশ্বারোহী কয়েকটি তীরের আঘাতে ভূতলে লুটিয়ে পড়ে। যে সমস্ত অশ্ব তীরের আঘাতে আহত হয় সেগুলো খালিদ বাহিনীর মাঝে কেয়ামতের বিভীষিকা ও প্রলয় সৃষ্টি করে চলে। ফলে পিছনের আরোহীরা অশ্ব ঘুরিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়।

এদিকে কুরাইশ রমণীরা মিউজিক বাজিয়ে আবার ঐ গান সম্মিলিত কণ্ঠে গাইতে থাকে, যা ইতিপূর্বে হিন্দা একাই গেয়েছিল—"আব্দুদ্দারের সূর্য সন্তানেরা! আমরা রাতের আঁধারের অপ্সরী। আমরা চার দেয়ালের মাঝে জাদু প্রদর্শন... ।"

ঐতিহাসিক ওকিদী লেখেন, তৎকালীন আরবের যুদ্ধ-রীতি অনুযায়ী এবার মল্লযুদ্ধের পালা আসে। কুরাইশ বাহিনীর পতাকাধারী তলহা বিন আবু তালহা সর্বাগ্রে ময়দানে এসে মুজাহিদ বাহিনীর প্রতি হুঙ্কার ছুঁড়ে প্রতিপক্ষকে আহ্বান করে।

"প্রস্তুত হ দ্বীনের দুশমন!" দমকা হাওয়ার মত উড়ে এসে হযরত আলী (রা.) বলেন—"আমি তোর মোকাবেলায় প্রস্তুত।"

তলহা এক হাতে পতাকা আঁকড়ে ধরেছিল। অপর হাতে তলোয়ার মাথার উপর ঘুরাতে ঘুরাতে এক সময় প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করে। কিন্তু আঘাত শূন্যে মিলিয়ে যায়। সাথে সাথে নিজের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণও তার শিথিল হয়ে পড়ে। দ্রুত সে নিজেকে সামলে নিতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু তাকে সামলানোর সুযোগ না

দিয়ে হযরত আলী (রা.)-এর তরবারী এমন প্রচণ্ড আঘাত হানে যে, প্রথমে তার পতাকা ছিটকে গিয়ে পড়ে, অতঃপর সে নিজেও ভূপাতিত হয়। পতাকা পড়ে যেতেই কুরাইশ বাহিনীর এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে পতাকা তুলে নিয়ে চলে যায়। হযরত আলী (রা.) এ ব্যক্তিকেও ধরাশায়ী করতে পারতেন কিন্তু এটা মল্লযুদ্ধের নীতি বহির্ভূত হওয়ায় তাকে নিরাপদে বেরিয়ে যাবার সুযোগ দেন।

তলহাকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তারই গোত্রের আরেক ব্যক্তি ময়দানে আসে।

"আমি প্রতিশোধ নিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।" সে হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে আসে—"আলী! সামনে আস। আমার তলোয়ারের ধার দেখ।"

হযরত আলী (রা.) নীরবে তার মুকাবেলার জন্য প্রস্তুত হন। উভয়ে একে অপরের চোখে চোখ রেখে ময়দানে ঘুরতে থাকে। অতঃপর তলোয়ারে তলোয়ারে আর ঢালে ঢালে তীব্র যুদ্ধ শুরু হয়। আঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ঢাল-তলোয়ারের খেলা চলতে থাকে। শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। সকলের বিস্ফোরিত নেত্র নিবদ্ধ দু'মল্লযোদ্ধার প্রতি। রেজাল্ট আউট হতে বেশী সময় লাগে না। এক সময় সকলেই দেখল যে হযরত আলী (রা.) এর তলোয়ার রক্তে রাঙা। টপটপ করে তার তলোয়ার হতে রুধির ঝরছে জমিনবক্ষে। আর তাঁর প্রতিপক্ষ মাটিতে লুটিয়ে ছটফট করছে।

এরপর কুরাইশদের পক্ষ হতে পালাক্রমে এক একজন আসতে থাকে আর মুজাহিদদের হাতে নিহত হতে থাকে।

কুরাইশদের সেনাপ্রধান আবু সুফিয়ান তার পক্ষের বীরদের এভাবে কলাগাছের মত আছড়ে পড়তে দেখে রাগে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। সমর-রীতি অনুযায়ী মল্লযুদ্ধে নামাটা তার জন্য ছিল সম্পূর্ণ আত্মঘাতমূলক সিদ্ধান্ত। কারণ সে কমান্ডার। তার নিহত হওয়ার ফলে সৈন্যদের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা আর ভীতি ছড়িয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। তারপরেও সে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না। এতক্ষণ সে ঘোড়ায় বসে যুদ্ধের দৃশ্য অবলোকন করছিল। আচমকা সবাইকে তাক লাগিয়ে ঘোড়ায় পদাঘাত করে তর্জন আর গর্জন করতে করতে নিজেই মল্লযোদ্ধারূপে ময়দানে আবির্ভূত হয়।

তার স্ত্রী হিন্দা তাকে যেতে দেখে উষ্ট্রে আরোহণ করে সামনে আসে এবং কণ্ঠে পুনরায় ঐ গানের জোর ঝংকার তুলে, যার একটি কলি ছিল, "তোমরা কাপুরুষ হয়ে ফিরলে আমাদের শরীরের ঘ্রাণও পাবে না।"

আবু সুফিয়ান অশ্বারোহী। প্রতিপক্ষ মুসলমান পদাতিক। ইতিহাসে এ মর্দে মুজাহিদ হানজালা বিন আবু আমর নামে পরিচিত। আবু সুফিয়ানের হাতে প্রলম্বিত বর্শা। অশ্বারোহীর বর্শার আঘাত থেকে তলোয়ারধারী পদাতিক বেঁচে যাবে এ ধারণা কারোর ছিল না। আবু সুফিয়ানের ঘোড়া হানজালা (রা.)-কে লক্ষ্য করে তীরবেগে ছুটে আসে। এই ছুটন্ত অবস্থায় আবু সুফিয়ান বর্শা উঁচু করে লক্ষ্যপানে ছুঁড়ে মারে। কিন্তু হানজালা (রা.) অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দে তার মোকাবেলা করেন। তিনি একদিকে সরে গিয়ে আঘাত ব্যর্থ করে দেন। এভাবে উপর্যুপরি তিনবার আক্রমণ ও তার ব্যর্থতার পালা চলে। তৃতীয়বার আবু সুফিয়ানের ঘোড়া সম্মুখপানে এগিয়ে গেলে হানজালা (রা.) তার পিছু নেন। ঘোড়া কিছুদূর গিয়ে যখন আবার পশ্চাতে মোড় নেয় হানজালা (রা.)ও ঠিক ঐ মুহূর্তে সেখানে গিয়ে পৌছান। আবু সুফিয়ান ঘোড়ার সন্নিকটে তাঁর অবস্থানের বিষয় টের পায় না। ইতিমধ্যে হানজালা (রা.) ঘোড়ার সামনের পা লক্ষ্য করে এমন আঘাত হানে যে, ঘোড়া সঙ্গে সঙ্গে ভূপাতিত হয় আর আবু সুফিয়ানও আরেক দিকে ছিটকে পড়ে। পতিত আবু সুফিয়ানের প্রতি হযরত হানজালা (রা.) আক্রমণোদ্যত হলে আবু সুফিয়ান ঘোড়াকে ঢাল করে গড়িয়ে গড়িয়ে দ্রুত চক্কর কেটে আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। সে এভাবে নিজেকে বিপদের মুখে দেখে সাহায্যের জন্য এবং বিপদ থেকে উদ্ধার করতে কুরাইশদের প্রতি আহ্বান করতে থাকে।

এক পদাতিক কুরাইশ দৌড়ে আসে। মুসলমানরা ধারণা করে যে, এ ব্যক্তি আবু সুফিয়ানকে উদ্ধারের জন্য শুধু এসেছে। কিন্তু নরাধম যুদ্ধরীতি ভঙ্গ করে। পশ্চাৎ হতে আঘাত করে হযরত হানজালা (রা.)-কে শহীদ করে দেয়। ইত্যবসরে সুযোগ পেয়ে আবু সুফিয়ান দৌড়ে সৈন্যদের মাঝে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

সর্বশেষ মল্লযোদ্ধা হিসেবে কুরাইশদের পক্ষ হতে আসে আব্দুর রহমান বিন আবু বকর। ঐতিহাসিক ওকিদী এই ঘটনার বিবরণ এভাবে দিয়েছেন যে, আব্দুর রহমান হুঙ্কার দিয়ে ময়দানে এলে তাঁরই পিতা হযরত আবু বকর (রা.) পুত্রের মোকাবেলার জন্য এগিয়ে আসেন।

"সামনে আয় মুসলিম পিতার কাফের পুত্র!" হযরত আবু বকর (রা.) বাঘের মত হুঙ্কার দিয়ে বলেন।

নবী করীম (সা.) পিতা-পুত্রকে সামনা-সামনি হতে দেখে ছুটে এসে হযরত আবু বকর (রা.)-এর গতিরোধ করেন।

"তরবারী কোষবদ্ধ কর আবু বকর।" রাসূল (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে নির্দেশ দেন এবং তাঁকে নিয়ে পিছে চলে যান।

॥ বার ॥

সেদিনের যুদ্ধের আওয়াজ হযরত খালিদ (রা.)-এর কানে এখনও বাজছিল। রণাঙ্গনের বিভিন্ন খণ্ডচিত্র তাঁর চোখের স্ক্রীন সংরক্ষণ করে রেখেছিল। একেকটি পলক তাঁর সামনে একেকটি দৃশ্যের অবতারণা করছিল। মল্লযুদ্ধ শেষ হতেই কুরাইশ বাহিনী মুজাহিদদের উপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নবী করীম (সা.) উহুদ পাহাড়কে পশ্চাতে রেখে অবস্থান এবং সৈন্যবিন্যাস করেছিলেন বিধায় পশ্চাৎ আক্রমণের কোন সম্ভাবনা ছিল না। এটা ছিল এক বিরাট রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। সংখ্যায় মুসলমানরা কম থাকলেও আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং অস্ত্র পরিচালনার নৈপুণ্যতা দ্বারা এ ঘাটতি পূরণ করে দিয়েছিলেন। কুরাইশদের সংখ্যা তিনগুণ না হলে তারা মুজাহিদ বাহিনীর সামনে দাঁড়াতেই পারত না। সৈন্যাধিক্যের বলে তারা লড়ে যাচ্ছিল মাত্র।

হযরত খালিদ (রা.)-এর দৃষ্টি সেদিন রাসূল (সা.)-এর উপর নিবদ্ধ ছিল। তিনি এক পার্শ্ববাহিনীতে অবস্থান করছিলেন। তার একান্ত আশা ছিল এই বাহিনীর প্রতি আক্রমণ করার। তিনি অধীনস্থ অশ্বারোহী দলকে সংকীর্ণ রাস্তা অতিক্রম করে দ্রুত এগিয়ে যাবার এবং মুসলমানদের প্রতি একযোগে অতর্কিত আক্রমণের নির্দেশ দেন। কিন্তু তার ইচ্ছায় বাঁধ সাধে হযরত আব্দুল্লাহ বিন জুবাইরের চৌকস তীরন্দাজ বাহিনী। তীরন্দাজ মুজাহিদরা খালেদ বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পশ্চাদপসারণে বাধ্য করে। এখানে তাঁর অনেক অশ্ব ও সৈন্য খোয়া যায়। বিপুল জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করে পিছু হটার সময় তাদের সাথে ছিল কয়েকটি ঘোড়া এবং আহত সৈন্যের এক দীর্ঘ লাইন। নিহত সৈন্য আর ঘোড়া সেখানেই পড়ে থাকে।

যুদ্ধ ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। উভয় পক্ষ জীবন বাজি রেখে সমরশক্তি প্রদর্শনে লিপ্ত। সবাই যুদ্ধে ব্যস্ত। কিন্তু এক ব্যক্তি ছিল এর ব্যতিক্রম। সে যুদ্ধ করছিল না। সে একটি বর্শা হাতে রণাঙ্গনে চক্কর দিচ্ছিল। যেন কাউকে খুঁজছে। এ লোকটির নাম ওয়াহশী বিন হারব। সে নিয়মিত যুদ্ধ এড়িয়ে হযরত হামজা (রা.)-কে খুঁজে ফিরছিল। হযরত হামজা (রা.)-ই আজ তার প্রধান টার্গেট। কৌশলে তাকে হত্যা করতে চায় সে। তাঁকে হত্যা করতে পারলে ডবল পুরস্কার তার জন্য অপেক্ষমাণ। প্রথমত দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভ। দ্বিতীয়ত আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার শরীরের সকল অলঙ্কারের মালিকানা।

এক সময় সে হযরত হামযা (রা.)-এর দেখা পায়। তিনি সিবা বিন আব্দুল উযযার প্রতি অগ্রসর হচ্ছিলেন। তৎকালীন আরব সমাজে মহিলারা খৎনা করত।

ঐতিহাসিক ইবনে হিশামের বর্ণনামতে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেও আরবে খৎনার প্রচলন ছিল। হযরত হাময়া (রা.) যে সিবার প্রতি চড়াও হন তার মাতা খৎনা করত।

"খৎনাকারিণীর পুত্র!" হযরত হাময়া (রা.) হুঙ্কার দিয়ে বলেন—এদিকে আয় এবং শেষবারের মত আমাকে দেখে নে।"

সিবা বিন আব্দুল উযযা হাময়া (রা.)-এর দিকে অগ্রসর হয়। ক্রোধে তার চেহারা সম্পূর্ণ লাল হয়ে উঠেছিল। তরবারী চালনায় ভীষণ পটু ছিল সে। হাময়া (রা.)ও তার থেকে কোন অংশে কম ছিলেন না। পরস্পর মুখোমুখী হয় এবং আঘাত পাল্টা আঘাত চলতে থাকে। ঢাল উভয়ের হামলা ব্যর্থ করে দিচ্ছিল। সিবা পার্শ্ব পরিবর্তন করে করে কৌশলী হামলা চালায়। কিন্তু 'ঢাল' তলোয়ারের মাঝপথে এসে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

এ সময় ওয়াহশী অতি সন্তর্পণে গুড়ি মেরে মেরে আসে। উঁচু-নিচু টিলা তাকে লুকিয়ে রাখে। হযরত হাময়া (রা.)-এর দৃষ্টি ছিল শত্রুর প্রতি নিবদ্ধ। সিবা ছাড়া আর কেউ তাঁর নজরে আসে না।

ওয়াহশী নিজেকে আড়াল করে এক সময় নিকটে পৌঁছে যায়। নিশানায় বর্শা নিক্ষেপে সে ছিল অদ্বিতীয়। সে হযরত হাময়া (রা.)-এর এত নিকটে পৌঁছে যায় যেখান থেকে তার নিক্ষিপ্ত বর্শা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। এবার আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। বর্শা হাতে তোলে। প্রয়োজনীয় পজিশন নেয়। মোক্ষম সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। হযরত হাময়া (রা.)-কে গুপ্ত হত্যার প্রস্তুতি যখন চূড়ান্ত; অস্ত্র নিক্ষেপ বাকী মাত্র, তখন তিনি আক্রমণের পর আক্রমণ করে সিবাকে প্রায় কোণঠাসা করে ফেলেছেন। এক সময় তিনি প্রচণ্ড বেগে তরবারী চালালে তরবারী সরাসরি সিবার পেটে গিয়ে আঘাত হানে। তিনি তরবারী এমনভাবে টেনে বের করেন যে, এতে তার পেট আরো ফেঁড়ে যায়। সিবা হযরত হাময়া (রা.)-এর পায়ের উপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

হযরত হাময়া (রা.) নিজেকে সামনে নিতে তৎপর। এরই মধ্যে ওয়াহশী পূর্ণ শক্তিতে বর্শা ছুঁড়ে মারে। ব্যবধান একেবারে কম ছিল। বর্শা পেটের এত গভীরে ঢুকে যায় যে, তার ছুঁচালো মাথা পৃষ্ঠদেশ ভেদ করে যায়। অতর্কিত এ মারাত্মক আক্রমণে তিনি সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়েননি। এদিক-ওদিক নজর ঘুরিয়ে হন্তাকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেন। নজর ঘুরাতেই ওয়াহশীকে দেখতে পান। পেটের বর্শা নিয়েই তিনি তার দিকে ছুটে যান। ওয়াহশী নিজ স্থানেই দাঁড়িয়ে থাকে। হযরত হাময়া (রা.) বেশী দূরে যেতে পারেন না। চার-পাঁচ কদম আগে

বেড়েই জমিনে লুটিয়ে পড়েন। ওয়াহশী দূরে দাঁড়িয়েই তার শরীরের নড়াচড়া দেখতে থাকে। দেহ নিথর হয়ে গেলে ওয়াহশী তাঁর মৃতদেহের কাছে আসে। হযরত হামযা (রা.) শহীদ হয়ে যান। ওয়াহশী তাঁর শরীর থেকে বর্শা বের করে চলে যায়। সে ফিরে গিয়ে হিন্দা এবং তার মনিব জুবাইর বিন মুতঈমকে খুঁজতে থাকে।

॥ তের ॥

উহুদের বিভিন্ন খণ্ডচিত্র হযরত খালিদ (রা.)-এর চোখে যতই ভাসতে থাকে তাঁর অন্তর ততই ভারাক্রান্ত হয়। ঘোড়া তাঁকে নিয়ে চলছিল আপন মনে। নিম্নবর্তী অঞ্চল অতিক্রম করায় উহুদের পর্বতশৃঙ্গ দৃষ্টিপথ থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল। তাঁর গোত্রের মহিলাদের কথা হঠাৎ মনে পড়ে যায়। তারা কুরাইশ ও সমমনা অন্যান্য গোত্রের মাঝে বীরত্ব ও রক্তে স্প্রীট সরবরাহ করছিল। হযরত খালিদ (রা.)-এর আরো মনে পড়ে যে, তিনি যুদ্ধের পুরো দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন করার জন্য নিকটবর্তী একটি উঁচু টিলায় আরোহণ করেন। এখান থেকে তিনি মুসলিম নারীদের দেখতে পান। রণাঙ্গন হতে আহতদের নিয়ে এসে তাদের হাতে সোপর্দ করা হত। তারাই তাদের সেবা-শুশ্রূষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করত। পিপাসার্তদের পানি পান করাত। এমন মহিলার সংখ্যা ছিল সর্বোচ্চ চৌদ্দ। নবী-দুহিতা হযরত ফাতেমা (রা.)ও ছিলেন তাদের মধ্যে।

তীব্র সংঘর্ষ। কিছুক্ষণ উভয় পক্ষের মাঝে তুমুল যুদ্ধ চলে। কুরাইশদের জোশ ক্রমেই স্তিমিত হতে থাকে। এক সময় স্বল্পসংখ্যক মুজাহিদ বাহিনী বিশাল কুরাইশ বাহিনীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। কুরাইশদের পতাকা ধারণকারী একজন নিহত হলে আরেকজন এসে পতাকা তুলে ধরত। এভাবে পতাকা কয়েকবার ভূলুণ্ঠিত হয়। শেষদিকে এক গোলাম এসে পতাকা তুলে ধরে, কিন্তু সেও মারা যায়। মুসলিম বাহিনী এরপরে কুরাইশদের আর কাউকে পতাকা তোলার সুযোগ দেয় না। কুরাইশরা রণে ভঙ্গ দেয়।

হযরত খালিদ (রা.) কুরাইশ বাহিনীর পশ্চাদপসারণের দৃশ্য তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন। মুসলিম বাহিনী কর্তৃক তাদের পশ্চাদ্ধাবনও তাঁর নজরে আসে। কুরাইশরা রণে ভঙ্গ দিয়ে সেনা ক্যাম্পেও দাঁড়ায় না। জিনিসপত্র ফেলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় সবাই পলায়ন করে। মুসলমানরা বিজয়ের আনন্দে এবং প্রতিশোধের স্পৃহায় কুরাইশদের ক্যাম্পে চড়াও হয়। আনন্দ-শ্লোগান আর বিজয়-উল্লাসে চারদিক মুখরিত করে তোলে। কুরাইশরা এমন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করে যে, যাবার সময় মহিলাদের ব্যাপারে চিন্তা করার ফুরসতও তারা

পায় না। বাধ্য হয়ে পায়ে হেঁটেই তারা পালাতে থাকে। কিন্তু মুসলমানরা তাদের প্রতি চোখ তুলে তাকায় না।

অশ্বারোহী দু'দলের একটির কমান্ডার ইকরামা। আর অপর দলের কমান্ডার হযরত খালিদ (রা.) নিজে। তাদের লক্ষ্য ছিল, পার্শ্ব-বাহিনীকে হামলা করে পর্যুদস্ত করে দেয়া। তারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে যুদ্ধের গতি আশঙ্কাজনক অবস্থার দিকে মোড় নেয়। যুদ্ধ কুরাইশদের সম্পূর্ণ প্রতিকূলে চলে যায়। তারপরেও ইকরামা ও হযরত খালিদ (রা.) নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে পূর্বের স্থানে অবস্থান করতে থাকে। চরম নৈরাশ্যজনক এ অবস্থার মধ্যেও হযরত খালিদ (রা.)-এর আশা ছিল যে, তিনি শেষ পর্যন্ত পরাজয়কে বিজয়ে রূপান্তরিত করতে পারবেন। তিনি সম্মুখ দিক হতে নয়; বরং এক পার্শ্ব দিয়ে মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদগ্রীব ছিলেন। কিন্তু এটা মোটেও সহজ ও ঝুঁকিমুক্ত ছিল না। এর জন্য মরণ ফাঁদসম এক সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ অতিক্রম করা ছিল অনিবার্য। সুড়ঙ্গ উৎরে যেতে একবার উদ্যোগও নিয়েছিলেন, কিন্তু পূর্ব প্রস্তুত মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনী তাদের অগ্রযাত্রা রুখে দেয়। এতদসত্ত্বেও হযরত খালিদ (রা.) এখনও এই সুড়ঙ্গ পথ ব্যবহারের দূর সম্ভাবনার অপেক্ষায় প্রহর গুণতে থাকেন। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। মোক্ষম সুযোগ চলে আসে তাঁর হাতের মুঠোয়।

তীরন্দাজ বাহিনী তাদের পজিশন থেকে কুরাইশদের পলায়নের দৃশ্য দেখতে পায়। পলায়নপর বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের মাল-সম্পদ হস্তগত করাটাও তাদের নজর এড়ায় না। গনীমতের মালের আশায় তীরন্দাজরা এক এক করে তাদের পজিশন ছেড়ে যায়। কমান্ডার আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.) তাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। 'আমার দ্বিতীয় নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কেউ স্থান ত্যাগ করবে না'—রাসূল (সা.)-এর নির্দেশটি দ্বিতীয়বার স্মরণ করিয়ে দেন। কিন্তু কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করে না।

"যুদ্ধ শেষ।" তীরন্দাজ দলটি একথা বলতে বলতে পাহাড়ের ঘাঁটি থেকে নিচে নেমে আসে—"গনীমতের মাল আমাদের। আমরা বিজয় লাভ করেছি।"

কমান্ডারের সাথে থাকে মাত্র নয়জন তীরন্দাজ।

স্যাটেলাইটের মত হযরত খালিদ (রা.)-এর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিষয়টি সাথে সাথে ধরা পড়ে। দৃশ্যটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি চুম্বকের মত আটকে যায়। তাঁর কাছে এটা স্বপ্নের মত মনে হয়। তিনি এমন একটি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু তা যে এত শীঘ্র অতি সহজে হাতের মুঠোয় এসে যাবে তা ছিল কল্পনাতীত।

তিনি পজিশন ছেড়ে যাওয়া তীরন্দাজদের উপর গভীর দৃষ্টি রাখেন। যখন তিনি নিশ্চিত হন যে, তারা কুরাইশদের ক্যাম্পে পৌঁছে গনীমতের মাল সংগ্রহে লিপ্ত, তখন তিনি অশ্বারোহী দল নিয়ে গিরিপথে অবস্থানরত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.) ও তাঁর অধীনস্থ নয় তীরন্দাজের প্রতি তীব্র আক্রমণ করেন। হযরত খালিদ (রা.) চাইলে তাদের এড়িয়েও যেতে পারতেন, কিন্তু প্রতিশোধ স্পৃহা তাঁকে পাগল করে তুলে। তাঁর অশ্বারোহী দলটি পাহাড়ে উঠতে থাকলে উপর থেকে তীরন্দাজগণ তাদেরকে তীরাহত করতে থাকে।

ইকরামা হযরত খালিদ (রা.)-কে গিরিপথে আক্রমণ করতে দেখে সেও নিজে বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছে। তার অশ্বারোহী বাহিনীও চতুর্দিক থেকে উপরে উঠতে থাকে। তাদের কাছেও তীর ছিল। তারাও তীরের জবাব তীরের মাধ্যমে দিতে থাকে। মাত্র নয়জনের পক্ষে বিশাল অশ্বারোহী বাহিনীর গতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। অশ্বারোহীরা এক সময় সুড়ঙ্গ মুখে পৌঁছে যায়। তীর রেখে এবার তারা তরবারী ধারণ করে। কিছুক্ষণ পাল্টা-পাল্টি হামলা চলে। এক সময় সবাই আহত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। খালিদ আহতদেরকে পাহাড়ের উপর থেকে নিচে ছুঁড়ে মারে। তীরন্দাজ-কমান্ডার আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)ও শহীদ হয়ে যান।

গিরিপথ দখলের পর হযরত খালিদ (রা.) ও ইকরামা নিজ নিজ বাহিনীকে নিচে নামায়। মুসলিম বাহিনী যেখান থেকে যুদ্ধের সূচনা করে সেখানে গিয়ে তারা সমবেত হয়। হযরত খালিদের নির্দেশে উভয় কমান্ডার একযোগে মুসলিম বাহিনীর উপর আক্রমণ করে। মুসলমানরা মূলত এ সময় যুদ্ধের অবস্থায় ছিল না। নবী করীম (সা.)-এর সাথে কিছু সংখ্যক মুজাহিদ তখনও অবস্থান করছিল। এ জানবাজ মুজাহিদগণ অশ্বারোহীদের মোকাবেলায় ঈগলের মত ছুটে গিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

কুরাইশদের সাথে আগত নারীরাও পলায়ন করেছিল। কিন্তু উমরা নাম্নী জনৈকা মহিলা পলায়নে ব্যর্থ হয়ে নিকটবর্তী কোথাও আত্মগোপন করেছিল। মুসলিম বাহিনীর উপর কুরাইশ অশ্বারোহী বাহিনীর পুনঃ হামলা করতে দেখার সময় কুরাইশদের ভূলুণ্ঠিত পতাকার প্রতি তার নজর পড়ে। এক সুযোগে সে পতাকাটি উঠিয়ে উঁচু করে তুলে ধরে।

এদিকে আবু সুফিয়ানও পলায়নপর পদাতিক সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছিল। হঠাৎ পশ্চাৎ পানে তাকালে পত পত করে বাতাসে উড়া কুরাইশদের পতাকাটি তার দৃষ্টিতে আটকে যায়। "হুবল জিন্দাবাদ, উযযা

জিন্দাবাদ" শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে সে পদাতিক সৈন্যদেরকে সংগঠিত করে ময়দানে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসে এবং মুসলমানদেরকে ঘিরে ফেলে।

হযরত খালিদের আরেকটি কথা আজ ভীষণভাবে মনে পড়ে। তিনি সেদিন হত্যার জন্য রাসূল (সা.)-কে অন্বেষণ করে ফিরেন। আর আজ চার বছর পর সে তাঁরই কাছে মদীনা যাচ্ছে। এ মুহূর্তে তাঁর মন-মনন জুড়ে নবী করীম (সা.)-এর প্রিয় সত্তা বিরাজমান।

॥ চৌদ্দ ॥

পাহাড়ের দল আকাশ ফুঁড়ে বের হতে থাকে। ঘোড়াও চলছিল আয়েশী ভঙ্গিতে। শ্লথ গতিতে। হযরত খালিদ (রা.) বাস্তব জগত ছেড়ে ভাবের জগতে চলে যান। এই ভাবোন্মত্তায় কখনো তাঁর চলার গতি হয়ে পড়ছিল অতি মন্থর আবার কখনো বা হুট করে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেন খুব কষে। তিনি আপন মনে চলতে থাকেন শুধু। অথচ গন্তব্য তাঁর কাছে এখনো স্পষ্ট নয়, মঞ্জিল অনির্ধারিত। কখনো তাঁর মনে হয়, এক সম্মোহনী শক্তি তাঁকে সম্মুখপানে টেনে নিয়ে চলছে আর সে মন্ত্রমুগ্ধের মত তার অনুসরণ করছে মাত্র। আবার কখনো অনুভব করেন যে, দেহাভ্যন্তর থেকে সৃষ্ট একটি শক্তি যেন তাঁকে পিছে হটিয়ে দিচ্ছে।

"খালিদ!" একটি আওয়াজ তাঁর কর্ণকুহরে তরঙ্গের ন্যায় আঘাত করে। এটা তাঁর দেহাভ্যন্তরেরই একটি কাল্পনিক আওয়াজ। কিন্তু তাঁর কাছে এটা বাস্তব মনে হয়। তিনি ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে সামনে-পিছনে দৃষ্টি বুলিয়ে আওয়াজের উৎস তালাশ করেন। অথচ সেখানে বালুরাশি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আবারো তিনি শুনতে পান—"খালিদ! যা শুনলাম তা কি সত্য?" এবার তিনি কণ্ঠ চিনে ফেলেন। নিশ্চিত হয়ে যান যে, এটা তাঁর সাথী ইকরামার কণ্ঠস্বর। একদিন আগে ইকরামা তাকে বলেছিল—"যদি তুমি মনে করে থাক যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র প্রেরিত নবী, তবে এই ধারণা মন থেকে মুছে ফেল। সে আমাদের অসংখ্য আত্মীয়-স্বজনের হত্যাকারী। তোমার গোত্রের মানসিকতা অনুভব কর। তারা সূর্যাস্তের পূর্বেই মুহাম্মাদের হত্যায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।"

হযরত খালিদ (রা.) লাগাম মৃদু টান দেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়া ইঙ্গিত মোতাবেক চলতে শুরু করে। চার বছর পূর্বের স্মৃতিতে তিনি আবার ফিরে যান। মনে পড়ে যায়, উহুদ রণাঙ্গনে তিনি নবী করীম (সা.)-কে হন্যে হয়ে খুঁজেন। দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন, যে কোন মূল্যে সূর্যাস্তের পূর্বে নবী করীম (সা.)-কে

হত্যার মাধ্যমে কুরাইশদের শপথ তিনি পূরণ করেই ছাড়বেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জানবাজ মুজাহিদদের অসীম সাহসিকতায় তাঁর ইচ্ছা আর পূরণ হয় না।

মুসলিম বাহিনী বিপর্যস্ত। খালেদ বাহিনীর কৌশলী ও অতর্কিত হামলায় মুজাহিদরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। বল চলে যায় মুসলমানদের কোর্ট থেকে কুরাইশদের কোর্টে। নিশ্চিত জয় হাতের মুঠোয় এসেও ফসকে বেরিয়ে যায়। রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ না মানার ফল ছিল এটা। একটু ভুলের জন্য অর্জিত জয়ের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

দুর্ধর্ষ বাহাদুর। হযরত খালিদ (রা.) আর আবু জেহেল তনয় ইকরামা যুদ্ধ বিদ্যায় ছিল অনন্য। মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা করতে এখন তাদের সামনে কোন অন্তরায় ছিল না। আল্লাহ্ ছাড়া তাদের সাহায্য করারও ছিল না কেউ। হযরত খালিদ (রা.) দেখতে পান যে, মুসলমানরা এখন দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। বড় অংশটি মূল কমান্ডার নবী করীম (সা.)-এর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মুষ্টিমেয় কতক সাহাবী নবীজীর সাথেই ছিলেন। এ ক্ষুদ্র দলটি গনীমতের মালের পিছে না পড়ে রাসূল (সা.)-এর সাথে অবস্থান করেন। সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন বিশজনের মত। হযরত আবু দাজানা (রা.), হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.), হযরত আবু বকর (রা.), হযরত আবু উবায়দা (রা.), হযরত তালহা বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) হযরত মুসআব বিন উমাইর (রা.) প্রমুখ ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আহতদের সেবা-যত্নের উদ্দেশে আগত চৌদ্দজন মহিলাদের মধ্যে দুইজন ছিলেন নবীজীর সাথে। একজন হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) এবং অপরজন হযরত উম্মে আয়মান (রা.) নাম্নী এক হাবশী মহিলা। হযরত উম্মে আয়মান (রা.) নবীজী (সা.)-এর ভূমিষ্ঠের সময় ধাত্রী ছিলেন। অবশিষ্ট বারজন মহিলা তখনও পর্যন্ত আহতদের উদ্ধার এবং তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

হযরত খালিদ (রা.) সন্ধানী দৃষ্টি মেলে নবী করীম (সা.)-কে খুঁজেন। তাঁর পক্ষে যুদ্ধের ময়দানে বেশী ঘোরাফেরা করা সম্ভব ছিল না। কারণ তাঁর অধীনে একটি অশ্বারোহী দল ছিল। তাঁর উপস্থিতিই তাদেরকে সংঘবদ্ধ ও সুসংহত করে রাখে। তিনি আনাড়ির মত হামলার পক্ষপাতি ছিলেন না। তাঁর নীতি ছিল শত্রুর দুর্বল পয়েন্টে এমন আঘাত কর, যেন দ্বিতীয় আঘাত করার আগেই তারা মুখ থুবড়ে পড়ে।

আজ দীর্ঘ চার বছর পর যখন তিনি মরুভূমি মাড়িয়ে চলছেন, তখন তাঁর মন-মস্তিষ্কে রীতিমত ঘোড়া দৌড়াচ্ছিল। তীর-কামানের আওয়াজ তাঁর কানে ভাসে। মুসলিম বাহিনীর নারা-ধ্বনি তাঁর স্মৃতিতে ঝংকার তোলে। এই নারা-ধ্বনি শুনে তাঁর মনে হয়েছিল, নিজেদেরকে অকুতোভয়, নির্ভীক ও মৃত্যুভীতিমুক্ত প্রকাশ করতে মুসলমানরা এভাবে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলছে। একরাশ ঘৃণা আর তাচ্ছিল্যতায় আরেকবার তাঁর ওষ্ঠদ্বয় মুচকি হেসে ওঠে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, মুসলমানদের অধিকহারে হত্যা করা হবে, রাজবন্দী বানানো হবে কম। নবী করীম (সা.)-এর অবস্থান তিনি এখনও শনাক্ত করতে পারেননি। ইতিমধ্যে রণাঙ্গনের অপর প্রান্তে চেয়ে দেখেন, আবু সুফিয়ান পলায়নপর কুরাইশদের সুসংহত করে পুনঃপ্রত্যাবর্তন করছে। সে এসেই কমান্ডার-বিচ্ছিন্ন মুসলিম সেনা ইউনিটের বড় দলটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুসলমানরাও বীরবিক্রমে জীবনবাজি রেখে লড়ে চলছে। জীবনের শেষ যুদ্ধ মনে করে তারা অমিততেজ আর বীরত্বের এমন নৈপুণ্য প্রদর্শন করে যে, সংখ্যায় বেশী হওয়া সত্ত্বেও কুরাইশরা আবার বিপর্যয়কর অবস্থায় পতিত হয়।

কুরাইশদের বিপদ আঁচ করে হযরত খালিদ (রা.) রীতিমত অগ্নিগোলকে পরিণত হন। তিনি অধীনস্থ বাহিনীকে একযোগে মুসলমানদের উপর তুফান সৃষ্টির নির্দেশ দেন। নিজের তরবারী কোষবদ্ধ করেন। হাতে তুলে নেন প্রলয়ংকারী বর্শা। তিনি পার্শ্বদিক হতে মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। পরিস্থিতি অনুকূলে আনতে তিনি নতুন কৌশল অবলম্বন করেন। অনন্য বীরত্ব প্রদর্শনকারী মুজাহিদদের বেছে বেছে বর্শা নিক্ষেপ করতে থাকেন। তার বর্শায় কোন মুজাহিদ বধ হলে আনন্দ প্রকাশ করতে চিৎকার করে বলতেন—'আমি আবু সুলাইমান'-প্রতিটি বর্শার সাথে তার উচ্চকিত আওয়াজ শুনা যেত আমি আবু সুলাইমান।

চার বছর পর মদীনা গমনকালে আজ আবার তাঁর কর্ণকুহরে ঝংকার তোলে—"আমি আবু সুলাইমান। তিনি স্পষ্টভাবে মনে করতে পারেন না যে, তাঁর বর্শা সেদিন কয়জন মুসলমানের শরীর ভেদ করে যায়। তিনি সেদিন কিছু সময়ের জন্য রাসূল (সা.)-এর কথা ভুলে যান। পরক্ষণেই খবর পান যে, মুসলিম বাহিনী রাসূল (সা.)-এর নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং ইকরামা নবী করীম (সা.)-এর অবস্থান শনাক্ত করে তাঁর নিকট পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে।

সংবাদ সত্য। বাস্তবেও মুসলমানদের উপর নবীজী (সা.)-এর নিয়ন্ত্রণ ছিল না। যুদ্ধ পরিস্থিতি এমন বিপজ্জনক স্থানে গিয়ে দাঁড়ায় যে, বিক্ষিপ্ত বাহিনীকে

সুসংগঠিত করে যুদ্ধকে আবার অনুকূলে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। কিন্তু নবী করীম (সা.) নিজের ও সাথীদের জীবন বাঁচাতে রণাঙ্গন ত্যাগ করা সমীচীন মনে করেন না। অথচ বাস্তব অবস্থার দাবী ছিল এ মুহূর্তে ময়দান ছেড়ে যাওয়া। তিনি একটি ভাল পজিশন খুঁজছিলেন। কারণ, তাঁর জানা ছিল যে, কুরাইশরা তাঁকে খুঁজছে এবং সন্ধান পেলেই তাঁকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ সংঘর্ষ বাঁধবে। সবদিক বিচার করে অবশেষে একটি পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হন। সাথে অবস্থানরত সাহাবায়ে কেরাম নিরাপত্তার জন্য তাঁকে বৃত্তাকারে ঘিরে রাখেন।

অতর্কিত আক্রমণ। নবী করীম (সা.) নিকটবর্তী পাহাড়ের উদ্দেশে কিছু দূর যেতেই ইকরামা তার অশ্বারোহী ইউনিট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাসূল (সা.)-এর প্রতি ইকরামার আক্রমণের খবর জনৈক পদাতিক সৈন্য জানতে পেরে সেও আক্রমণ শুরু করে। এতে নবী করীম (সা.)সহ কারো বেঁচে থাকার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়ে যায়। ত্রিশজন পুরুষ আর দুইজন মহিলা সর্বমোট বত্রিশ জন রসূল-প্রেমিক নবী করীম (সা.)-এর হেফাজতে তাঁর চারপাশে মানব প্রাচীররূপে দাঁড়িয়ে যান।

অনেক পিছনের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে হযরত খালিদ (রা.)-এর মনে পড়ে যে, রাসূল (সা.) দৈহিক শক্তির বিচারেও অনন্য ছিলেন। তার জ্বলন্ত প্রমাণ, আরবের নামকরা মুষ্টিযোদ্ধা রিকানাকে তিনি তিন তিনবার উর্ধ্বে তুলে আছাড় দিয়েছিলেন। যুদ্ধের এ বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে তার শক্তি প্রদর্শনের আরেকবার সুযোগ আসে। মানববর্মের ঐ প্রাচীর যা নিবেদিত প্রাণ সাহাবায়ে কেরাম তাঁর চারপাশে লৌহবৎ স্থাপন করেছিল তা তিনি নিজেই ভেঙ্গে ফেলেন। তাঁর হাতে তখন শোভা পাচ্ছিল ধনুক। তুনীর ছিল তীরে ভরা। এ সময় হযরত খালিদ (রা.) মুসলমানদের বড় অংশটির সাথে শক্তি পরীক্ষায় রত ছিলেন। তাঁকে যখন পরবর্তীতে জানানো হয় যে, ত্রিশজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা যোদ্ধা নিয়ে নবী করীম (সা.) কুরাইশ অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর সাথে ভীষণ যুদ্ধ করে চলছেন, তখন তার মুখ হতে আবার এ কথা বের হয় যে, এটা দৈহিক শক্তির নৈপুণ্য হতে পারে না; অদৃশ্য কোন শক্তির কারসাজিই হবে। এ সময় থেকে একটি প্রশ্ন তাঁকে ভীষণ তাড়া করে ফেরে—'দৃঢ় বিশ্বাস কি কখনো শক্তির রূপ ধারণ করতে পারে?' তাঁর গোত্রের কারো থেকে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার অবকাশ ছিল না। কারণ এ প্রসঙ্গ তুলতেই তাঁর প্রতি এ অপবাদ আরোপ করা হত যে, সে মুহাম্মাদের জাদুর শিকার। মুহাম্মাদ তাঁকে জাদু করে ফেলেছে। এ ধরনের উদ্ভট প্রশ্ন তাঁরই প্রতিক্রিয়া মাত্র।

আজ মদীনায় যাবার বেলায় ঐ পুরাতন প্রশ্নটি আবার তাঁর মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। উহুদের পাহাড়ের সারি ক্রমে তাঁর সামনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। চার বছরের পিছনের স্মৃতি তাঁকে আবার ঐ পাহাড়ের পাদদেশে নিয়ে যায় যেখানে তাঁর নিজের নাম গুঞ্জরিত হচ্ছিল—"আবু সুলাইমান! আবু সুলাইমান!"

তিনি কল্পনায় অনুধাবন করার চেষ্টা করছিলেন যে, মাত্র ত্রিশজন পুরুষ আর দুইজন মহিলা কিভাবে বিপুল সংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের মোকাবেলা করে! রাসূল (সা.) বৃত্ত ভেঙ্গে ভেঙ্গে নিজ হাতে তীর ছুঁড়েন। সাহাবায়ে কেরাম দৌড়ে গিয়ে আবার তাঁকে বৃত্তের মাঝে করে নিতেন। এক সমর ঐতিহাসিকের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তাঁকে ঘিরে রাখা বৃত্ত তিনি বারবার ভেদ করে যেদিক হতে শত্রু অগ্রসর হত সেদিকে তীর নিক্ষেপ করতেন। তাঁর দৈহিক শক্তি সাধারণ মানুষ থেকে কয়েক গুণ বেশী ছিল। তিনি ধনুক এত বেগে টানতেন যে, তীরের ফলা শরীরের এপাশ দিয়ে ঢুকে ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে যেত। সেদিন তিনি অনেক তীর ছুঁড়েন। এত তীর ছুঁড়েন যে, এক সময় একটি তীর নিক্ষেপ করতে গেলে ধনুকই ভেঙ্গে যায়। তখন তিনি তুনীরের অবশিষ্ট তীর হযরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)-কে দিয়ে দেন। সাদ (রা.)-এর নিশানা ছিল অব্যর্থ। তা এড়ানো কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। নবী করীম (সা.) নিজেও তার অব্যর্থ নিশানার কথা স্বীকার করতেন।

ঘোরতর যুদ্ধ। ওদিকে আবু সুফিয়ান এবং হযরত খালিদ (রা.) মুসলমানদের শহীদ করতে থাকে আর মুসলমানরা জীবনের শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত মোকাবেলা করে যায়। আর এদিকে রাসূল (সা.)-এর প্রতি উৎসর্গপ্রাণ ত্রিশজন পুরুষ আর দুইজন মহিলা এমন বেপরোয়া হামলা-প্রতিহামলা চালায়, যেন তাদের শরীর নয়; আত্মা বিরামহীন লড়ে চলেছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা তবারী লেখেন যে, এক একজন মুসলমান একই সাথে চার-পাঁচজন কুরাইশের মোকাবেলা করেন। সে লড়াইয়ের চিত্র এত ভয়ঙ্কর ছিল যে, হয়তবা সাহাবী তাদের পিছু হটতে বাধ্য করতেন নতুবা তিনি একাকী জখমে জর্জরিত হয়ে লুটিয়ে পড়তেন।

॥ পনের ॥

প্রস্তর বর্ষণ। কুরাইশরা নবীজীর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ সাহাবায়ে কেরামের অসাধারণ বীরত্বের সামনে টিকতে না পেরে কিছুটা পিছু হটে তীর আর পাথরের অবিরাম বর্ষণ শুরু করে। অতি উৎসাহী কিছু অশ্বারোহী দ্রুত অশ্ব ছুটিয়ে নবী করীম (সা.)-এর উপর আক্রমণোদ্যত হলে সাহাবায়ে কেরামের তীর তাদেরকে

ফিরে যেতে বাধ্য করে। এই পরিস্থিতি উত্তরণের জন্য কুরাইশরা সম্মুখ যুদ্ধ পরিহার করে দূর থেকে মুষলধারায় তীর এবং পাথর ছুঁড়তে থাকে।

ইকরামা হযরত খালিদ (রা.)-কে এক ফাঁকে জানিয়ে দেয় যে, আবু দাজানা (রা.) নবী করীম (সা.)-এর সম্মুখে দণ্ডায়মান। তার পিঠ শত্রুপক্ষের দিকে। তিনি এক সাথে দু'দায়িত্ব পালন করে চলছিলেন। প্রথমত হযরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)-কে তীর যোগান দিচ্ছিলেন। আর সাদ (রা.) ক্ষিপ্রতার সাথে সে তীর মারছিলেন। দ্বিতীয়ত হযরত আবু দাজানা (রা.) নবী করীম (সা.)-কে তীর থেকে রক্ষা করতেও চেষ্টা করছিলেন। তীর এবং পাথর বৃষ্টির দরুন হযরত আবু দাজানা (রা.)-এর মারাত্মক অবস্থা কারো চোখে পড়ে না। এক সময় তিনি লুটিয়ে পড়লে দেখা যায় যে, তার পিঠ অসংখ্য তীরের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে চালনীর মত হয়ে গেছে।

প্রাণপ্রিয় রাসূল। কলিজার টুকরা রাসূল (সা.)-কে বাঁচাতে সেদিন কয়েকজন সাহাবী নিজের জীবন বিসর্জন দেন। সাহাবায়ে কেরামের দুর্ধর্ষ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও রণমূর্তি দেখে ইকরামার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর উপর এমন ভীতি সঞ্চারিত হয় যে, তারা পিছে হঁটে যায়। দীর্ঘ যুদ্ধে কুরাইশরা ক্লান্তও হয়ে পড়েছিল বেশ। এই সুযোগে রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা জানতে চেষ্টা করেন। চারদিকে চোখ বুলিয়ে শুধু রক্ত আর রক্তই তিনি দেখতে পান। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার কোন সুযোগ ও পরিবেশ ছিল না। শত্রুরা আরেকবার আক্রমণের অপেক্ষায় ছিল।

"কুরাইশদের আরেক ব্যক্তির অপেক্ষায় আছি আমি।" রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে বলেন।

"হে আল্লাহ্র রাসূল! সে কে?" জনৈক সাহাবী উৎসুক হয়ে নবী করীম (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন—"সে কি আমাদের সাহায্য করতে আসছে?"

"না।" রাসূল (সা.) জবাবে বলেন—"সে আমাকে হত্যা করতে আসবে। এতক্ষণ তার এসে পড়ার দরকার ছিল।"

"কিন্তু সে কে? কি তার পরিচয়?" বিস্ময় বিমূঢ় সকলের নেত্রে জিজ্ঞাসু চাহনি।

"উবাই ইবনে খল্ফ" সকল কল্পনা-জল্পনার অবসান ঘটাতে রাসূল (সা.) পাপীষ্ঠের নাম বলে দেন।

উবাই ইবনে খল্ফ ছিল রাসূল (সা.)-এর কট্টর বিরোধী। সে মদীনার অধিবাসী ছিল। রাসূল (সা.)-এর নবুওয়াতের দাবীর কথা জানতে পেরে সে

একদিন তাঁর কাছে আসে এবং বিভিন্ন ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তিনি অতি ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে তা বরদাশত করে বিনয়ের সাথে তাকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেন।

"তুমি কি আমাকে এত দুর্বল চিত্তের মনে কর যে, তুমি বললেই তোমার ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণা আর গাজাখোরী মতবাদ মেনে নেব!" উবাই ইবনে খল্ফ ধৃষ্টতামূলক ভঙ্গিতে বলে—"আমার কথা শুনে রাখ মুহাম্মাদ! একদিন আমার ঘোড়াটি দেখে নিও। আমি তাকে যত্নের সাথে প্রতিপালন করছি। কুরাইশদের সাথে আবার কখনো তোমার যুদ্ধ বাঁধলে সেদিন আমি এই ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করে ফিরব। দেবতাদের নামে কসম করে বলছি, তোমাকে নিজ হাতে সেদিন হত্যা করব।"

"উবাই!" আল্লাহ্র রাসূল (সা.) ঠোঁটে হাসির আভা টেনে তাকে জবাবে বলেছিলেন—"জীবন-মৃত্যু ঐ সত্তার হাতে, যিনি আমাকে নবুওয়াত দান করেছেন এবং পথহারা লোকদেরকে সঠিক পথের দিশা দেয়ার দায়িত্ব আমার কাঁধে অর্পণ করেছেন। এমন কথা বলো না যা আমার আল্লাহ্ ছাড়া কেউ পূরণ করতে পারে না। এমনও তো হতে পারে যে, তুমি আমাকে মারতে এসে নিজেই মারা যাবে।"

উবাই ইবনে খল্ফ রাসূল (সা.)-এর এই কথা তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দেয় এবং বিদ্রূপের হাসি হেসে প্রস্থান করে।

উবাই ইবনে খলফের সেই কথা যুদ্ধের এই শেষ দিকে এসে রাসূল (সা.)-এর মনে পড়ে যায়। তিনি সাহাবায়ে কেরামের কাছে তার নাম নিতেই দূর থেকে এক অশ্বের খুরধ্বনি শোনা যায়। সকলের দৃষ্টি আওয়াজের উৎসের দিকে নিবদ্ধ হয়।

"আমার প্রিয় সাথীগণ!" রাসূল (সা.) সমবেত সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বলেন—"আমার মন বলছে আগন্তুক এ অশ্বারোহী সেই হবে। বাস্তবেই সে উবাই হলে বাঁধা দিবে না। তাকে আমার কাছাকাছি আসতে দিও।"

ঐতিহাসিক ওকিদী এবং ইবনে হিশাম লেখেন, বাস্তবেই সে অশ্বারোহী সেই ইবনে খল্ফই ছিল। সে হুঙ্কার ছেড়ে বলে—"প্রস্তুত হও মুহাম্মাদ! উবাই এসে গেছে।"

"দেখ আমি ঐ ঘোড়ায় চড়ে এসেছি, যা তোমাকে একদিন দেখিয়েছিলাম।"

"হে আল্লাহ্র রাসূল! তিন-চারজন সাহাবী সামনে এসে রাসূল (সা.)-কে বলেন—"অনুমতি দিন, আপনার পর্যন্ত পৌছার পূর্বেই তাকে শেষ করে দিই।"

"না।" জবাবে তিনি বলেন—"তাকে আসতে দাও। আমার কাছাকাছি আসুক...। রাস্তা খালি করে দাও।"

শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। টানটান উত্তেজনা। রাসূল (সা.)-এর মস্তকে জিঞ্জির-বিশিষ্ট শিরস্ত্রাণ শোভা পাচ্ছিল। জিঞ্জিরগুলো মাথার নড়াচড়ায় তাঁর মুখমণ্ডলের সামনে এবং আগে-পিছে হেলে-দুলে ঝুলছিল। হাতে ছিল বর্শা। তলোয়ার ছিল কোষবদ্ধ। বাঁধাহীন পথে উবাইয়ের ঘোড়া চলে আসে একেবারে নিকটে।

"সামনে আয় উবাই!" বাঘের মত গর্জন করে রাসূল (সা.) বলেন—"আমি ছাড়া কেউ তোর গায়ে হাত দেবে না।"

উবাই নিকটে এসে ঘোড়া থামিয়ে বিদ্রূপাত্মক অট্টহাসি দেয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, তার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, সে রাসূল (সা.)-কে অবশ্যই হত্যা করবে। তার তরবারীও কোষবদ্ধ ছিল। রাসূল (সা.) তার কাছে চলে আসেন। সে বড় দুর্দান্ত এবং শক্তিশালী ঘোড়ায় আসীন আর রাসূল (সা.) ছিলেন মাটিতে দাঁড়িয়ে। সে তলোয়ার কোষমুক্ত করছিল কিন্তু কোষমুক্ত হওয়ার আগেই রাসূল (সা.) সামনে অগ্রসর হয়ে তীব্র বেগে তার প্রতি বর্শা ছুঁড়ে মারেন। একদিকে ঝুঁকে সে আঘাত এড়াতে চাইলেও আঘাত তাকে এড়ায় না। রাসূল (সা.)-এর নিক্ষিপ্ত বর্শার ফলা তার ডান কাঁধের গলার পাশের হাড়ের নিচে গিয়ে বিদ্ধ হয়। এতেই সে ঘোড়ার উপর থেকে দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ে এবং তার পাঁজরের হাড় ভেঙ্গে যায়।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, রাসূল (সা.)-এর আঘাত এত ভারী ছিল না যে, উবাইয়ের মত শক্তিশালী বপুধারী লোক উঠতে পারবে না। সে ঘোড়ার অপর পার্শ্বে ভূপাতিত হয়েছিল। হয়তবা তার উপর ভীতি সঞ্চারিত হয়েছিল নতুবা রাসূল (সা.)-এর আঘাতটি তার জন্য প্রত্যাশিত ছিল। রাসূল (সা.) দ্বিতীয়বার তাকে আঘাত করতে উদ্যত হলে সে পড়িমরি করে উঠে ঘোড়া ওখানে ফেলে রেখেই দে ছুট। সে আর্তচিৎকার করতে করতে যায় যে—"মুহাম্মাদ আমাকে হত্যা করেছে...। মুহাম্মাদ আমাকে মেরে ফেলেছে।"

কুরাইশরা কয়েকজন মিলে তার ক্ষত পরীক্ষা করে তাকে সান্ত্বনা দেয় যে, তাকে কেউ হত্যা করেনি। ক্ষত একেবারে সাধারণ। কিন্তু তার মধ্যে অদৃশ্য হতে এমন এক ভীতি জেকে বসে যে, সকল সান্ত্বনা প্রত্যাখ্যান করে শুধু একথাই

বলতে থাকে যে, "আমি বাঁচব না। মুহাম্মাদ একদিন বলেছিল, আমি তাঁর হাতে **মারা** যাব।"

ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম আরো লেখেন যে, উবাই একথাও বলে যে, "মুহাম্মাদ যদি আমার প্রতি শুধু থুথুও নিক্ষেপ করত, তবুও আমি মারা যেতাম।"

শেষ পর্যন্ত উবাইয়ের কথাই সত্য হয়। উহুদ যুদ্ধ শেষে উবাই কুরাইশদের সাথে **মক্কায়** রওনা হয়। পথিমধ্যে এক স্থানে তারা যাত্রাবিরতি করলে উবাই সেখানে মারা যায়।

॥ ষোল ॥

স্মৃতি কথা কয়। চার বছর পূর্বেকার ঘটনা গতকালের ঘটনার ন্যায় হযরত খালিদ (রা.)-এর মনে পড়তে থাকে। তাঁর ধারণা ছিল, কুরাইশরা আজ মুসলমানদের নিষ্পেষিত করেই ছাড়বে। কিন্তু মুসলমানরা যেভাবে জীবন বাজি রেখে প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে থাকে তাতে তিনি নিজেই শিহরিত হয়ে ওঠেন। পদাতিক মুসলমানদের দেখে কুরাইশদের ঘোড়াও যেন ভয় পাচ্ছিল। পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকলে হযরত খালিদ (রা.) নিজের ঘোড়ায় পদাঘাত করেন এবং রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাঝে আবু সুফিয়ানকে খুঁজে তার কাছে পৌঁছে যান।

"আমরা কি মুসলমানদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার যোগ্যতা রাখি না?" হযরত খালিদ (রা.) আবু স্যুফিয়ানকে বলেন—"কুরাইশ মাতাদের দুধ কি খাঁটি ছিল না যে, তারা এই মুষ্টিমেয় মুসলমানদের ভয়ে ভীত হচ্ছে?"

"শোন খালিদ!" আবু সুফিয়ান বলে—"মুসলমানদের সাথে মুহাম্মাদ যতক্ষণ থাকবে আর তারাও জিন্দা থাকবে, দেহের শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত তারা পরাজয় বরণ করবে না।"

"তবে এই দায়িত্ব কেন আমার উপর অর্পণ করছ না?" হযরত খালিদ (রা.) বলেন।

"কখনও নয়।" আবু সুফিয়ান বলে—"তুমি নিজ সৈন্যদের কাছে ফিরে যাও। তোমার নেতৃত্ব ছাড়া তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতে পারে। মুহাম্মাদ আর তাঁর সাথীদের উপর আক্রমণ করতে পদাতিক বাহিনী পাঠাচ্ছি।"

আজ মদীনা পানে গমনকালে তাঁর সেদিনের পুরাতন আফসোসের কথা মনে পড়ে যে, আবু সুফিয়ান তাঁর একটি বড় আশা ভেঙ্গে দিয়েছিল। রাসূল (সা.)-কে হত্যা করাকে তিনি নিজের প্রধান কর্তব্য বলে মনে করতেন। রাসূল (সা.)-কে

হত্যা করে শীর্ষ দেবতা হুবল এবং উযযার সন্তুষ্টি অর্জন করা ছিল তাঁর একান্ত অভিপ্রায়। তথাপিও রণাঙ্গনে কমান্ডারের আদেশ শিরোধার্য মনে করে তিনি নিজ অনুগত বাহিনীর কাছে চলে যান। তাঁর একান্ত বিশ্বাস ছিল যে, এখন রাসূল (সা.)-এর সাথে মাত্র কয়েকজন সাহাবী রয়েছেন। অতএব এ অবস্থায় তাঁকে হত্যা করা মোটেও দুরূহ হবে না। আর একবার তাঁকে হত্যা করতে পারলে মুসলমানরা উঠে দাঁড়াবার যোগ্য থাকবে না। রণাঙ্গনের দৃশ্য তাঁর ভালভাবেই মনে ছিল। তিনি একটি উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে রণাঙ্গনের দিকে চাইলে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত উহুদ-ভূমি রক্তের গাঢ় আস্তরণে ঢেকে থাকতে দেখেন। ভূ-ভাগকে যেন কেউ লাল কার্পেটে মুড়ে দিয়েছিল। কোথাও ঘোড়া আহত হয়ে ছটফট করছিল আবার কোথাও রক্তস্নাত আহত সৈন্য কাতরাচ্ছিল। আহতদের উদ্ধার করার খেয়াল এ মুহূর্তে কারো ছিল না।

এক সময় তিনি দেখতে পান যে, কুরাইশ পদাতিক বাহিনী রাসূল (সা.)-এর নিকটে পৌঁছে গেছে। তারা বড় ধরনের আক্রমণ করে সাহাবায়ে কেরামের বৃত্ত ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। উতবা ইবনে আবী ওয়াক্কাস, আব্দুল্লাহ্ ইবনে শিহাব আর ইবনে কুময়া এ তিন কুরাইশ নরাধম রাসূল (সা.)-কে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এক ভাই উতবা যাঁর প্রাণনাশে লিপ্ত অপর সহোদরা ভাই সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) ঠিক তারই প্রাণ রক্ষার্থে নিবেদিত। এ সময় রাসূল (সা.)-এর সাথে অবস্থানরত সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা না থাকার মতই ছিল। সম্ভব তাঁরা লড়তে লড়তে বিক্ষিপ্ত ও দূরে সরে গিয়েছিলেন।

মারাত্মক আহত। উতবার নিক্ষিপ্ত একটি পাথরে নবী করীম (সা.)-এর নিচের দন্তপাটির দু'টি দাঁত ভেঙ্গে যায়। নিচের ঠোঁটটিও কেঁটে যায়। আব্দুল্লাহ পাথর মারলে তা রাসূল (সা.)-এর কপালে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। ইবনে কুময়া অতি কাছ থেকে এমন জোরে পাথর মারে যে, নবী করীম (সা.)-এর শিরস্ত্রাণের সাথে ঝুলন্ত জিঞ্জিরের দু'টি কড়া ভেঙ্গে গণ্ডদেশে ঢুকে যায়। এতে চেহারা মুবারকের হাড়ও মারাত্মক আক্রান্ত হয়। রাসূল (সা.) বর্শার সাহায্যে শত্রুর প্রতি আক্রমণ করতে খুব চেষ্টা করেন। কিন্তু শত্রু তাঁর নাগালের মধ্যে আসে না। অসংখ্য আঘাতে জর্জরিত শরীর থেকে অধিক রক্তক্ষরণের কারণে তিনি জমিনে লুটিয়ে পড়েন। হযরত তালহা (রা.) শত্রু সৈন্যের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় রাসূল (সা.)-কে লুটিয়ে পড়তে দেখে দৌড়ে তাঁর কাছে আসেন। তালহা (রা.)-এর আহ্বানে ইতিমধ্যে আরেক সাথী এসে যান। পাথর নিক্ষেপে

আহতকারী কুরাইশ নরাধম রাসূল (সা.)-এর লক্ষ্যে তলোয়ার উত্তোলন করতে উদ্যত হলে হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) সহোদরা ভাই উতবার উপর হামলা করেন। উতবা ভাইয়ের ক্রোধ ও রূদ্রমূর্তি দেখে পিছু হঁটে যায়।

হযরত তালহা (রা.) রাসূল (সা.)-কে ধরে উঠান। তিনি পুরোপুরি হুঁশে ছিলেন। এ সময় অন্যান্য মুসলমানরা আক্রমণকারীদের ভাগিয়ে দেয়। ঐতিহাসিকগণ লেখেন, হযরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)-কে নিয়ন্ত্রণে রাখা দুরূহ হয়ে পড়েছিল। তাঁর একটাই কথা ছিল—"যে ভাই আমার উপস্থিতিতে আমার নবী (সা.)-এর উপর আক্রমণ করেছে, আমি তাকে নিজ হাতে হত্যা করে তার দেহ টুকরো টুকরো করে ছাড়ব। তিনি একাই কুরাইশদের দিকে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। বড় কষ্টে তাঁকে নিবৃ করা হয়। রাসূল (সা.) তাঁকে শান্ত হওয়ার নির্দেশ না দিলে তিনি কখনোই শান্ত হতেন না।

॥ সতের ॥

থমথমে পরিস্থিতি। কুরাইশরা সম্ভবত ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। রণাঙ্গন থেকে তারা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। এ সময় সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসূল (সা.)-এর প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করার সুযোগ পান। রাসূল (সা.)-এর ক্ষত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। সাথে থাকা মহিলারা তাঁকে পানি পান করায়, ক্ষত পরিষ্কার করে। শিরস্ত্রাণের জিঞ্জিরের ভাঙ্গা কড়া তার গণ্ডদেশে বিদ্ধ ছিল। প্রখ্যাত আরব সার্জনের পুত্র হযরত আবু উবায়দা (রা.) এগিয়ে এসে কড়া দু'টি বের করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু হাত দিয়ে বের করতে ব্যর্থ হন। এরপর তিনি দাঁতের সাহায্যে একটি কড়া টেনে বের করেন। দ্বিতীয় কড়াও এভাবে দাঁত দ্বারা টেনে উঠান। কিন্তু কড়ার সাথে সাথে তাঁর দু'টি দাঁতও ভেঙ্গে যায়। এ কারণে মানুষ তাঁকে "আল্-আছরাম" বলে ডাকতে থাকে। এর অর্থ হল, যার সামনের দু'টি দাঁত নেই। পরবর্তীতে এ নাম ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে।

রাসূল (সা.)-এর ভূমিষ্ঠকালীন নার্স হযরত উম্মে আয়মান (রা.) রাসূল (সা.)-এর শরীরের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলেন। যেন কোন তীর রাসূল (সা.)-এর দেহে বিদ্ধ হতে না পারে। ইতোমধ্যে রাসূল (সা.)ও নিজেকে সামলে নেন। আচমকা একটি তীর এসে উম্মে আয়মান (রা.)-এর পিঠে বিদ্ধ হয়। সেই সাথে দূর থেকে এক অট্টহাসিও ভেসে আসে। সবার দৃষ্টি সেদিকে ঘুরে গেলে দেখা যায় যে, হিব্বান ইবনে আরাকা নামক এক কুরাইশ দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে। তার হাতে ধনুক ছিল। সদ্য বিদ্ধ তীরটি সেই নিক্ষেপ করে। সে হাসতে হাসতে ফিরে যেতে থাকে। রাসূল (সা.) হযরত সাদ (রা.)-কে একটি তীর দিয়ে বলেন,

এ পাপীষ্ঠ এখান থেকে তীর নিয়েই ফিরবে। সকলের মধ্যে তীরন্দাজিতে নামকরা ব্যক্তি হযরত সাদ (রা.) ধনুকে তীর সংযোজন করে হিব্বানকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারেন। তীর হিব্বানের গলায় গিয়ে ঢুকে পড়ে। এতে সাদ (রা.)-এর সাথের সাহাবীগণ জোরে হেসে উঠে তার যথার্থ প্রতিশোধ গ্রহণের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। হিব্বান রাগে-ক্ষোভে চোখ মোটামোটা করে কয়েক কদম সামনে এসে ঢলে পড়ে।

হযরত খালিদ (রা.) মদীনা পানে যতই এগিয়ে যেতে থাকেন, উহুদের পাহাড়গুলো হাত ধরাধরি করে ততই যেন উপরে উঠতে থাকে। এ সময় পুরাতন কিছু সাথী-সঙ্গীর কথা তাঁর মনে পড়ে যায়। আকীদা-বিশ্বাসের ভিন্নতা ভাইকে ভাইয়ের শত্রুতে পরিণত করেছিল। সাথে সাথে এ বিষয়টিও তাঁর চিন্তার স্ক্রীনে ধরা পড়ে যে, কতক লোক কেবল অনুসারী হওয়ার কারণেই নিজ আকীদা-বিশ্বাসকে সত্য মনে করে। সত্য-মিথ্যা ও আসল-নকলের পার্থক্য নির্ণয় যার তার পক্ষে সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন গভীর জ্ঞান এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব।

প্রশ্নবোধক চিহ্ন নিয়ে একটি বাক্য বারবার তার সামনে এসে দাঁড়ায়— "মদীনায় কেন যাচ্ছি? ... নিজের আকীদা-বিশ্বাসে মদীনাবাসীকে দীক্ষিত করতে না-কি তাদের আকীদা-বিশ্বাসের সামনে নিজেকে সারেন্ডার করতে?" ঠিক এ সময় আবু সুফিয়ানের একটি কর্কশ কণ্ঠ তার কানে গুঞ্জন তোলে, যা এর একদল পূর্বে আবু সুফিয়ান তাঁকে বলেছিল—"এ খবর কি সত্য যে, তুমি মদীনায় যাচ্ছ? তোমার ধমনীতে বহমান ওলীদের লাল রক্ত কি তাহলে সাদা হয়ে গেছে?"

মরুভূমি পাড়ি দেয়ার সময় কিছুদূর পর্যন্ত এ আওয়াজ তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে। অতঃপর এক সময় তিনি স্বাভাবিক হয়ে ঐসব বন্ধুদের চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে পড়েন, যাদের বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করেন এবং যাদের রক্ত তাঁর সামনে দিয়ে গড়িয়ে গিয়েছিল। এদের মধ্যে হযরত মুসআব ইবনে উমাইর (রা.) ছিলেন অন্যতম।

রণাঙ্গনকে পিছে ফেলে কুরাইশরা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে। কিছুদূর অগ্রসর হতেই হযরত খালিদ (রা.) ঘোড়া ছুটিয়ে আবু সুফিয়ানের গতিরোধ করে দাঁড়ান। অপূর্ণতার বেদনা এবং চাপা ক্ষোভ বুকে নিয়ে তিনি আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করেন, যুদ্ধকে মাঝপথে রেখে তোমরা কোথায় চলেছ? মুসলমানদের সৈন্য-শক্তি উভয় নিঃশেষ হয়ে গেছে। চূড়ান্ত পরাজয় তাদের অবধারিত। চলো, তাদের মূলোৎপাটন করেই তবে আমরা ফিরব। আবু সুফিয়ানও চাচ্ছিল, এ যুদ্ধ

একটি চূড়ান্ত ফলাফলে উপনীত হোক। কিন্তু সৈন্যদের অবসন্নতা ও ক্লান্তি দেখে সে আর ঝুঁকি নেয় না। হযরত খালিদের প্ররোচনায় কতক অশ্বারোহী ফিরতি পথ হতে আবার উহুদ অভিমুখে ঘুরে দাঁড়ায় মাত্র। হযরত খালিদ (রা.) ইতোপূর্বে রাসূল (সা.)-এর অবস্থান জেনেছিলেন। কিন্তু আবু সুফিয়ান তখন তাঁকে সেখানে যেতে না দিয়ে কতক পদাতিক সৈন্য পাঠায়। ইতিমধ্যে রাসূল (সা.)-এর কাছে আরো কিছু সাহাবী এসে যান।

॥ আঠার ॥

ইবনে কুময়া মানব বৃত্ত ভেঙ্গে পুনরায় রাসূল (সা.)-এর কাছে পৌছতে চেষ্টা করে। হযরত মুসআব ইবনে উমাইয়া (রা.) তখন রাসূল (সা.)-এর কাছে দণ্ডায়মান। হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) আহত দু'সৈনিককে পানি পান করাচ্ছিলেন। কুরাইশদেরকে পুনরায় আক্রমণ করতে দেখে তিনি আহতদের ছেড়ে তাদেরই একজনের তলোয়ার নিয়ে শত্রুর মোকাবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। শত্রু অশ্বারোহী থাকায় তার পক্ষে সরাসরি শত্রুকে ঘায়েল করা সম্ভব ছিল না বিধায় তিনি সবেগে তলোয়ার চালান শত্রুবহনকারী অশ্বকে লক্ষ্য করে। এতে অশ্ব যেমনি লুটিয়ে পড়ে তেমনি আরোহীও আরেক পাশে ছিটকে পড়ে। আরোহী ছিটকে পড়তেই হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) ঘোড়ার উপর দিয়ে গিয়ে তাকে আক্রমণ করেন। এতে সে মারাত্মক আহত হয়ে ভোঁ দৌড় দেয়।

গঠনশৈলী এবং চেহারা-বর্ণের দিক দিয়ে রাসূল (সা.)-এর সাথে হযরত মুসআব (রা.)-এর বেশ মিল ছিল। ইবনে কুময়া হযরত মুসআব (রা.)-কে রাসূল (সা.) মনে করে তাঁর উপর আক্রমণ করে। তিনি প্রস্তুত ছিলেন। বীরবিক্রমে তার মোকাবেলা করেন। কিছুক্ষণ দু'জনের মাঝে অস্ত্রের তীব্র প্রতিযোগিতা চলে। এক সময় ইবনে কুময়ার তরবারী হযরত মুসআব (রা.)-কে মারাত্মক আঘাত করলে তিনি লুটিয়ে পড়েন এবং শহীদ হয়ে যান। হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) হযরত মুসআব (রা.)-কে ঢলে পড়তে দেখেন। এতে তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে ইবনে কুময়ার উপর আক্রমণ করেন। কিন্তু তার আক্রমণ ফলবতী হয় না। কারণ ইবনে কুময়া বর্ম পরিহিত ছিল আর আক্রমণে ছিল এক নারী। পাল্টা প্রতিশোধ নিতে ইবনে কুময়া উম্মে আম্মারার কাঁধে আঘাত করে। এতে তিনি মারাত্মক আহত হয়ে পড়ে যান।

রাসূল (সা.) এ সময় নিকটেই ছিলেন। তিনি ইবনে কুময়ার দিকে এগিয়ে যান। কিন্তু সে প্রান্ত বদল করে খোদ রাসূল (সা.)-এর উপরেই আঘাত করে বসে, যা তার শিরস্ত্রাণে গিয়ে লাগে। শিরস্ত্রাণের পিচ্ছিলতায় তরবারী সেখান

থেকে কাঁধের উপর গড়িয়ে পড়ে। রাসূল (সা.)-এর ঠিক পিছনে একটি গর্ত ছিল। ভারী আঘাতে পিছনে সরে গেলে তিনি সে গর্তে পড়ে যান। ইবনে কুময়া সেখান থেকে ফিরে চিৎকার করে করে বলতে থাকে—"আমি মুহাম্মাদকে হত্যা করেছি।" সে রণাঙ্গনে ঘুরে ঘুরে চিৎকার করে এ কথাই বলতে থাকে। তার এই গগনবিদারী আওয়াজ মুসলমানরাও শুনেন, কুরাইশদেরও কানে পৌঁছে।

কুরাইশরা এ খবরে যারপরনাই আনন্দিত হয়। কিন্তু মুসলমানদের হয় বিরাট সর্বনাশ। এ খবরে তাদের মধ্যে যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটে। তারা মনোবল হারিয়ে পাহাড়ের দিকে পালাতে থাকে।

"নবী-প্রেমিক মুজাহিদ বাহিনী!" পলায়নপর মুজাহিদদের কানে একটি আওয়াজ ভেসে আসে—"নবী জীবিত না থাকলে যে জীবন রক্ষার্তে আমরা পালিয়ে যাচ্ছি তার প্রতি অভিসম্পাত হোক। তোমরা কেমন নবী-প্রেমিক যে, তাঁর শাহাদাতের সাথে সাথেই মৃত্যুভয়ে পালিয়ে যাচ্ছ?"

মুসলমানরা থমকে দাঁড়ায়। এই আহ্বান তাদেরকে জ্বলন্ত অগ্নিতে পরিণত করে। তারা পদাতিক হওয়া সত্ত্বেও কুরাইশদের অশ্বারোহী বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরা ছিল হযরত খালিদ ও ইকরামার দুর্ধর্ষ বাহিনী।

হযরত খালিদ (রা.)-এর আজ ক্রমে মনে পড়ছিল পিছনের কথা। সেদিন তাঁর হাতে অসংখ্য মুসলমান রক্তাক্ত হয়েছিল। তাদের মধ্যে হযরত রেফায়া (রা.)ও ছিল। সেদিনের কথা মনে পড়ায় তাঁর অন্তরে এক ধরনের বেদনা অনুভূত হয়, ব্যথা জাগে। নির্বিচার রক্তপাত তার কাছে অর্থহীন মনে হলেও সেদিন মুসলমানরা ছিল তার সর্বনিকৃষ্ট শত্রু।

এক সময় মুসলমানদের মনোবল সত্যই ভেঙ্গে যায়। পদাতিক হয়ে কতক্ষণ অশ্বারোহীদের মোকাবেলায় টিকে থাকতে পারে! অবস্থা বেগতিক দেখে তারা পাহাড়ের দিকে পিছুটান দিতে থাকে। গনীমতের মালের আশায় মুসলমানরা যেরূপভাবে তাদের মোর্চা ত্যাগ করেছিল এবং যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল তদ্রূপ কুরাইশরাও এ সময় গনীমত সংগ্রহ করতে মৃত ও মুমূর্ষু মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কত কুরাইশ রাসূল (সা.)-এর পশ্চাদ্ধাবনে যায়। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম তাদেরকে এমন শিক্ষা দেয় যে, অধিকাংশই সেখানে মারা যায়। আর যে কয়জন জীবিত ছিল তারা জীবন নিয়ে কোনরকমে পালিয়ে আসে। ইতিমধ্যে রাসূল (সা.) অপেক্ষাকৃত একটি উঁচু নিরাপদ স্থানে পৌঁছে যান। তিনি সেখান থেকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। নিবেদিত প্রাণ ত্রিশ সাহাবীর ষোলজন শহীদ হয়ে যান। অবশিষ্ট চৌদ্দজনের অধিকাংশই ছিল আহত। রাসূল (সা.)

পাহাড়ের উপর থেকেই পুরো রণাঙ্গনের খবর নেন। চারদিকে নজর বুলান। কিন্তু কোন মুসলমান তাঁর চোখে পড়ে না। রাসূল (সা.)-এর শাহাদাতের খবর শুনে অত্যন্ত হতাশ হয়ে তারা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে মদীনায় চলে যায়। কেউ কেউ কুরাইশদের প্রতিশোধের ভয়ে পাহাড়ে গিয়ে আত্মগোপন করে।

যুদ্ধ এক প্রকার শেষ। আক্রমণের আর আশঙ্কা নেই। এই অবসরে রাসূল (সা.) নিজের ক্ষতস্থানের প্রতি মনোনিবেশ করেন। রাসূল তনয়া হযরত ফাতেমা (রা.) পিতার খোঁজে চারদিক ঘুরে ঘুরে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এখানে এসে তিনি পিতার খোঁজ পান। নিকট দিয়ে একটি ঝর্ণা আপন মনে বয়ে যাচ্ছিল। হযরত আলী (রা.) সেখান থেকে পানি সংগ্রহ করে রাসূল (সা.)-কে পান করান। হযরত ফাতেমা (রা.) নিজ হাতে রাসূল (সা.)-এর ক্ষত পরিষ্কার করতে থাকেন। এ সময় তিনি পিতার কষ্টে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন।

॥ উনিশ ॥

হযরত খালিদের মনে পড়ে, সেদিন রাসূল (সা.)-এর শাহাদাতের খবর তাঁকে আত্মিক প্রশান্তি দান করেছিল। কিন্তু পরবর্তী আরেকটি আওয়াজে তিনি ভীষণ চমকে ওঠেন। তাঁর আত্মিক প্রশান্তি হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। উপত্যকার এই আওয়াজের গুঞ্জন অনেক দূর পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। কেউ চিৎকার করে বলছিল—"মুসলমানগণ! সুসংবাদ শোন! নবী করীম (সা.) জীবিত এবং নিরাপদে আছেন।" এই ঘোষণায় হযরত খালিদের যেমনি হাসি পায় তেমনি আফসোসও হয়। তিনি এরপর মন্তব্যস্বরূপ মনে মনে বলেন, হয়ত কোন মুসলমান পাগল হয়ে প্রলাপ বকছে।

আসল ঘটনা হল, মুসলমানরা যেরূপভাবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল, হযরত কা'ব বিন মালেক (রা.)ও ঠিক তেমনি একাকী ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ের ঐ স্থানে গিয়ে পৌছান, যেখানে রাসূল (সা.) আহত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তিনি রাসূল (সা.)-কে জিন্দা দেখে আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি। আনন্দের আতিশয্যে শ্লোগান দিতে থাকেন—"আমাদের নবী জীবিত।" তাঁর এই শ্লোগান মুসলমানদের জীবনে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে। মুহূর্তে তাদের হতাশা কেটে যায়। একজন, দুইজন, চারজন করে করে যারা এতক্ষণ উদভ্রান্ত ও বিষণ্ন মনে ইতস্তত ফিরছিল এ আওয়াজ শুনে তারা দৌড়ে আসে। হযরত উমর (রা.)ও এই আওয়াজ শুনে রাসূল (সা.)-এর কাছে গিয়ে পৌছান।

লাশ অন্বেষণ। এর পূর্বে আবু সুফিয়ান রণাঙ্গনে পড়ে থাকা লাশ ওলট-পালট করে। সে রাসূল (সা.)-এর লাশ খুঁজছিল। অনেকক্ষণ ধরে খোঁজাখুঁজি করে ব্যর্থ

হয়ে এবার সে যাকেই সামনে পায় তাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি মুহাম্মাদের লাশ দেখেছ? এরই এক পর্যায়ে গিয়ে হযরত খালিদের সাথে তার দেখা হয়।

"খালিদ!" আবু সুফিয়ান সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করে—"তুমি মুহাম্মাদের লাশ দেখেছ কি?"

"না।" হযরত খালিদ সংক্ষেপে জবাব দিয়ে তার দিকে ঝুঁকে পাল্টা প্রশ্ন করে—"তুমি কি নিশ্চিত যে, মুহাম্মাদ সত্যই নিহত হয়েছে?"

"হ্যাঁ।" আবু সুফিয়ান জবাবে বলে—সে না মারা গেলে আমাদের হাত থেকে কোথায় গিয়ে বাঁচতে পারে?"... কেন এ ব্যাপারে তোমার কোন সন্দেহ হয়?"

"হ্যাঁ, আবু সুফিয়ান।" হযরত খালিদ জবাব দেন—"আমি ততক্ষণ সন্ধিহান থাকব যতক্ষণ নিজের চোখে তার লাশ না দেখব। মুহাম্মাদ এত সহজে নিহত হবার লোক নয়।"

"তোমার কথা থেকে কেমন যেন মুহাম্মাদের জাদুর গন্ধ ভেসে আসছে।" আবু সুফিয়ান অহঙ্কারের ভঙ্গিতে বলে—"মুহাম্মাদ কি এক সময় আমাদেরই লোক ছিল না?" তুমি কি তাকে চেন না? যে লোক এত হত্যা ও নির্যাতনের জন্য দায়ী তাকে একদিন হত্যার শিকার হতেই হবে। নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ নিহত হয়েছে। যাও, তার লাশ শনাক্ত কর। আমরা তার মস্তক কেটে মক্কায় নিয়ে যাব।"

ঠিক এই মুহূর্তে পাহাড়ের বুক চিরে কা'ব বিন মালিক (রা.)-এর কণ্ঠ ভেসে আসে—"হে মুসলিম ভায়েরা! সুসংবাদ গ্রহণ কর, আমাদের নবী জীবিত এবং নিরাপদ।" এই আওয়াজ বজ্রধ্বনির ন্যায় প্রতিধ্বনি তোলে। পাহাড়ের গা বেয়ে উপত্যকার ভাঁজে ভাঁজে এবং রণাঙ্গনের কোণে কোণে এ গুরুগম্ভীর গুঞ্জন বিদ্যুৎ বেগে প্রদক্ষিণ করে ফেরে।

"শুনেছ আবু সুফিয়ান!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"মুহাম্মাদ কোথায় তা আমি জানি। আমি তাকে আক্রমণ করতে যাচ্ছি। কিন্তু এ নিশ্চয়তা দিতে পারি না যে, অবশ্যই তাকে কতল করে আসতে পারব।"

কিছুক্ষণ পূর্বে হযরত খালিদ (রা.) রাসূল (সা.)সহ সাহাবায়ে কেরামকে পাহাড়ের মধ্যভাগে যেতে দেখেন। তিনি দূর থেকে ব্যাপারটি লক্ষ্য করেন। পরাজয় স্বীকার কিংবা ইচ্ছা অপূর্ণ রাখার মত লোক তিনি ছিলেন না। তিনি কয়েকজন অশ্বারোহীকে সাথে নেন এবং পাহাড়ের ঐ স্থানের দিকে যেতে থাকেন, যেখানে তিনি রাসূল (সা.)-কে যেতে দেখেছিলেন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম লেখেন, রাসূল (সা.) হযরত খালিদকে অশ্বারোহী নিয়ে এই ঘাঁটিতে অপারেশন চালাতে আসতে দেখে তৎক্ষণাৎ তাঁর মুখ থেকে এ দোয়া বের হয়—"হে আল্লাহ্! এখানে পৌছার পূর্বেই পথিমধ্যে কোথাও তাকে থামিয়ে দিন।"

হযরত খালিদ (রা.) অশ্বারোহীদের নিয়ে ঘাঁটির লক্ষ্যে পাহাড়ের গা ঘেষে উপরে উঠতে থাকে। এটা মূলত একটি গিরিপথ ছিল, যা ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছিল। সৈন্যদের পাশাপাশি চলা আর সম্ভব হয় না। লাইন দিয়ে চলতে হয়। রাসূল (সা.) আহত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। হযরত উমর (রা.) খালিদ বাহিনীকে আসতে দেখে নাঙ্গা কৃপাণ হাতে কিছুটা নিচে নেমে আসেন।

"ওলীদের পুত্র!" ক্রুদ্ধ স্বরে হযরত উমর (রা.) হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন—"লড়াই সম্বন্ধে একটু জ্ঞান থাকলে গিরিপথের এই সংকীর্ণ পথ অবলোকন কর। পথের ক্রম-উর্ধ্বতার কথাও ভাব। এমন নাজুক স্থানে কি তোমার বাহিনী আমাদের হাত থেকে জীবন নিয়ে ফিরতে পারবে?"

লড়াইয়ের ব্যাপারে হযরত খালিদ ছিলেন খুব অভিজ্ঞ। তিনি হযরত উমর (রা.)-এর কথায় সংকীর্ণ গিরিপথটি আরেকবার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ করেন। অশ্বকে ইচ্ছামত ঘুরিয়ে দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করার জন্য স্থানটি মোটেও উপযুক্ত ছিল না। বরং অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও বিপদসংকুল ছিল। বিচক্ষণ দৃষ্টির বিচারে অবস্থা অনুকূলে না থাকায় তিনি ঘোড়া ঘুরিয়ে সৈন্যদের নিয়ে নিচে নেমে আসেন।

॥ বিশ ॥

ফলাফল পর্যালোচনা। যুদ্ধ শেষ। কুরাইশরা এই দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের প্রাধান্যতা দাবী করতে পারে যে, তারা মুসলমানদের বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কিন্তু চূড়ান্ত বিজয়ের দাবী তারা করতে পারে না। কেননা এক প্রকার অমীমাংসিতভাবেই যুদ্ধ শেষ হয়।

"না, সেদিন আমাদেরই পরাজয় হয়।" হযরত খালিদের ভিতর থেকেই একটি আওয়াজ ওঠে—"মুসলমানরা মাত্র ৭ শত আর আমরা ছিলাম ৩ হাজার। তাদের মাত্র দু'টি ঘোড়া আর আমাদের ঘোড়া ছিল দুইশত। মুহাম্মাদকে হত্যা করতে পারলে তবেই আমাদের চূড়ান্ত বিজয় হত।"

হযরত খালিদ (রা.) নিজের মধ্যে এক ধরনের কম্পন অনুভব করেন। তাঁর উপর এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, তিনি দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকেন। যুদ্ধের শেষ দিককার দৃশ্যগুলো তার কল্পনায় এক এক করে পাখা মেলে তাঁর চোখের সামনে

উড়াল দিতে থাকে। তিনি এই অনাকাঙ্ক্ষিত অধ্যায়, ভয়ঙ্কর দৃশ্য স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে মাথা ঝাঁকি দেন। কিন্তু স্মৃতিগুলো মাছির মত তাঁর মাথায় ভনভন করে ঘুরতে থাকে। তিনি মনে মনে এ ভেবেও লজ্জা অনুভব করেন যে, একজন যোদ্ধার জন্য এমনটি শোভনীয় নয়। অতীত স্মৃতি যোদ্ধাকে কখনো তাড়িয়ে ফেরে না।

হযরত উমর (রা.)-এর সতর্কের ভিত্তিতে গিরিপথ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় হযরত খালিদের চোখ দ্রুত একবার রণাঙ্গন ঘুরে আসে। বিক্ষিপ্ত আর ছিন্ন-ভিন্ন লাশে তাঁর চোখ দু'টি ভরে যায়। তাদের মধ্যে অচেতন সৈন্যের সংখ্যাও কম ছিল না। কিন্তু লাশের সৎকার ও আহতদের উদ্ধার করার কোন উদ্যোগ কোন পক্ষের থেকেই দেখা যায় না। আচমকা তার দৃষ্টি আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার প্রতি আটকে যায়। খঞ্জর হাতে দ্রুতবেগে রণাঙ্গনে ঘুরছিল সে। তার ইশারায় অন্যান্য কুরাইশ রমণীরাও তার পিছু পিছু দৌড়ে আসে। হিন্দা দীর্ঘাকৃতির এবং বলিষ্ঠ বীরের মত মহিলা ছিল। সে প্রত্যেকটি লাশ খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছিল। কোন লাশ নিম্নমুখী হয়ে পড়ে থাকলে সে পদাঘাত করে লাশের মুখ সোজা করে চিনতে চেষ্টা করছিল। সে তার সাথের মহিলাদের জানায় যে, আমি হামযার লাশ খুঁজছি।

প্রতিহিংসার নগ্নপ্রকাশ। হযরত হামযা (রা.)-এর লাশ এক সময় তার নজরে পড়ে। লাশ শনাক্ত করেই সে তাঁর উপর হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। এলোপাতাড়ি কুপিয়ে টুকরো টুকরো করে। কয়েকটি অঙ্গ কেটে দূরে ছুঁড়ে দেয়। নিকটে দাঁড়ানো মহিলাদের দিকে একবার চোখ বুলায়।

"দাঁড়িয়ে কি দেখছ?" হিন্দা পাগলিনীর মত মহিলাদের বলে—"দেখলে তো আমার পিতা, চাচা এবং পুত্র হত্যাকারীর লাশের অবস্থা কি করে দিলাম! তোমরাও যাও, মুসলমানদের প্রতিটি লাশের অবস্থা এমন কর এবং সকলের নাক, কান কেটে নিয়ে এস।"

মহিলারা মুসলানদের লাশ ফাঁড়তে ও কাটতে গেলে হিন্দা খঞ্জর দিয়ে হযরত হামযা (রা.)-এর পেট ফেড়ে ফেলে। সে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে কি যেন খুঁজতে থাকে। হাত বের করে নিয়ে আসলে তাতে ছিল হযরত হামযা (রা.)-এর কলিজা। সে খঞ্জর দ্বারা কলিজা কেটে টুকরো টুকরো করে। এতেও তার হিংসাবৃত্তি ক্ষান্ত হয় না। এক টুকরা কলিজা মুখে পুরে দিয়ে হিংস্র জন্তুর মত চিবাতে থাকে। এই টুকরাটি গিলতে সে খুব চেষ্টা করে। কিন্তু টুকরাটি তার কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। বাধ্য হয়ে এক সময় তা উগরে দেয়। এভাবে সে তার দীর্ঘদিনের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে।

অবাক বিস্ময়! হযরত খালিদ (রা.) এই অনাকাঙ্ক্ষিত দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে যান। অনতিদূরে আবু সুফিয়ানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। হিন্দার এই পশুসুলভ আচরণ তাকে দারুণ পীড়া দেয়। তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। সামনা-সামনি যুদ্ধ করাই ছিল তাঁর নেশা ও পেশা। শত্রুর লাশের সাথে এমন দুর্ব্যবহার তার কেবল অপ্রিয়ই ছিল না, বরং তিনি এ আচরণকে সম্পূর্ণ ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেন।

আবু সুফিয়ানকে দেখেই হযরত খালিদ ঘোড়া ছুটিয়ে দেন এবং সোজা তার মুখোমুখি এসে দাঁড়ান।

"আবু সুফিয়ান!" হযরত খালিদ ক্রোধ এবং তাচ্ছিল্য মিশ্রিত ভঙ্গিতে বলেন—"তোমার স্ত্রী এবং অন্যান্য মহিলাদের এই হিংস্র আচরণ তুমি সমর্থন কর?"

আবু সুফিয়ান হযরত খালিদের প্রতি এমন দৃষ্টিতে তাকায়, যার মধ্যে অসহায়ত্বের স্পষ্ট ছাপ ছিল এবং তার এই দৃষ্টিই বলে দেয় যে, লাশের সাথে তার স্ত্রীর এই আচরণ আদৌ তার পছন্দ নয়।

"চুপ কেন আবু সুফিয়ান? কথা বলো!" আবু সুফিয়ানের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে স্পষ্ট হতে হযরত খালিদ ঝাঁঝালো স্বরে জানতে চান।

"খালিদ! হিন্দার অবস্থা তোমার অজানা নয়।" আবু সুফিয়ান থমথমে আওয়াজে বলে—"এ মহিলার অবস্থা এখন উন্মাদ থেকেও খারাপ। আমি কিংবা তুমি তাকে বাধা দিতে গেলে সে আমাদেরই পেট ফেঁড়ে দিবে।"

হযরত খালিদ (রা.) হিন্দাকে ভাল করেই চিনতেন। তিনি আবু সুফিয়ানের অসহায়ত্ব অনুধাবন করেন। আবু সুফিয়ান মাথা নত করে থেকে এক সময় ঘোড়ার লাগাম টেনে দ্রুত সেখান থেকে অন্যত্র চলে যায়। হযরত খালিদও বেশীক্ষণ এই দৃশ্য সহ্য করতে পারেন না।

হিন্দা হযরত হামযা (রা.)-এর কলিজা চিবিয়ে পরে যখন উগরে দেয় তখন পিছনে কারো পায়ের আওয়াজ শুনে চকিতে ফিরে তাকায়। তার পশ্চাতে জুবাইর বিন মুতঈমের গোলাম ওয়াহশী দাঁড়িয়ে ছিল। তার হাতে আফ্রিকার তৈরী একটি বর্শা। এই বর্শার আঘাতেই সে হযরত হামযা (রা.)-কে কাপুরুষোচিতভাবে হত্যা করে।

"এখানে কি করছ ইবনে হরব!" হিন্দা নির্দেশের সুরে তাকে বলে—"যাও, অন্যান্য মুসলমানের লাশও এভাবে টুকরো টুকরো কর।"

ওয়াহ্শী মুখে কথা বলত কম। সে অধিকাংশ প্রয়োজন ইশারায় পূরণ করতে চাইত। সে হিন্দার নির্দেশ পালনে ব্রতী হওয়ার পরিবর্তে স্বীয় হস্ত হিন্দার সামনে বাড়িয়ে দেয়। দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল হিন্দার গলায় শোভিত স্বর্ণালঙ্কারের প্রতি। এতেই পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা হিন্দার মনে পড়ে যায়। যে যুদ্ধের প্রারম্ভে ওয়াহ্শীর সাথে এ ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, তুমি আমার পিতা, চাচা ও পুত্রের হত্যাকারীকে হত্যা করতে পারলে আমার পরিহিত সকল অলঙ্কার তোমার হবে। এখন ওয়াহ্শী সেই পূর্ব ঘোষিত পুরস্কার নিতে আসে। তার আগমনের কারণ বুঝতে পেরে হিন্দা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তার গায়ের সমস্ত অলঙ্কার খুলে ওয়াহ্শীর প্রসারিত হাতে তুলে দেয়। মূল্যবান পুরস্কার পেয়ে ওয়াহ্শীর ঠোঁটে মুচকি হাসি খেলে যায়। অতঃপর সে স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। হিন্দার বিবেক-বুদ্ধি এ সময় বিজয় এবং প্রতিশোধ গ্রহণে আচ্ছন্ন ছিল।

"দাঁড়াও ইবনে হরব!" হিন্দা ভাবাবেগে ওয়াহ্শীকে ডাক দেয়। সে নিকটে এলে হিন্দা বলে—"আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম যে, আমার হৃদয় শান্ত করতে পারলে সমস্ত অলঙ্কার তোমাকে দিয়ে দিব। কিন্তু তুমি এর চেয়েও বেশী পুরস্কারের যোগ্য।" অতঃপর হিন্দা কুরাইশ রমণীদের দিকে ইশারা করে বলে—"তোমার জানা আছে এদের মধ্যে দাসী কে কে? সকলেই যুবতী এবং রূপসী। যাকে তোমার পছন্দ হয় নিয়ে যাও।"

ওয়াহ্শী চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী নীরবে কয়েক মুহূর্ত হিন্দার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তবুও তার দৃষ্টি দাসীদের দিকে যায় না। সে হিন্দার প্রস্তাব সমর্থন না করার ভঙ্গিতে মাথা দোলায় এবং সেখান থেকে চলে যায়।

রণাঙ্গনের এহেন বিভীৎস অবস্থার মাঝেও এক সময় হিন্দার উচ্চ এবং সুরেলা আওয়াজ ভেসে আসে। ঐতিহাসিক ইবনে হিশামের বর্ণনানুযায়ী হিন্দা সুরেলা কণ্ঠে যে গানের আওয়াজ তুলে তার কিছু কথা ছিল এমন ঃ

বদর প্রশ্নে এখন আমরা সমান অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছি।
এক ঘোরতর যুদ্ধের প্রতিশোধ আরেক ঘোরতর যুদ্ধের মাধ্যমে নিয়েছি।
উতবার বেদনা আমার সহ্যের বাইরে ছিল;
সে ছিল,আমার পিতা।
চাচার ব্যথায় আমি ব্যথিত, পুত্রের শোকে উন্মাদ।
এখন আমার অশান্ত হৃদয় শান্ত; তপ্ত হিয়া শীতল।
আমি প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছি।
ওয়াহ্শী আমার অন্তরের ব্যথা লাঘব করে দিয়েছে।
আমি জীবনভর ওয়াহ্শীর প্রতি কৃতজ্ঞ;
আমার হাড় কবরে মাটির সাথে মিলে একাকার না হওয়া পর্যন্ত।

॥ একুশ ॥

আবু সুফিয়ান তার স্ত্রী কর্তৃক সংঘটিত ভয়ংকর দৃশ্য সহ্য করতে পারে না। সে প্রথম দর্শনেই মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। আবু সুফিয়ান এক সময় তার দুই সাথীকে বলে, তার বিশ্বাস হয় না যে, মুহাম্মাদ এখনও জীবিত।

"খালিদ হয়ত দূর থেকে অন্য কাউকে দেখে মনে করেছে যে, সে মুহাম্মাদ।" এক সাথী আবু সুফিয়ানকে বলে।

"আমি নিজ চোখে দেখে আসব" এই কথা বলে আবু সুফিয়ান ঐ গিরিপথের উদ্দেশে রওয়ানা হয়, যার কাছ থেকে হযরত খালিদ (রা.) অশ্বারোহীদের ফিরিয়ে এনেছিলেন। সে পাহাড়ে উঠতে উঠতে ঐ স্থানে গিয়ে দাঁড়ায়, সেখান থেকে মুসলমানদের বসে থাকার দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল।

"মুহাম্মাদের ভক্তবৃন্দ!" আবু সুফিয়ান জোর আওয়াজে বলে—"মুহাম্মাদ জীবিত আছে কি?"

রাসূল (সা.) আওয়াজ শুনে পার্শ্বস্থ মুসলমানদের ইশরায় চুপ থাকতে বলেন। আবু সুফিয়ান উচ্চৈঃস্বরে প্রশ্নটি পুনরায় মুসলমানদের লক্ষ্যে ছুঁড়ে মারে। এবারও কোন জবাব সে পায় না।

"আবু বকর জীবিত আছে কি?" আবু সুফিয়ান জানতে চায়। কিন্তু তিন তিনবার এভাবে জিজ্ঞাসা করার পরও ওপক্ষ থেকে কোন জবাব আসে না।

"উমর জীবিত আছো।" আবু সুফিয়ান তৃতীয় প্রশ্ন করে। মুসলমানগণ পূর্বের মতই নীরবতা অবলম্বন করেন।

আবু সুফিয়ান কোন উত্তর না পেয়ে ঘোড়ার দিক পরিবর্তন করে। সে নীচে নেমে দেখে, সেখানে কুরাইশদের উপচে পড়া ভীড়। সবাই রাসূল (সা.) সম্পর্কে সঠিক সংবাদ জানতে ভীষণ উদ্গ্রীব।

"হে কুরাইশ সম্প্রদায়!" আবু সুফিয়ান সমবেত জনতার মাঝে সমুচ্চস্বরে ঘোষণা করে—"তোমরা নিশ্চিত থাক। মুহাম্মাদ মারা গেছে। আবু বকর এবং উমরও জীবিত নেই। এখন মুসলমানরা তোমাদের ছায়া দেখেও ভীত-সন্ত্রস্ত হবে। আনন্দ কর। নাচ।"

আবু সুফিয়ানের এ ঘোষণা শুনে কুরাইশরা আনন্দে ফেটে পড়ে। তারা নেচে-গেয়ে উল্লাস প্রকাশ করতে থাকে। কিন্তু আচমকা পাহাড়ের বুক চিরে উত্থিত এক আওয়াজ তাদের নীরব করে দেয়। তাদের আনন্দ-উল্লাস মুহূর্তে নিরানন্দে পরিণত হয়।

"আল্লাহ্র দুশমন!" গিরিশৃঙ্গ হতে হযরত উমর (রা.)-এর গুরুগম্ভীর স্বর ভেসে আসে—"এতগুলো মিথ্যা বলো না, এভাবে নগ্ন মিথ্যাচার করো না। নাম ধরে ধরে যাদেরকে মৃত বলে পরিগণিত করছ, তারা সকলেই জীবিত। জাতিকে ধোঁকা দিও না। তোমার পাপের শাস্তি দেয়ার জন্য আমরা তিনজনই জীবিত।"

আবু সুফিয়ান উপহাসের ভঙ্গিতে অট্টহাসি দিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে—"ইবনে খাত্তাব! তোমার আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষা করুক। তুমি এখনও আমাদের শাস্তির কথা বলছ? তুমি নিশ্চয় করে বলতে পার যে, মুহাম্মাদ জীবিত আছে?"

"আল্লাহ্র কসম! আমাদের নবী জীবিত।" হযরত উমর (রা.)-এর জবাব আসে—"আল্লাহ্র রাসূল (সা.) তোমাদের প্রতিটি শব্দ শুনছেন।"

আরবের রেওয়াজ ছিল, যুদ্ধ শেষে দু'পক্ষের কমান্ডার একে অপরের প্রতি সমালোচনা এবং ব্যঙ্গোক্তির তীর বর্ষণ করত। আবু সুফিয়ান সে প্রথা অনুযায়ী দূরে দাঁড়িয়ে হযরত উমর (রা.)-এর সাথে কথা চালাচালি করতে থাকে।

"তোমরা হুবল এবং উযযার কদর জান না।" আবু সুফিয়ান বলে।

হযরত উমর (রা.) এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে রাসূল (সা.)-এর দিকে তাকান। জোরে কথা বলার মত অবস্থা তাঁর ছিল না। তিনি হযরত উমর (রা.)-কে জবাব শিখিয়ে দেন।

"বাতিলের পূজারী শোন!" হযরত উমর (রা.) উচ্চৈঃস্বরে বলেন—"আল্লাহ্র বড়ত্ব ও মহানত্ব সম্পর্কে জান; যিনি সুমহান এবং সর্বশক্তিমান।"

"আমাদের হুবল দেবতা এবং উযযা দেবী আছে।" আবু সুফিয়ান বলে—"তোমাদের কি এমন কেউ আছে?"

"আমাদের আছেন আল্লাহ্।" রাসূল (সা.) হযরত উমর (রা.)-এর জবানে জানিয়ে দেন, যা হযরত উমর (রা.) উচ্চৈঃস্বরে তুলে ধরেন—"তোমাদের কোন খোদা নেই।"

"যুদ্ধের ফলাফল বেরিয়ে গেছে।" আবু সুফিয়ান বলে—"তোমরা বদরে বিজয় লাভ করেছিলে। আমরা এই পাহাড়ের পাদদেশে তার যথাযথ প্রতিশোধ নিয়েছি। আগামী বছর আমরা তোমাদেরকে বদরের ময়দানে আবার মোকাবেলার জন্য আহ্বান করব।

"ইনশাল্লাহ্!" হযরত উমর (রা.) রাসূল (সা.)-এর শব্দ উচ্চৈঃস্বরে শুনিয়ে দেন—"তোমাদের সাথে আমাদের পরবর্তী সাক্ষাৎ বদর প্রান্তরেই ঘটবে।"

আবু সুফিয়ান আর দাঁড়ায় না। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতে থাকে। কিন্তু দু'কদম গিয়ে আবার থেমে যায়।

"উমর, আবু বকর এবং মুহাম্মাদ!" আবু সুফিয়ান একটু ধীর আওয়াজে বলে—"লাশ উদ্ধার করতে গেলে কিছু লাশ বিকৃত পাবে। আল্লাহ্র নামে কসম করে বলছি, লাশ বিকৃত করার আদেশ আমি কাউকে দেইনি। আর এমন আচরণ আমার পছন্দনীয়ও নয়। তারপরেও এর জন্য আমাকে দায়ী করা হলে কিংবা এ অভিযোগে আমাকে অভিযুক্ত করলে সেটা আমার অপমানই হবে।" এ কথাগুলো বলে আবু সুফিয়ান দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় এবং নিজ বাহিনীর কাছে এসে পৌঁছে।

॥ বাইশ ॥

চলতে চলতে এক সময় হযরত খালিদ (রা.)-এর ঘোড়া নিজেই গতি পরিবর্তন করে। তিনি ঘোড়ার এই ইচ্ছায় বাধ সাধেন না। বুঝে ফেলেন, ঘোড়া পানির ঠিকানা পেয়েছে। কিন্তু দূরে গিয়ে সে নিচের দিকে নামতে থাকে। তিনি স্থানটি চিনতে পারেন। উহুদ যুদ্ধ শেষে প্রত্যাবর্তনকালে কুরাইশরা এখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে। নিচে পানির বিশাল মজুদ ছিল। ঘোড়া দ্রুততার সাথে পাথুরে জমিন মাড়িয়ে পানির কাছে এসে থামে। হযরত খালিদ (রা.) লাফিয়ে ঘোড়া হতে নামেন এবং হাঁটু গেড়ে বসে অঞ্জলি ভরে পানি তুলে চোখে-মুখে ঝাপটা মারেন। একটু আয়েশের জন্য ধূসর এক স্থানে বসে পড়েন। উহুদ থেকে প্রত্যাবর্তনকালীন সময়ের একটি ঘটনা এখানে তাঁর মনে পড়ে। তারা যখন উহুদ থেকে ফিরে এই স্থানে এসে যাত্রাবিরতি করে তখন একটি বিষয় তাদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি করে। এই প্রশ্নে বিতর্ক হয় যে, মক্কায় চলে যাওয়া ভাল হবে না-কি মুসলমানদের উপর আরেকবার হামলা চালানো হবে।

সফওয়ান ইবনে উমাইয়া বলে—"আমরা পরাজিত বাহিনী নই। মুসলমানদের বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে ফায়দা লুটতে চাইলে নিজেদের অবস্থারও পর্যালোচনা কর। আমাদের জোশ-শক্তিও শূন্যের কোঠায়। এমতাবস্থায় ফের মুসলমানদের সাথে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়া উচিত হবে না। ভাগ্য আমাদের বিপক্ষে চলে যেতে পারে।"

এই বিতর্ক চলাবস্থায় কুরাইশ সৈন্যরা দু'জন মুসাফিরকে টেনে-হিঁচড়ে তাদের কমান্ডারের সামনে এনে দাঁড় করায়। তাকে জানানো হয়, তারা নিজেদেরকে মুসাফির বলে পরিচয় দিচ্ছে। আমাদের তাঁবুর আশে-পাশে সন্দেহজনকভাবে তাদের ঘুরাফেরা করতে দেখা যায় এবং চার-পাঁচজনের কাছে

তাদের গন্তব্যস্থল জানতে চায়। ধৃত মুসাফিরদ্বয় আবু সুফিয়ান ও অন্যান্য নেতাদের কাছেও নিজেদের মুসাফির হিসেবে পরিচয় দেয়। একটি স্থানের নাম বলে সেদিকে যাচ্ছে বলে জানায়। আবু সুফিয়ানের নির্দেশে তাদের পরিহিত ছেঁড়া-ফাটা পোষাক খুলে ফেলা হলে ভেতরে লুকানো খঞ্জর এবং তলোয়ার বেরিয়ে পড়ে। তাদেরকে এই গোপনীয়তার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তারা সন্তোষজনক কোন জবাব দিতে পারে না। হযরত খালিদের দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। ধৃত মুসাফির মুসলমান গোয়েন্দা বলে তাঁর গভীর সন্দেহ হয়। তাদেরকে সকলের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে কেউ তাদের চেনে কি-না জিজ্ঞাসা করা হয়।

দুই-তিন জন জানায়, তারা তাদের চেনে। তারা মদীনার বাসিন্দা।

"একজনকে আমি ভাল করে চিনি।" এক কুরাইশ দাঁড়িয়ে বলে—"তাকে আমার বিরুদ্ধে লড়তে দেখেছি।"

"তোমরা নিজেরাই বলে দাও যে, তোমরা মুহাম্মাদের গোয়েন্দা।" আবু সুফিয়ান তাদের দু'জনকে লক্ষ্য করে বলে—"এবং যাও, আমি তোমাদের প্রাণ ভিক্ষা দিলাম।"

একজন নিজেকে গোয়েন্দা বলে স্বীকার করে।

"যাও।" আবু সুফিয়ান বলে—"আমরা তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম।"

ধৃত দু'মুসাফির যারা বাস্তবেই মুসলমানদের গোয়েন্দা ছিল এবং কুরাইশদের গতিবিধি জানতে এসেছিল—তারা হাসি-খুশিভাবে নিজেদের উটের দিকে যেতে থাকে। আবু সুফিয়ানের ইশারায় কয়েকজন তীরন্দাজ ধনুকে তীর সংযোজন করে তাদের প্রতি ছুঁড়ে মারে। প্রত্যেকে একই সাথে একাধিক তীরাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আর উঠতে পারে না।

"তোমরা এর উদ্দেশ্য উপলব্ধি করেছ?" আবু সুফিয়ান কাছে দাঁড়ানো নেতাদের লক্ষ্য করে বলে—"গোয়েন্দা পাঠানোর অর্থ হলো মুসলমানরা পরাজিত হয়নি। তারা এখনই কিংবা কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের উপর আক্রমণের ইচ্ছা রাখে। বাঁচতে চাইলে এখনই মক্কায় চল এবং পরবর্তী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নাও।"

পরের দিন এক সংবাদবাহক এসে রাসূল (সা.)-কে জানায় যে, কুরাইশদের যাত্রাবিরতি স্থলে দু'গোয়েন্দার লাশ পড়ে আছে। আর কুরাইশরা মক্কায় চলে গেছে।

এটা হযরত খালিদ (রা.)-এর সর্বপ্রথম বড় যুদ্ধ ছিল। কিন্তু যুদ্ধোত্তর তাঁর প্রতিক্রিয়া ছিল যে, তিনি মুসলমানদের পরাজিত করতে পারেননি। চার বছর পর

আজ পুনরায় তিনি চিন্তা করেন যে, মুসলমানদের এ শক্তি কোন সাধারণ শক্তি নয়, নিশ্চয় কোন গোপন রহস্য আছে যা আজ পর্যন্ত তিনি উদ্ধার করতে পারেননি। কুরাইশদের কিছু ত্রুটিও তাঁর মনে পড়ে যায়। কিছু কথা এবং কিছু কাজ তাঁর ভাল লাগে না। দুই ইহুদী রূপসী নারীর কথাও তাঁর মনে পড়ে, নেতৃস্থানীয় কুরাইশদের মাঝে যাদের অবাধ চলাচল ছিল। তিনি জানতেন ইহুদীরা নারী-রূপের জাদুতে কুরাইশদের মোহাবিষ্ট এবং এ প্রক্রিয়ায় তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে সচেষ্ট। এ হীন প্রক্রিয়া তিনি মেনে নিতে পারেন না। কিন্তু এমনি এক নারীর সাথে একবার হযরত খালিদের সাক্ষাৎ হলে তিনি অনুভব করেন যে, তার মধ্যে যথেষ্ট জ্ঞান ও বিচক্ষণতা রয়েছে। মহিলাটির রূপ এবং যৌবনের এক নিজস্ব প্রভাব তো ছিলই। কিন্তু তার কথার মাঝেও যে এক ধরনের মাদকতা বিদ্যমান তা হযরত খালিদও অনুভব করেন। মহিলাটি কিছুক্ষণ তাঁর কল্পনাজগত দখল করে থাকে। এক সময় ঘোড়া ডেকে উঠলে হযরত খালিদ (রা.)-এর স্বপ্নভঙ্গ হয়। তিনি দ্রুত উঠেন এবং ঘোড়ায় আরোহণ করে মদীনার পথ ধরেন।

॥ তেইশ ॥

ওলীদের পুত্র খালিদ ছিলেন শাহজাদা। সৌখিনতা ও বিলাস-উপকরণেরও কমতি ছিল না। কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহের নেশা এমনই যে, তার সামনে সকল সৌখিনতা ও বিলাসিতা মূল্যহীন। মদীনার পথে গমনকালে ইউহাওয়া নাম্নী এক সুন্দরী-রূপসী ইহুদী নারীর কথা তাঁর মনে পড়ে। তিনি এই রমণীর স্মৃতি মাথা থেকে মুছে ফেলেন। কিন্তু সে নানারূপের প্রজাপতি হয়ে তার মাথার মধ্যে উড়তে থাকে। তিনি তার কথা মন থেকে মুছতে পারেন না।

হযরত খালিদের স্মৃতিতে উড়ন্ত প্রজাপতির রঙ ফিকে হতে হতে আবার এক সময় সমস্ত রঙ লাল রঙে পরিণত হয়। রক্তের মত লাল। এটা ছিল এক ভয়ঙ্কর অতীত। যা তিনি স্মৃতির এ্যালবাম থেকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করেন। রঙিন প্রজাপতি এক সময় বিষাক্ত ভীমরুলের রূপ নেয়ায় তিনি তা মন থেকে ঝেড়ে মুছে ফেলতে ব্যর্থ হন।

এটা ছিল উহুদ যুদ্ধের তিন-চার মাস পরের এক ঘটনা। এটাকে ষড়যন্ত্রই বলা চলে। এতে তাঁর ভূমিকা না থাকলেও কুরাইশদের এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন তিনি। তাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রে জড়িত না হওয়া সত্ত্বেও পক্ষে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়াও তাঁর সম্ভব ছিল না।

উহুদ রণাঙ্গনে আহত কতক কুরাইশের ক্ষত এখনও পুরোপুরি ভাল হয়নি। ইতিমধ্যে একদিন খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, ছয় সদস্যের এক মুসলিম টিম ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে রযী নামক স্থানে গমনকালে আসফানের অনতিদূরে এক অমুসলিম সম্প্রদায় তাদের গতিরোধ করে। তাদের দু'জনকে মক্কায় নিয়ে গিয়ে নিলাম করা হচ্ছে।

হযরত খালিদ দ্রুত নিলামের স্থলে যান। নিলামকৃত দু'মুসলমানের একজন হযরত খুবাইব (রা.) এবং আরেকজন হযরত যায়েদ বিন দিছানা (রা.)। উভয়ে হযরত খালিদের ঘনিষ্ঠ ও পরিচিত। তাঁরা তাঁরই গোত্রের লোক। ইসলাম গ্রহণ করে তাঁরা মদীনায় চলে যান। তাঁরা রাসূল-প্রেমে খুবই উজ্জীবিত ছিলেন। যে কোন মুহূর্তে রাসূল (সা.)-এর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকতেন। রাসূল (সা.) তাদের খুব স্নেহ ও মহব্বত করতেন। তারা একটি চত্বরে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর তাদের আশে-পাশে ছিল কুরাইশদের উপচে পড়া ভীড়। চার ব্যক্তি তাদের কাছে দাঁড়ানো ছিল। উভয়ের হাত ছিল রশি দিয়ে বাঁধা।

"এরা মুসলমান।" জনৈক ব্যক্তি চত্বরের পাশে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করছিল— "এরা উহুদে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়েছে। তাদের হাতে তোমাদের আত্মীয়-স্বজন নিহত হয়েছে। প্রতিশোধের আগুন নিভানোর কেউ আছ কি?... তাদের কিনে নিয়ে যাও। নিজ হাতে হত্যা করে রক্তের বদলা নাও। ... সবচে বেশী মূল্য যে দিবে তার হাতেই তাদের অর্পণ করা হবে।...দাম বলো।"

"দু'টি ঘোড়া।" একজনে বলে।

"বলো ... বেশী করে বলো!" নিলামদার পুনরায় বলে।

"দুটি ঘোড়া আর একটি উট।" আরেকজন বলে।

"ঘোড়া-উট নয়, স্বর্ণের কথা বল। ... স্বর্ণ আন ... শত্রুর রক্তে প্রতিশোধের পিপাসা মিটাও।" নিলামদার চড়া স্বরে বলে।

যাদের নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন উহুদে নিহত হয়, তারা ক্রমবর্ধমান হারে মূল্যের অংক বাড়াতে থাকে। হযরত যুবাইর (রা.) এবং হযরত যায়েদ (রা.) নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁদের চেহারায় ভীতির কোন আলামত ছিল না। উদ্বেগও ছিল না। সামান্য উৎকণ্ঠাও প্রতিভাত হয় না। হযরত খালিদ (রা.) ভীড় চিরে সামনে যান।

"এসো কুরাইশ নেতার বাহাদুর পুত্র!" হযরত খালিদকে আসতে দেখে হযরত খুবাইব (রা.) জোর আওয়াজে বলেন—"হেরা গুহা হতে উত্থিত বিপ্লবের আওয়াজ আমাদের দু'জনের রক্ত প্রবাহিত করে তোমার জাতি কখনোই বন্ধ

করতে পারবে না। তোমার গোত্রের যে কোন বীর-বাহাদুর আন এবং আমার হাতের বাধন খুলে দাও, দেখবে কে কার রক্ত দ্বারা পিপাসা নিবারণ করে।"

"রণাঙ্গনে পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী!" হযরত যায়েদ (রা.) তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বলেন—"পরাজয়ের প্রতিশোধ তোমরা আমাদের ভাইয়ের লাশের থেকে নিয়েছ। তোমাদের মহিলারা আমাদের লাশের নাক-কান কেটে তা দ্বারা হার বানিয়ে গলায় ঝুলিয়েছে।"

আজ চার বছর পর মদীনায় গমনকালে হযরত যুবাইর (রা.) ও হযরত যায়েদ (রা.)-এর কঠোর তিরস্কারের ধ্বনি হযরত খালিদের কানে বাজতে থাকে। তিনি হযরত যায়েদ (রা.)-এর তিরস্কার সহ্য করতে পারেন না। দীর্ঘ চার বছর আগের সেই তিরস্কারের কথা মনে পড়ায় আজও তাঁর শরীর ভীষণ কেঁপে ওঠে। সাথে সাথে তাঁর মনে পড়ে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার অমানবিক আচরণের লোমহর্ষক দৃশ্য। হিন্দা প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে হযরত হামযা (রা.)-এর কলিজা ছিড়ে এনে মুখে নিয়ে চিবিয়ে পরে উগরে দেয়। মৃত মুসলমানদের নাক-কান কেটে আনতে সে অন্যান্য মহিলাদের নির্দেশ দেয়। তারা নাক-কান কেটে এনে তার সামনে জমা করলে হিন্দা তা সুতায় গেঁথে মালা বানায়। অতঃপর তা গলায় দিয়ে উন্মাদের মত সারা ময়দান জুড়ে নেচে-গেয়ে ফিরতে থাকে। এ দৃশ্য তার স্বামী আবু সুফিয়ানের পছন্দনীয় ছিল না। আর হযরত খালিদ ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নেন।

তিন-চার মাস পর ধৃত এবং হাত বাঁধা দু'মুসলমান তাঁকে তিরস্কারের পর তিরস্কার করে চলছিল। হযরত খালিদ (রা.) ঘৃণ্য পন্থায় প্রতিশোধ গ্রহণের মনোবৃত্তি রাখতেন না। তিনি সেখান থেকে সরে আসেন এবং ভীড়ের মাঝে হারিয়ে যান। যারা দু'মুসলানকে ধরে আনে ঘটনাক্রমে তাদের একজনের সাথে হযরত খালিদের দেখা হয়ে যায়।

হযরত খালিদ (রা.) তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাদের কিভাবে বন্দী করা হল?

"আল্লাহ্র কসম!" লোকটি বলে, "তোমরা চাইলে তাদের রসূলকেও বন্দী করে এই নিলাম স্থলে এনে দাঁড় করাতে পারি।"

"যা কখনো পারবে না তার কসম করো না।" হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"তাদের বন্দীর বিস্তারিত তথ্য আমাকে জানাও।"

"তারা ছিল ছয়জন।" লোকটি বলতে থাকে—"আমরা উহুদে নিহতদের প্রতিশোধ নিয়েছি। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। আমাদের গোত্রের কয়েকজন মদীনায় মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে এসেছে বলে

জানায়। তারা তাঁকে একথাও বলে যে, তাদের পুরো গোত্র ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী। কিন্তু তাদের সকলের পক্ষে মদীনায় আসা সম্ভব নয়। তারা মুহাম্মাদের কাছে বিনীত অনুরোধ জানায়, যেন তাদের সাথে কয়েকজন মুসলমান পাঠান, যারা পুরো গোত্রকে মুসলমান করবে এবং তাদেরকে ধর্মীয় দীক্ষায় দীক্ষিত করতে কিছুদিন সেখানে অবস্থান করবে।...

আমাদের লোক ছয়জন মুসলমানকে আনতে সক্ষম হয়। তারা আসতে থাকে। এদিকে আমাদের সর্দার শারযা বিন মুগীছ একশ সৈন্য রযী নামক স্থানে পাঠায়। মুসলমান দলটি এ স্থানে পৌঁছলে আমাদের একশ সৈন্য তাদের ঘিরে ফেলে।... তুমি বিস্মিত হবে যে, সংখ্যায় ছয়জন হওয়া সত্ত্বেও তারা একশ সৈন্যের মোকাবেলায় প্রস্তুত হয়ে যায়। কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলে। সংঘর্ষে তিনজন নিহত এবং অপর তিনজন বন্দী হয়। তাদের হাত রশি দ্বারা বেঁধে দেয়া হয়। আমাদের সর্দার শারযা নির্দেশ দেয় যে, এরা মদীনার প্রতারিত মুসলমান। তাদেরকে মক্কায় নিয়ে গিয়ে প্রতিশোধেচ্ছুকদের হাতে উচ্চমূল্যে বিক্রি করে দিবে।...

আমরা তিনজনকে মক্কায় আনছিলাম। পথিমধ্যে একজন কৌশলে হস্তমুক্ত করে ফেলে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হলো সে মুক্ত হয়ে পালিয়ে যায়নি; বরং অস্ত্রহীন থাকায় ভেল্কিবাজির মত আমাদেরই একজনের তলোয়ার দখল করে এবং চোখের পলকে হামলা করে আমাদের দু'ব্যক্তিকে মেরে ফেলে। একজন এত মানুষের সাথে কতক্ষণই বা টিকতে পারে। এক সময় সে মারা যায়। আমরা তাকে কেটে টুকরো টুকরো করেছি। এরা দু'জন রয়ে যায়। আমরা তাদের হাত আরো শক্তভাবে বেঁধে এখানে নিয়ে এসেছি।"

"তোমরা তো বড়ই খুশী।" হযরত খালিদ (রা.) তিরস্কারের ভঙ্গিতে তাকে বলে—"কিন্তু মুহাম্মাদ এ ঘটনাকে কিভাবে মেনে নেবে?... কুরাইশ এবং তাদের মিত্র গোত্র এতই কাপুরুষ হয়ে গেছে যে, তারা এখন ধোঁকা এবং ছয়জনের মোকাবেলা একশজন দ্বারা করতে শুরু করেছে। ঘৃণ্য এ প্রতারণামূলক কাহিনী শুনাতে তোমার একটুও লজ্জা লাগেনি? একশ সৈন্য কি তাদের দুগ্ধপানকারিণী মাতাকে লজ্জিত করেনি?"

"ওলীদের পুত্র! তুমি ময়দানে মুসলমানদের কি করতে পেরেছিলে?" লোকটি হযরত খালিদকে বলে, "তোমরা মুহাম্মাদের শক্তির মোকাবেলা করতে পার? এদের এক হাজার কুরাইশ মাত্র ৩১৩ জনের হাতে চরম মার খেয়ে আসে। উহুদের যুদ্ধে মুহাম্মাদের অনুসারীর সংখ্যা কত ছিল? ...সাতশ থেকে

কম, বেশী নয়। পক্ষান্তরে কুরাইশরা ছিল কতজন? ... হাজার ... হাজার। ... শোন খালিদ! মুহাম্মাদের হাতে জাদু আছে। যেখানে জাদুর কারসাজি চলে সেখানে তলোয়ার চলে না।"

"তাহলে তোমাদের তলোয়ার কিভাবে চলল?" হযরত খালিদ পাল্টা প্রশ্ন করেন—"যদি মুহাম্মাদের হাতে সত্যই যাদু থাকে, তাহলে সে তোমাদের সর্দার শারযার প্রতারণার শিকার কিভাবে হল? চার ব্যক্তিকে কি করে হত্যা করলে? ধৃত এ দু'জনকে মুহাম্মাদের জাদু কেন মুক্ত করে না?... যাদু-টাদু কিছু নয়; আসল কথা হলো, তোমরা যার মোকাবেলার সাহস রাখ না তাকে যাদু বলে এড়িয়ে যাও।"

"আমরা জাদু দ্বারা জাদু কেটেছি।" লোকটি বলে—"আমাদের কাছে ইহুদী জাদুকর এসেছিল। তাদের সাথে তিনজন মহিলা জাদুকরও ছিল। তাদের একজনের নাম 'ইউহাওয়া'। আমরা তাদের যাদু-নৈপুণ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি যে, ঘন ঝোঁপ-জঙ্গল থেকে একটি আস্ত বর্শা বেরিয়ে আসে। বর্শাটি নিজে নিজেই ফিরে যায় এবং সাপ হয়ে আবার বাইরে আসে। একটু পর পুনরায় ঘন ঝোপ-জঙ্গলে চলে যায়।

॥ চব্বিশ ॥

একদিকে ঘোড়া পথ অতিক্রম করতে থাকে আর অপরদিকে হযরত খালিদের স্মৃতির পৃষ্ঠাও উল্টাতে থাকে। তিনি বেদনাভরা অতীত সামনে আনতে চান না, কিন্তু বিষাক্ত ভীমরুলের মত অতীত তাঁর স্মৃতিপটে ভনভন করতে থাকে। স্মৃতির স্ক্রীনে ইউহাওয়ার ছবি ভেসে ওঠে। সে জাদুকর ছিল কি-না, সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত নন। তবে তার রূপে, দেহের ভাঁজে ভাঁজে, মুচকি হাসি এবং কথা বলার ভঙ্গিতে অবশ্যই যাদু ছিল। তিনি শারযা বিন মুগীছের সম্প্রদায়ের লোকটির মুখে ইউহাওয়ার নাম শুনে তাই চমকে ওঠেন। উহুদ যুদ্ধ শেষে কুরাইশরা মক্কা প্রত্যাবর্তন করলে মক্কার ইহুদীরা এমন ভাঙ্গা মন নিয়ে আবু সুফিয়ান, খালিদ এবং ইকরামার কাছে আসে, যেন উহুদে পরাজয় ইহুদীদেরই হয়েছে। ইহুদীদের সর্দার আবু সুফিয়ানকে বলে, মুসলমানদের পরাজয় হয়নি এবং কোন চূড়ান্ত ফলাফল ছাড়াই যুদ্ধ শেষ হয়েছে। অতএব এটা কুরাইশদেরই পরাজয়। ইহুদীদের চরম ব্যর্থতা ...। ইহুদীরা কুরাইশদের কাছে এমনিভাবে সহমর্মিতা প্রকাশ করে, যেন কুরাইশদের ব্যর্থতার চিন্তায় তারা একেবারে মরে যাবার উপক্রম।

এ সময় ইউহাওয়ার সাথে হযরত খালিদের প্রথম সাক্ষাত হয়। তিনি ঘোড়াকে পায়চারি করাতে আবাসিক এলাকার বাইরে গিয়েছিলেন। ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে ইউহাওয়ার সাথে দেখা হয়। ইউহাওয়ার মুচকি হাসি তাকে থামিয়ে দেয়।

"আমি মেনে নিতে পারছি না যে, ওলীদের পুত্র যুদ্ধ হতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে।" ইউহাওয়া মুখে এ কথা বলে হযরত খালিদের ঘোড়ার গলায় হাত বুলাতে থাকে। পুনরায় বলে—"ঐ ঘোড়া আমার খুব প্রিয় যা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল।"

হযরত খালিদ (রা.) ঘোড়া থেকে এমনভাবে নেমে আসেন, যেন তিনি নন, বরং ইউহাওয়ার জাদুই তাঁকে ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে এনে দাঁড় করায়।

"এর চেয়ে বড় ব্যর্থতা আর কি হতে পারে যে, তোমরা মুসলমানদের পরাজিত করতে পারনি।" ইউহাওয়া বলে—"তোমাদের পরাজয় মানে আমাদেরই পরাজয়। এখন আমরা তোমাদের সঙ্গ দিব কিন্তু আমরা সাথে থাকলেও তোমরা আমাদের দেখতে পাবে না।"

হযরত খালিদ (রা.) অনুভব করেন, তাঁর জবান কেমন যেন জড়িয়ে যাচ্ছে। তলোয়ার, বর্শা এবং তীরের আঘাত মোকাবেলায় সিদ্ধহস্ত হযরত খালিদ (রা.) ইউহাওয়ার মুচকি হাসির মোকাবেলা করতে পারে না।

"ইহুদীরা যদি ময়দানে আমাদের সাথে সাথেই না থাকে তবে তাদের দ্বারা আমাদের আর কি কাজে আসবে?" হযরত খালিদ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন।

"মানুষের শরীরে শুধু তীরই ভেদ করে বলে মনে কর?" ইউহাওয়া দার্শনিক ভঙ্গিতে বলে—"নারীর অধরের এক চিলতে হাসি তোমার মত বীর-বাহাদুরের হাত থেকে তলোয়ার ফেলে দিতে পারে।"

হযরত খালিদ (রা.) তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান, কিন্তু সুযোগ পান না। ইউহাওয়া তাঁর চোখে চোখ রাখে এবং ঠোঁটে ফুলের পাপড়ির মত মুচকি হাসির ঝলক তুলে চলে যায়। হযরত খালিদ অনিমেষ লোচনে তার গমন পথে চেয়ে থাকেন। শত চেষ্টা করেও চোখ ফিরাতে পারেন না। তিনি দেহে এক ধরনের শিহরণ ও আকর্ষণ অনুভব করেন। কিংবাক ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। এক সময় তার ঘোড়া মাটিতে ক্ষুরাঘাত করলে তিনি বাস্তবে ফিরে আসেন। তিনি দ্রুত ঘোড়ায় আরোহণ করে ঘোড়া ছুটিয়ে দেন। কিছুদূর এসে পিছনে তাকালে দেখেন যে, ইউহাওয়া ঠাঁয় দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। চার চোখের মিলন হলে ইউহাওয়া হাত সামান্য উঠিয়ে বিদায়ের ভঙ্গিতে নাড়ায়।

॥ পঁচিশ ॥

নিলামকৃত দু'মুসলমানের প্রতারণামূলক বন্দীর কথা এবং এর সাথে ইউহাওয়ার জড়িত থাকার কথা জানতে পেরে হযরত খালিদ (রা.) এ রহস্য উদ্ধারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন যে, ইউহাওয়া তার এ জাদু কিভাবে কার্যকর করে। হঠাৎ তারই গোত্রের এক নেতাগোছের লোকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সেই তাঁকে পুরো ঘটনা খুলে বলে।

তিন-চারজন নেতৃস্থানীয় ইহুদী ইউহাওয়াসহ আরো তিন ইহুদীকে নিয়ে শারযা বিন মুগীছের কাছে যায়। এই গোত্রটি দুর্ধর্ষ যুদ্ধবাজ হলেও তাদের উপর মুসলমানদের প্রভাব জাদুকরদের ন্যায় পড়েছিল। রাসূল (সা.)-এর হাতে জাদু আছে বলে এই গোত্রের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁরা যুদ্ধবাজ হওয়ায় ইহুদীরা ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য এই গোত্রকে নির্বাচন করে।

ইহুদী জাতটাই বড় বিচক্ষণ এবং দূরদর্শী। তারা চিন্তা করে মুসলমানদের জাদুর ধারণা এভাবে ছড়াতে থাকলে অন্যান্য গোত্রেও তার প্রতিক্রিয়া পড়বে। এটা ঠেকাতেই মূলত ইহুদীরা গোত্রপ্রধান শারযার কাছে যায়। তাকে বিভিন্ন যুক্তি-তর্কে এই ধারণা ভিত্তিহীন ও অসত্য বলে বোঝাতে চেষ্টা করে কিন্তু শারযা তাদের কথা বিশ্বাস করতে পারে না। ইহুদীদের অনুরোধে শারযা বিন মুগীছ রাতে তাদের পানাহারের ব্যবস্থা একটি খোলা ময়দানে করে। ইহুদী অতিথিরা ধন্যবাদস্বরূপ মেজবানদের শরাব পান করায়। শারযাসহ নেতৃস্থানীয় লোকদের শরাব ছিল উন্নতমানের। তাতে ইহুদীরা আবার হাশীশ নামক নেশা জাতীয় দ্রব্য মিশ্রিত করে দেয়। এরপর ইহুদীরা কিছু ভেল্কিবাজিও তাদের দেখায়।

ইউহাওয়া তার রূপের জাদু চালাতেও ত্রুটি করে না। তাকে উপলক্ষ্য করে একটি নৃত্যানুষ্ঠানও হয়। অনুষ্ঠানে ইউহাওয়া প্রায় অর্ধনগ্ন ছিল। নামেমাত্র পোষাক ছিল তার কমনীয় শরীরে। নাচতে নাচতে এক সময় এ অর্ধনগ্ন পোষাকটুকুও শরীর থেকে খসে পড়ে। ইহুদীরা প্রযোজকও সাথে নিয়ে গিয়েছিল।

পরের দিন শারযা বিন মুগীছের চোখ খুললে এই মাত্র সুন্দর কোন স্বপ্ন দেখে জাগলো বলে তার মনে হয়। মুসলমানদের সম্পর্কে তার পূর্বধারণা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর গোত্রের অন্যান্য সর্দারদের সাথে সে ইহুদীদের নিকট বসা ছিল। ইউহাওয়াও সেখানে ছিল। শারযা তাকে দেখেই অস্থির হয়ে ওঠে। তড়াক করে উঠে ইউহাওয়ার হাত ধরে নিজের পাশে এনে বসায়।

"শত্রুকে খোলা ময়দানে আহ্বান করে পরাজিত করতে হবে, এটা মোটেও জরুরী নয়।" এক ইহুদী বলে—"আমরা মুসলমানদের অন্যান্য উপায়েও শেষ করতে পারি। একটি পদ্ধতি বলছি শোন।"

হযরত খালেদকে জানানো হয় যে, ছয় মুসলিম সদস্যকে মদীনা হতে এভাবে প্রতারণামূলক আনার পরিকল্পনা ইহুদীরাই পেশ করেছিল। তাদের কথা মত মুসলমানদের প্রতারিত করতে শারযা যাদেরকে রাসূল (সা.)-এর কাছে পাঠায় তাদের মধ্যে একজন ইহুদীও ছিল। হযরত খালিদ মুসলমানদেরকে নিকৃষ্ট দুশমন মনে করতেন ঠিকই কিন্তু তাই বলে এই জঘন্য ও অনৈতিক পন্থা তিনি মেনে নিতে পারেন না।

হযরত খালিদ বিস্তারিত তথ্য জেনে নিজের বাড়ি ফিরে এসে চাকরানীকে নির্দেশ দেন, যেন সে এখনই ইউহাওয়া ইহুদী মহিলাকে ডেকে নিয়ে আসে। ইউহাওয়া এত জলদি তার কাছে উপস্থিত হয় যেন সে তারই ডাকের অপেক্ষায় আশেপাশে কোথাও বসা ছিল।

"তোমরা মুসলমানদেরকে সাফল্যের সাথে ধোঁকা দিতে সক্ষম হয়েছ।" হযরত খালিদ ইউহাওয়াকে বলেন—"মুগীছের গোত্রের লোকেরাও তোমাদেরকে জাদুবাজ বলছে। কিন্তু এ পন্থা আমার মনঃপূত নয়।"

"মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোন খালিদ!" ইউহাওয়া তাঁর শরীর ঘেঁষে বসে এবং তাঁর রানের উপর হাত রেখে বলে—"এটা অনস্বীকার্য যে, তুমি একজন বিশিষ্ট বীর যোদ্ধা। কিন্তু তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি এখনও পক্ক হয়নি। দুশমনকে প্রতিহত করা আমাদের মূল টার্গেট। চাই তা তলোয়ারের মাধ্যমে হোক, তীরের মাধ্যমে হোক কিংবা দৃষ্টি-শর নিক্ষেপণের মাধ্যমে হোক। তীর-তলোয়ার ছাড়া দুশমনকে কাবু আমার মত মহিলাই কেবল করতে পারে।"

হযরত খালিদ (রা.) ইউহাওয়ার শরীরের উত্তাপ অনুভব করেন। ইউহাওয়া তার এত গা ঘেঁষে বসেছিল যে, একবার ইউহাওয়ার চেহারা হযরত খালিদের দিকে ঘুরালে তুলার মত তার মোলায়েম গাল হযরত খালিদের গালে গিয়ে স্পর্শ করে। এতে তিনি সারা শরীরে আনন্দের এক তীব্র শিহরণ অনুভব করেন। কিন্তু তারপরেও কোন খেয়ালে যেন একটু সরে বসেন।

দীর্ঘ চার বছর পর মরুভূমি অতিক্রমকালে পুরাতন স্মৃতি মনে পড়ায় হযরত খালিদ (রা.) আরেকবার তাঁর গালে ইউহাওয়ার গালের স্পর্শ অনুভব করেন। ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের পাশে আছে—বিষয়টি তাকে আপ্লুত করলেও তিনি ভাল করেই জানতেন যে, মুসলমানদের বিরোধিতায় ইহুদীরা

তাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলেও তাদের জাতীয় স্বার্থও এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অবশ্য এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত হয়ে যান যে, ইউহাওয়া জাদুকর না হলেও তার আপাদমস্তক অবশ্যই জাদুস্নাত।

॥ ছাব্বিশ ॥

হযরত খালিদের ঘোড়া মদীনা পানে ধাবমান। হযরত যুবাইর (রা.) ও হযরত যায়েদ (রা.)-এর কথা আরেকবার তাঁর মনে পড়ে। নিলাম চত্বরে মানুষ ক্রমে উচ্চদর হাঁকছিল। এক সময় বিক্রি হয়ে যায়। দু'কুরাইশ প্রচুর স্বর্ণের বিনিময়ে তাদের কিনে নেয়। ক্রেতাদ্বয় সাহাবী দু'জনকে আবু সুফিয়ানের কাছে নিয়ে যায়।

"আমরা দু'মুরতাদকে ক্রয় করেছি কেবল উহুদে নিহত কুরাইশদের রক্তের বদলা নেয়ার জন্য।" ক্রেতাদ্বয় বলে—"আমরা তাদেরকে আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। আপনি আমাদের মান্যবর নেতা এবং সিপাহসালার।"

"হ্যাঁ।" আবু সুফিয়ান বলে—"মক্কাভূমি মুসলমানদের রক্তের পিয়াসী। তাদের রক্ত দ্বারা জমিনের পিপাসা মিটাও।... কিন্তু এখনই এটা সম্ভব নয়। কারণ, চলতি মাস আমাদের দেবতা হুবল ও উযযার সম্মানিত মাস। এ মাস শেষ হতে দাও। আর মাত্র একদিন বাকী। আগামীকাল খোলা ময়দানে একটি খুটির সাথে তাদের বেঁধে আমাকে খবর দিও।"

হযরত খালিদ আবু সুফিয়ানের এই নির্দেশ শুনে তার কাছে যান।

"আপনার এই সিদ্ধান্ত আমার মনঃপূত নয়।" হযরত খালিদ আবু সুফিয়ানকে বলে—সংখ্যায় দ্বিগুণ, তিনগুণ হওয়া সত্ত্বেও যদি আমরা লড়াইয়ের মাধ্যমে মুসলমানদের রক্ত মাতৃভূমিকে পান না করতে পারি তবে প্রতারণাচ্ছলে দুই মুসলিমকে ধরে এনে রক্ত প্রবাহিত করার অধিকার রাখি না।... আবু সুফিয়ান! মুসলমানদের প্রতারণার মধ্যে তিন-চারজন মহিলারও দখল রয়েছে? তুমি কি চাও যে, শত্রু এ কথা বলার সুযোগ পাক যে, কুরাইশরা এখন ময়দানে মহিলাদের নামিয়ে নিজেরা প্রাণভয়ে ঘরে বসে আছে?"

"খালিদ!" গম্ভীরকণ্ঠে আবু সুফিয়ান বলে—"খুবাইব এবং যায়েদকে আমিও এক সময় তোমার মত নিকটতম মনে করতাম। তুমি এখনও তাদেরকে পূর্বের দৃষ্টিতে দেখছ। অথচ তুমি সম্পূর্ণ ভুলে গেছ যে, তারা এখন আমাদের ঘোরতর শত্রুতে পরিণত হয়েছে। একান্তই যদি তাদের মুক্ত করতে চাও তাহলে দ্বিগুণ স্বর্ণের বিনিময়ে ক্রেতাদের থেকে তাদেরকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে পার।"

"না।" পর্দার ওপাশ থেকে স্বক্রুদ্ধ এক নারীর আওয়াজ ভেসে আসে। এটা আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার আওয়াজ ছিল। সে ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে বলে— "হামযার কলিজা চিবিয়েও আমার অন্তরাত্মা শান্ত হয়নি। দুনিয়ার সমস্ত স্বর্ণের বিনিময়ে হলেও আমি এ দু'মুসলমানকে আজাদ করতে দিব না।"

"আবু সুফিয়ান!" হযরত খালিদ বলেন—"যদি আমার স্ত্রী আমার কথার মধ্যে এভাবে কথা বলত, তাহলে তার জিহ্বা আমি টেনে ছিঁড়ে ফেলতাম।"

"স্ত্রীর জিহ্বা তুমি টেনে ছিঁড়তে পার?" হিন্দার প্রত্যুত্তর আসে—"যুদ্ধে তোমার পিতা, চাচা ও পুত্র নিহত হয়নি। এক ভাই বন্দী হলে তাও মদীনায় গিয়ে মুসলমানদের নির্ধারিত মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে এনেছ। যে আগুন আমার হৃদয়ে জ্বলছে তার উত্তাপ তোমার জানা নেই।"

হযরত খালিদ আবু সুফিয়ানের দিকে তাকান। তার চেহারায় পৌরুষ সুলভ দীপ্ততা ও মহান সেনানায়কের দৃঢ়তার পাশাপাশি এক স্বামীর অসহায়ত্বের ছাপও স্পষ্ট ছিল।

"হ্যাঁ, খালিদ!" আবু সুফিয়ান দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে—"বেদনাহত ব্যক্তির অন্তরের অবস্থা তোমার থেকে অনেক ভিন্ন। কাউকে শত্রু সাব্যস্ত করা অনেক সহজ। কিন্তু আপনজনের রক্তের মোকাবেলায় কোন শত্রুকে ক্ষমা করা অনেক কঠিন-অসম্ভব। এ দু'মুসলমানের প্রাণ রক্ষার ব্যাপারে কতজনকে এভাবে বলে বলে রাজি করাতে পারবে? তুমি বৃথা অনুরোধ করো না খালিদ! নিজ গোত্রের দয়া-মায়ার উপর তাদের ছেড়ে দাও।"

হযরত খালিদ নীরবে প্রস্থান করেন।

॥ সাতাশ ॥

এরপর হযরত খালিদের একটি ভয়ঙ্কর দৃশ্যের কথা মনে পড়ে। খোলা ময়দানে দু'খাম্বার সাথে হযরত খুবাইব (রা.) ও হযরত যায়েদ (রা.) বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। হর্ষোৎফুল্ল জনতা হৈ-হুল্লোড় করে ময়দানের চারপাশে সমবেত হয়। এক সময় আবু সুফিয়ান ও হিন্দা ঘোড়ায় চড়ে সমবেত জনতার মাঝে উপস্থিত হলে উত্তেজনাকর শ্লোগান এবং প্রতিশোধমূলক উচ্চারণ তীব্রতরভাবে উচ্চকিত হয়ে যায়। এই বিশাল জনতার মাঝে কেউ যদি নীরব থাকেন তবে তিনি ছিলেন একমাত্র হযরত খালিদ (রা.)।

আবু সুফিয়ান ঘোড়ায় চড়ে বন্দীদের নিকটে যায়। তাঁরা শেষবারের মত নামায পড়তে চান। আবু সুফিয়ান অনুমতি প্রদান করে।

হযরত খালিদ মদীনার পথে গমনকালে যখন তাঁর সেই পুরাতন স্মৃতি মনে পড়ে যে, বন্দীদ্বয়ের হাত খুলে দিলে তাঁরা অত্যন্ত শান্ত ও স্থিরচিত্তে কেবলামুখী হয়ে নামায আদায় করেন, তখন এর যে গভীর প্রতিক্রিয়া তাঁর মধ্যে প্রভাব ফেলে, দীর্ঘ চার বছর পরও তিনি সে প্রতিক্রিয়া দেহে পুনরায় অনুভব করেন। ঘোড়ার পিঠে বসে বসেই তার মস্তক অবনত হয়ে আসে।

হযরত খুবাইব (রা.) এবং হযরত যায়েদ বিন দিছানা (রা.) জনতার আওয়াজ উপেক্ষা এবং মৃত্যুর শঙ্কা এড়িয়ে নিবিষ্টমনে নামাযে হারিয়ে যান। নিরুদ্বেগ ও শান্তভাবে নামায পড়েন। দোয়ার জন্য হস্ত উত্তোলন করেন। আল্লাহ্র সমীপে তাদের শেষ আরজি কি ছিল, তা কেউ বলতে পারে না। ইতিহাসও এ ব্যাপারে নীরব। তবে দুশমনের হাত থেকে মুক্তির আবেদন করেননি।

নামায শেষে তাঁরা নিজেরাই নির্দিষ্ট খুঁটিতে গিয়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে যান।

"বদ কিসমত মুসলমান!" আবু সুফিয়ান হযরত খুবাইব (রা.) ও হযরত যায়েদ (রা.)-কে লক্ষ্য করে উচ্চকণ্ঠে বলে—"তোমাদের ভাগ্য এবং জীবন এখন আমার হাতে। বাঁচতে চাইলে বল, আমরা ইসলাম ত্যাগ করে কুরাইশদের কাতারে এসে গেছি এবং ৩৬০ মূর্তিকে সত্য-সঠিক স্বীকার করছি। ... যদি এতে সম্মত না হও তবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। মনে রেখ, তোমাদের মৃত্যু সহজ হবে না।"

"বাতিলের পূজারী আবু সুফিয়ান!" হযরত যায়েদ (রা.) গর্জে ওঠেন—"প্রস্তর নির্মিত ঐ মূর্তির উপর অভিসম্পাত, যারা নিজের শরীরে পতিত মাছি তাড়াতেও অক্ষম। উযযা এবং হুবল মূর্তির উপর অভিশাপ দিই, যারা পরকালে তোমাদের জাহান্নামের কারণ হবে। আমরা এক ও অদ্বিতীয় পরম দয়ালু ও করুণাময়ের ইবাদাত করি এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)-কে আন্তরিকভাবে ভালবাসি।"

"আমিও ঐ পথের পথিক যায়েদ যে পথ তোমাকে প্রদর্শন করেছে।" হযরত খুবাইব (রা.) উচ্চ কণ্ঠে জানিয়ে দেন—"হে মক্কাবাসী! চিরন্তন সত্তা তিনিই, যার নামে আমরা প্রাণ উৎসর্গ করতে যাচ্ছি। এতে আমাদের প্রাণ বিসর্জন হবে না, বরং আমরা লাভ করব এক নতুন জীবন, যা বর্তমান জীবন থেকে আরো সুন্দর, আরো উন্নত।"

"খুঁটির সাথে তাদের বেঁধে ফেল।" আবু সুফিয়ান নির্দেশ দেয়—"এরা জীবন নয়; মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদনে আগ্রহী।"

হযরত খালিদ মদীনার পথে গমনকালে যখন তাঁর সেই পুরাতন স্মৃতি মনে পড়ে যে, বন্দীদ্বয়ের হাত খুলে দিলে তাঁরা অত্যন্ত শান্ত ও স্থিরচিত্তে কেবলামুখী হয়ে নামায আদায় করেন, তখন এর যে গভীর প্রতিক্রিয়া তাঁর মধ্যে প্রভাব ফেলে, দীর্ঘ চার বছর পরও তিনি সে প্রতিক্রিয়া দেহে পুনরায় অনুভব করেন। ঘোড়ার পিঠে বসে বসেই তার মস্তক অবনত হয়ে আসে।

হযরত খুবাইব (রা.) এবং হযরত যায়েদ বিন দিছানা (রা.) জনতার আওয়াজ উপেক্ষা এবং মৃত্যুর শঙ্কা এড়িয়ে নিবিষ্টমনে নামাযে হারিয়ে যান। নিরুদ্বেগ ও শান্তভাবে নামায পড়েন। দোয়ার জন্য হস্ত উত্তোলন করেন। আল্লাহ্‌র সমীপে তাদের শেষ আরজি কি ছিল, তা কেউ বলতে পারে না। ইতিহাসও এ ব্যাপারে নীরব। তবে দুশমনের হাত থেকে মুক্তির আবেদন করেননি।

নামায শেষে তাঁরা নিজেরাই নির্দিষ্ট খুঁটিতে গিয়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে যান।

"বদ কিসমত মুসলমান!" আবু সুফিয়ান হযরত খুবাইব (রা.) ও হযরত যায়েদ (রা.)-কে লক্ষ্য করে উচ্চকণ্ঠে বলে—"তোমাদের ভাগ্য এবং জীবন এখন আমার হাতে। বাঁচতে চাইলে বল, আমরা ইসলাম ত্যাগ করে কুরাইশদের কাতারে এসে গেছি এবং ৩৬০ মূর্তিকে সত্য-সঠিক স্বীকার করছি। ... যদি এতে সম্মত না হও তবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। মনে রেখ, তোমাদের মৃত্যু সহজ হবে না।"

"বাতিলের পূজারী আবু সুফিয়ান!" হযরত যায়েদ (রা.) গর্জে ওঠেন—"প্রস্তর নির্মিত ঐ মূর্তির উপর অভিসম্পাত, যারা নিজের শরীরে পতিত মাছি তাড়াতেও অক্ষম। উযযা এবং হুবল মূর্তির উপর অভিশাপ দিই, যারা পরকালে তোমাদের জাহান্নামের কারণ হবে। আমরা এক ও অদ্বিতীয় পরম দয়ালু ও করুণাময়ের ইবাদাত করি এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)-কে আন্তরিকভাবে ভালবাসি।"

"আমিও ঐ পথের পথিক যায়েদ যে পথ তোমাকে প্রদর্শন করেছে।" হযরত খুবাইব (রা.) উচ্চ কণ্ঠে জানিয়ে দেন—"হে মক্কাবাসী! চিরন্তন সত্তা তিনিই, যার নামে আমরা প্রাণ উৎসর্গ করতে যাচ্ছি। এতে আমাদের প্রাণ বিসর্জন হবে না, বরং আমরা লাভ করব এক নতুন জীবন, যা বর্তমান জীবন থেকে আরো সুন্দর, আরো উন্নত।"

"খুঁটির সাথে তাদের বেঁধে ফেল।" আবু সুফিয়ান নির্দেশ দেয়—"এরা জীবন নয়; মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদনে আগ্রহী।"

একটু পর জনতা দু'শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। এক শ্রেণী হযরত খুবাইব (রা.)-এর হত্যার বিরোধী ছিল। কেননা, তারা এভাবে হত্যা করাকে আরব নীতির পরিপন্থী মনে করে। দ্বিতীয় শ্রেণীটি হযরত যুবাইর (রা.)-কে তিলে তিলে হত্যার জোর শ্লোগান তোলে। হযরত খালিদ জনতাকে এভাবে দু'ভাগে বিভক্ত হতে এবং একদল অপরদলের বিপক্ষে শ্লোগানরত দেখে দ্রুত আবু সুফিয়ানের কাছে যায়।

"দেখেছ আবু সুফিয়ান! হযরত খালিদ বলেন—"দেখেছ এখানে আমার কত সমমনা লোক রয়েছে। একজনকে হত্যা করেছ, এখন অপরজনকে ছেড়ে দাও। নতুবা কুরাইশদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বেঁধে যাবার আশঙ্কা রয়েছে।

হিন্দা আবু সুফিয়ানের কাছে হযরত খালিদকে দণ্ডায়মান দেখে বুঝে ফেলে যে, সে যুবাইরের মুক্তির পক্ষে এবং এর জন্য সে চেষ্টা চালাচ্ছে। হিন্দা দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে তাদের কাছে এসে পৌঁছে।

"খালিদ!" হিন্দা কঠোর ভাষায় বলে—"আমি জানি তুমি কি চাচ্ছ। আবু সুফিয়ানকে তুমি নেতা বলে মান না? না মানলে এখান থেকে সরে পড়। আমার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবেই।"

"খালিদ!" আবু সুফিয়ান বলে, আমার নির্দেশ এবং সিদ্ধান্ত সঠিক না হলেও তা কার্যকর হতে দাও। এখন নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিলে সেটা হবে আমার দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ। এরপর মানুষ আমার প্রতিটি নির্দেশের সাথে সাথে তা প্রত্যাহারেরও ধারণা রাখবে।

মদীনার যাত্রা পথে এসব মনে পড়ার সাথে সাথে তাঁর আফসোসও হয় যে, তিনি কেন সেদিন আবু সুফিয়ানের নির্দেশ মেনে নেন। হযরত খালিদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও গুণ ছিল সু-শৃঙ্খল সৈন্য পরিচালনা ও নেতার প্রতি সর্বোচ্চ আনুগত্য। সেদিন তিনি বুকে পাথর চেপে আবু সুফিয়ানের নির্দেশ শুধু এ কারণে মেনে নেন যে, যাতে কুরাইশদের মাঝে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ধারা তাঁর থেকে চালু না হয়।

"মক্কাবাসী!" দু'ভাগে বিভক্ত জনতাকে লক্ষ্য করে আবু সুফিয়ান উচ্চকণ্ঠে বলে—"দু'জন মুসলিম হত্যার প্রশ্নে যদি এখানে আমরা এভাবে দু'গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ি, তাহলে যুদ্ধের ময়দানেও কোন সাধারণ ব্যাপার নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যেতে পারি। তখন বিজয় শত্রুদেরই হবে। যদি নেতার আনুগত্য হতে এভাবে সরে যাও তবে তোমাদের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

জনতার হৈ চৈ ও উত্তেজনা হ্রাস পায়। তবে কতক নেতাকে মুখভার করে ফিরে যেতে দেখেন তিনি। নেতাদের পিছু পিছু অনেক দর্শকও বাড়ির পথ ধরে।

অবশ্য খালিদও এখানে থাকতে চান না। ঘটনা গৃহযুদ্ধের দিকে মোড় নেয়ার আশঙ্কা বোধ করছিলেন তিনি। তার গোত্রের অনেক লোক দর্শক হিসেবে সেখানে ছিল। গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিলে তিনি অন্তত নিজ গোত্রের লোকদের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন।

॥ আটাশ ॥

হিন্দা বিনোদনের সার্বিক ব্যবস্থা সম্পন্ন করে রাখে। তার ইশারায় বর্শা হাতে চল্লিশজন অল্পবয়স্ক বালক হৈ চৈ করতে করতে দৌড়ে জনতার মাঝ থেকে বের হয় এবং হযরত খুবাইব (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাকে ঘিরে নাচতে ও আনন্দ প্রকাশ করতে থাকে। কয়েকটি বালক বর্শা নিয়ে হযরত খুবাইব (রা.) পর্যন্ত গিয়ে বর্শা উঁচু করে নিক্ষেপ করত। কিন্তু বর্শা তাঁকে আঘাত করার পূর্বেই আবার হাত টেনে নিত। হযরত খুবাইব (রা.) চমকে উঠে শ্লোগান দিয়ে উঠতেন—"আমার আল্লাহ্ সত্য এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্র রাসূল।"

একদলের পর আরেকদল এসে এমন ভঙ্গিতে আক্রমণ করত যেন এখনই হযরত খুবাইব (রা.)-এর শরীর চালনী হয়ে যাবে। কিন্তু তারা আঘাত মাঝপথেই ফিরিয়ে নিতে থাকে। হযরত খুবাইব (রা.)-এর বারংবার চমকে উপস্থিত জনতা বালকদের ধন্য ধন্য করে ওঠে এবং খিলখিলিয়ে হাসতে থাকে।

বালকদের এ খেলা কিছুক্ষণ অব্যাহত থাকে। দ্বিতীয় পর্বে এসে তারা এ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে যে, বর্শা এভাবে মারে যে, তার ফলা হযরত খুবাইব (রা.)-এর চামড়া সামান্য ভেদ করে। দীর্ঘক্ষণ এ ধারা চলে। দর্শকরা ধন্যবাদ জানাতে আর হযরত খুবাইব (রা.) "আল্লাহু আকবার", "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বলতে থাকেন। ইতিমধ্যে হযরত খুবাইব (রা.)-এর রক্তে পরিধেয় বস্ত্র লাল হয়ে যায়।

আবু জেহেল তনয় ইকরামা বর্শা হাতে বালকদের কাছে যায় এবং তাদেরকে বিভিন্ন কলা-কৌশল জানাতে থাকে। ছেলেগুলো এবার বর্শার ফলা হযরত খুবাইব (রা.)-এর দেহে আমূল বিদ্ধ করতে থাকে। তারা বৃত্তাকারে নেচে-গেয়ে বর্শা বিদ্ধ করছিল। হযরত খুবাইব (রা.)-এর দেহ বর্শার আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে যায়। দেহের এমন কোন স্থান ছিল না, যেখানে বর্শা বিদ্ধ হয়নি এবং সেখান থেকে রক্ত টপটপ করে পড়েনি। মুখেও বর্শার আঘাত করা হয়। অনেকক্ষণ ধরে ছেলেরা এভাবে নাচতে নাচতে এবং বর্শা মারতে মারতে হাফিয়ে উঠলে তখন ইকরামা এসে তাদের দূরে সরিয়ে দেয়। হযরত খুবাইব (রা.) ছিলেন রক্তস্নাত। শরীরে তখনও প্রাণ ছিল। চোখ ঘুরিয়ে চারদিক নজর বুলাচ্ছিলেন। শত

আহতের মাঝেও মুখে শ্লোগান ঠিকই চালু ছিল। ইকরামা এবার তাঁর বরাবর এসে দাঁড়ায় এবং বর্শা উঁচু করে হযরত খুবাইব (রা.)-এর বক্ষে তীব্রবেগে আঘাত করে। ব্যবধান কম থাকায় বর্শা তার বক্ষ এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়। তিনি শহীদ হয়ে যান।

"তার লাশ এখানেই বাধা থাকুক।" হিন্দার গুরুগম্ভীর কণ্ঠ শোনা যায়—"মানুষ কয়েকদিন ধরে তার লাশের পচন-গলনের তামাশা দেখবে।"

॥ ঊনত্রিশ ॥

এটা ছিল ৬২৫ খৃস্টাব্দের এক নৃশংস ঘটনা। অতীত এ ঘটনা মনে হওয়ায় হযরত খালিদ (রা.) হৃদয়ে এক তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভব করেন। হযরত খুবাইব (রা.) ও হযরত যায়েদ (রা.)-এর হত্যা কুরাইশ নেতৃবৃন্দের মাঝে বিভেদের বীজ বপন করেছিল। শেষবারের মত তাঁদের নামায আদায় এবং ইসলাম ত্যাগের উপর মৃত্যুকে প্রাধান্য দান কুরাইশদের কতক সর্দারের অন্তরে গভীর দাগ কাটে। স্বয়ং হযরত খালিদ (রা.) মনে মনে ইসলামের না হলেও হযরত খুবাইব ও হযরত যায়েদ (রা.)-এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। মূলত এ ঘটনা থেকেই আবু সুফিয়ান ও তার স্ত্রী হিন্দার প্রতি তাঁর অন্তরে অসম্মান ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়।

"এটা বীরের ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য নয়।" হযরত খালিদ মনে মনে বলেন—"এটা কাপুরুষোচিত আচরণ, বীরের জন্য অশোভনীয়।"

যে সমস্ত কুরাইশ নেতৃবৃন্দ শহীদ সাহাবীদ্বয়ের হত্যার বিরোধী ছিল তাদের আহূত এক বৈঠকে হযরত খালিদ উপস্থিত ছিলেন।

"আপনারা জানেন কি, সেদিন যাদের নির্মমভাবে হত্যা করা হল, তারা মাত্র দু'জন ছিলেন না; বরং ছয়জন ছিলেন?" হযরত খালিদ নেতৃবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করেন।

"হ্যাঁ।" এক নেতা জবাবে বলে—"এটা শারযা বিন মুগীছের কারসাজি ছিল। সেই এই ছয় মুসলমানকে প্রতারণাপূর্বক ফাঁদে ফেলে।"

"আর এর পিছনে মক্কার ইহুদীদের ব্রেন কাজ করে" হযরত খালিদ বলেন, ইউহাওয়া নাম্নী এক রমণী সাথে আরও দু'তিন ইহুদী ললনা নিয়ে গিয়ে তাদেরকে রূপের জাদুতে ঘায়েল করে।"

"ইউহাওয়া একজন জাদুকর মহিলা।" এক নেতা মন্তব্য করে—"সে চাইলে ভাইকে ভাইয়ের হাতে জবেহ করাতে পারে।"

"এটা কি আশঙ্কার নয় যে, ইহুদীরা আমাদেরও একে অপরের দুশমনে পরিণত করবে?" আরেক নেতা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বলে।

"না।" এক প্রবীণ নেতা বলে—"ইহুদীরা আমাদের মতই মুহাম্মাদের দুশমন। ইহুদীদের স্বার্থ এতেই নিহিত যে, তারা আমাদের আর মুসলমানদের মধ্যে শত্রুতা এত তীব্র করবে, যাতে আমরা মুসলমানদের নাম-নিশানা মিটিয়ে দিই।"

"এ মুহূর্তে ইহুদীদের প্রতি সন্দিহান হওয়া উচিত হবে না।" এক নেতা বলে—"বরং কর্তব্য হল, গোপনভাবে ইহুদীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা।"

"তবে সেটা এমন নয়; যেমনটি শারযা করেছে।" হযরত খালিদ বলেন—"আবার এমনও নয়, আবু সুফিয়ান এবং তার স্ত্রী যেমনটি দেখিয়েছে।"

"এ খবর কেউ রাখ কি যে, ইউহাওয়া মক্কার কয়েকজন ইহুদীকে নিয়ে মদীনায় গেছে?" প্রবীণ নেতা অন্যান্যদের এ কথা জিজ্ঞাসা করে নিজেই আবার জবাবে বলে—"সে মদীনা ও মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকার ইহুদী এবং অন্যান্য গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলবে। ইহুদীরা ইসলামের প্রচার-প্রসারকে 'ঈশান কোণে কালো মেঘ' বিচার করছে। যদি এভাবে মুহাম্মাদের আকীদা-বিশ্বাস প্রসারিত হয় এবং রণাঙ্গনে মুহাম্মাদের অনুসারীরা বীরত্বের ধারা অব্যাহত রাখে, তবে ইহুদীদের সূর্য নিঃসন্দেহে অস্তমিত হবে।"

"কিন্তু ইহুদীরা তো যুদ্ধবাজ জাতি নয়।" হযরত খালিদ বলেন—"তারা রণাঙ্গনে আমাদের পাশে থাকার সামর্থ্য রাখে না।"

"রণাঙ্গনে তারা মুসলমানদের জন্য বেশী ভয়ঙ্কর প্রমাণিত হবে।" আরেক নেতা মন্তব্য করে—"তারা ইউহাওয়ার মত আকর্ষণীয় ললনাদের মাধ্যমে মুসলিম নেতা এবং কমান্ডারদেরকে রণাঙ্গনে অবতরণের যোগ্য রাখবে না।"

হযরত খালিদের চিন্তা-চেতনায় ইউহাওয়া আবার সওয়ার হয় এবং চার বছর পূর্বের কথা তাঁর কানে বাজতে থাকে। তিনি মদীনা পানে যতই অগ্রসর হন, উহুদের পাহাড় ততই মাথা উঁচু করে দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। অতঃপর এক সময় পাহাড়গুলো এক এক করে চোখের পাতা হতে হারিয়ে যেতে থাকে। তাঁর ঘোড়া গিরিপথ অতিক্রম করছিল। এটা এক মাইল লম্বা এবং ২২০ গজ বা তার চেয়ে একটু বেশী চওড়া একটি বিস্তৃত নিম্নাঞ্চল। গম্বুজাকৃতির অনেক টিলা এর শোভা বর্ধন করে। এগুলোর সবাই বালুমাটির। এক স্থানে এসে হযরত খালিদ কার যেন পদশব্দ শুনতে পান। তিনি চমকে পিছে ফিরে তাকান এবং হাত চলে যায় তলোয়ারের বাটে। কিন্তু এ আওয়াজ মানুষের পায়ের ছিল না। চার-পাঁচটি হরিণ ছিল, যারা নিচের দিকে দৌড়ে যায়। কিছুদূর গিয়ে একটি হরিণ আরেকটি

হরিণকে গুঁতো মারে। এতে একে অপরের মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে যায়। কিছুক্ষণ শিংয়ে-শিংয়ে দুই হরিণের লড়াই চলে। অন্যান্য হরিণ দাঁড়িয়ে তামাশা দেখতে থাকে।

॥ ত্রিশ ॥

এত সুন্দর প্রাণীর এভাবে লড়াই করাটা ভাল দেখা যায় না। হযরত খালিদ (রা.) তবুও দেখতে থাকেন। তাঁর ঘোড়াটি এক দর্শক হরিণের চোখে পড়ে যায়। সে সাথে সাথে গলা লম্বা এবং পা দ্বারা মাটিতে আঘাত করে। লড়াইরত হরিণদ্বয় যে যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায় থেমে যায়। মুহূর্তে পরিস্থিতি আঁচ করে সকল হরিণ এক দিকে দৌড়ে পালায় এবং হযরত খালিদের চোখের আড়ালে চলে যায়।

কুরাইশ নেতারা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি না হলেও পূর্বের ন্যায় একতা, আন্তরিকতা ও হৃদ্যতা ছিল না। সবাই তখনও বাহ্যিকভাবে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্ব ও কমান্ডিং মেনে চলছিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ফাটল ও অনাস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। যখন সীসাঢালা একতা প্রয়োজন তখন তারা কপট আচরণ শুরু করে। এ অবস্থা হযরত খালিদ (রা.)-কে অত্যন্ত বেদনাহত করে।

"নিজেদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হলে তা শত্রু পক্ষের শক্তি বৃদ্ধি করে নয় কি?" হযরত খালিদ একদিন আবু সুফিয়ানকে বলেন—"অনৈক্যকে ঐক্যে পরিণত করার উপায় নিয়ে কখনও ভেবেছেন কি?"

"অনেক ভেবেছি খালেদ!" দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবু সুফিয়ান বলে—"অনেক চিন্তা করেছি। পূর্বের মত সকলে এখনও আমার সাথে উঠা-বসা এবং কথাবার্তা বললেও অনেকের অন্তর আমার কাছে স্বচ্ছ মনে হয় না।...এমন কোন পন্থা উদ্ভাবন করতে পার যা অন্তরের ময়লা দূরীভূত করে দেয়?"

"হ্যাঁ, আমার মাথায় একটি পন্থা রয়েছে।" হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"নেতাদের অন্তরে ফাটল সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণ, তাদের ভুল ধারণা। তারা মনে করছে, আমরা এখন কাগুজে বীর। আমাদের অন্তর মুসলমানদের ভয়ে তটস্থ ও আচ্ছন্ন। বিশেষ করে শারযা ধোঁকা দিয়ে ছয়জন মুসলমানকে এনে এবং তাদের দু'জনকে আমাদের হাতে হত্যা করিয়ে আমাদের স্বকীয়তা ও ঐতিহ্যকেই যেন বদলে দিয়েছে। এর প্রতিবিধান আমার মতে এভাবে করা যেতে পারে যে, আমরা হয়ত মদীনা আক্রমণ করব নতুবা মুসলমানদেরকে কোন

রণাঙ্গনে আহ্বান করে আমরা প্রমাণ করব যে, আমরা কাপুরুষ নই, বাস্তবেই বীর। মুসলমানদের মূলোৎপাটন না করা পর্যন্ত আমাদের এ যুদ্ধসাজ অব্যাহত থাকবে।"

"আমাদের হাতে তার যুক্তিও রয়েছে।" আবু সুফিয়ান উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে-"উহুদ যুদ্ধ শেষে আমি মুহাম্মাদকে আহ্বান করে বলেছিলাম, বদরে পরাজয়ের প্রতিশোধ আমরা উহুদ উপত্যকায় নিয়েছি। আমি তাকে আরো বলেছিলাম, কুরাইশদের বুকে প্রতিশোধের আগুন জ্বলতেই থাকবে। সামনের বছরেই আমরা তোমাদেরকে বদর প্রান্তরে আহ্বান করব।"

"হ্যাঁ, স্মরণ আছে।" হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"উমর জবাবে বলেছিল, আমাদের আল্লাহ্ও চান যে, আমাদের এবং তোমাদের পরবর্তী সাক্ষাৎ বদরেই হোক।"

"ঘোষণা উমর করলেও কথাগুলো কিন্তু মুহাম্মাদেরই।" আবু সুফিয়ান বলে—"মুহাম্মাদ গুরুতর আহত ছিল। জোরে বলার শক্তি তার ছিল না। ... আমি এখনই মুহাম্মাদের কাছে এই মর্মে বার্তা পাঠাচ্ছি যে, অমুক দিন বদর প্রান্তরে এস; দেখবে যুদ্ধ কাকে বলে।"

অতঃপর উভয়ে পরামর্শক্রমে একটি দিনক্ষণ চূড়ান্ত করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, রাসূল (সা.)-কে এ ব্যাপারে অবহিত করতে কোন ইহুদীকে মদীনায় প্রেরণ করা হবে।

পরের দিনই আবু সুফিয়ান কুরাইশ সকল নেতৃবৃন্দকে তার বাসভবনে আহ্বান করে বড় উচ্ছ্বাস ও আনন্দের সাথে ঘোষণা করে যে, সে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য বদরে আহ্বান করছে। কুরাইশরা এমন খবর শুনার জন্য দীর্ঘ অপেক্ষায় ছিল। আত্মীয়-স্বজনের রক্তের প্রতিশোধ নেয়াই ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য। তাদের অন্তরে রাসূল (সা.)-এর শত্রুতা বারুদের মত উত্তপ্ত ছিল, যা একটি ভয়াবহ বিস্ফোরণের অপেক্ষায় ছিল। তাদের আক্রোশের মূল কারণ, মুহাম্মাদ বাপ-বেটা এবং ভাই-ভাইকে পরস্পরের শত্রুতে পরিণত করেছে।

আবু সুফিয়ানের এই কাঙ্ক্ষিত ঘোষণা সবাইকে এক প্লাটফর্মে এনে দাঁড় করায়। সব ধরনের মন-মালিন্যতা দূর করে দেয়। সকলে আন্তরিক হয়ে যুদ্ধ প্রস্তুতির আলোচনা করে। জনৈক বিচক্ষণ ইহুদীর হাতে বার্তা অর্পণ করে বলা হয়, সে যেন রাসূল (সা.)-কে বার্তা হস্তান্তর করে এবং দ্রুত ফিরতি জবাব নিয়ে আসে।

॥ একত্রিশ ॥

কুরাইশ নেতৃবৃন্দের অন্তর থেকে যেদিন পারস্পরিক অবিশ্বাস ও অনৈক্যের পর্দা অপসারিত হয় সেদিন হযরত খালিদ মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্নবোধ করেন। তিনি বাগাড়ম্বরী ছিলেন না, তবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নিজ হাতে রাসূল (সা.)-কে হত্যা করবেন।

ইহুদী দূত সংবাদ নিয়ে আসে। রাসূল (সা.) আবু সুফিয়ানের প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন। ৬২৬ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসের একটি দিন যুদ্ধের জন্য নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু আবহাওয়া বাঁধ সাধে। মৌসুমে সাধারণত যতটুকু বৃষ্টি হত এ বছর তার থেকে অনেক কম হয়। যার ফলে মৌসুমটি এক প্রকার ভীষণ খরাবৃষ্টির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। মার্চ মাসেই এত তীব্র গরম পড়ে, যা অন্য বছর আরো ২/৩ মাস পরে হয়। আবু সুফিয়ান তাই পূর্ব নির্ধারিত দিনে যুদ্ধ করা সমীচীন মনে করে না।

স্মৃতির এ অঙ্কটি তাকে লজ্জাবনত করে। কারণ, আবু সুফিয়ান গ্রীষ্ম মৌসুমের বাহানায় যুদ্ধ বিলম্ব করেছিল।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে সা'দ লেখেন, আবু সুফিয়ান কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে সমবেত করে বলে, সে সৈন্য পাঠানোর পূর্বে মুসলমানদের ভীত-সন্ত্রস্ত করতে চায়। সে এ লক্ষ্যে ইহুদীদের হাত করে এবং দ্বিগুণ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ব্যবসায়ীর ছদ্মাবরণে তাদের মদীনায় প্রেরণ করে। তাদের দায়িত্ব ছিল, মদীনায় গিয়ে এই গুজব রটিয়ে দেয়া যে, কুরাইশরা এত বৃহৎ লস্কর নিয়ে বদরে আসছে, যা মুসলমানরা ইতিপূর্বে কখনো দেখেনি।

এই ঐতিহাসিকের বর্ণনা মোতাবেক মদীনায় এই গুজবকে সত্য বলে বিশ্বাস করা হয় এবং মুসলমানদের চেহারায় এর গভীর প্রতিক্রিয়ার ছাপও লক্ষ্য করা যায়। রাসূল (সা.) পর্যন্ত এই গুজব পৌছলে এবং এর প্রেক্ষিতে সাহাবায়ে কেরামের ভীতির কথা জানানো হলে রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে সমবেত করে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন ঃ

"সংখ্যায় আধিক্যের কথা শুনে আল্লাহ্‌র সৈনিকরা এত ভীত কেন? আল্লাহ্‌র পূজারীরা কি আজ মূর্তি-পূজারীদের ভয়ে তটস্থ? যদি তোমরা কুরাইশদের ভয়ে এত ভীত হয়ে পড় যে, তাদের যুদ্ধ-আহ্বানে সাড়া দেয়ার হিম্মত হয় না, তাহলে যে সত্তা আমাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন তাঁর নামে শপথ করে বলছি, কেউ না গেলেও আমি একাই তাদের মোকাবেলায় বদরে যাব।"

রাসূল (সা.) একটু থেমে আরো কিছু বলতে চান; কিন্তু রাসূল-প্রেমিকরা আকাশ-বাতাশ মুখরিত করে আবেগ-উত্তেজনাকর শ্লোগান দিতে শুরু করে। জেগে ওঠে ঘুমন্ত মরু সিংহের দল। ছড়ানো গুজবের সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। রাসূল (সা.) এক ভাষণেই গুজবের প্রতিক্রিয়া দূর হয়ে যায় এবং মুসলমানরা সানন্দে যুদ্ধ-প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করে। হাতে সময় ছিল কম। সীমিত এ সময়ের মধ্যেই তারা যথাসম্ভব প্রস্তুতি নেয়। সৈন্যরা যখন বদর অভিমুখে রওনা হয় তখন তাদের সংখ্যা ছিল দেড় হাজার। অশ্বারোহী ছিল পঞ্চাশ জন।

গুজব ছড়ানোর দায়িত্ব দিয়ে যে সকল ইহুদীকে মদীনায় পাঠানো হয়, তারা ফিরে এসে রিপোর্ট দেয় যে, গুজব প্রথমে আশাতীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কিন্তু মুহাম্মাদ একদিন মুসলমানদের জমা করে কয়েকটি কথা বলতেই সকলে এক পায়ে বদরে যেতে প্রস্তুত হয়ে যায়। মদীনায় আমাদের অবস্থানকালেই তাদের সংখ্যা দেড় হাজারে উপনীত হয়েছিল। যতটুকু ধারণা এ সংখ্যা কম-বেশী হবে না।

আজ মদীনা যেতে যেতে সে ঘটনা মনে পড়ায় হযরত খালিদ (রা.) এ জন্য লজ্জাবনত হন যে, তিনি সেদিন অনুমান করেন যে, আবু সুফিয়ান যেনতেন অজুহাতে মুসলমানদের মোকাবেলা থেকে পিছে থাকতে চায়। হযরত খালিদ (রা.) মুসলমানদের সংখ্যা সম্পর্কে অবগত হয়ে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে আবু সুফিয়ানের কাছে আসেন।

"আবু সুফিয়ান!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"নেতার আনুগত্যের ব্যাপারে আমরা শ্রদ্ধাশীল। আমি কুরাইশদের মধ্যে নেতার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ধারা চালু করতে চাই না। কিন্তু তাই বলে কুরাইশ জাতির মান-মর্যাদা বিসর্জন দিতে পারি না। আপনি স্বীয় অবস্থান পরিবর্তনের চেষ্টা করুন। এমনটি যেমন না হয় যে, কুরাইশদের মান-মর্যাদার প্রশ্নটি আমার অন্তরে তীব্রভাবে উজ্জীবিত হবে, যার ফলে আপনার নির্দেশ এবং অবস্থান মেনে নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।"

"মদীনায় ইহুদীদের পাঠানোর কারণ তুমি জান না?" আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করে—"যুদ্ধের পূর্বে আমি মুসলমানদের আতঙ্কের মধ্যে ফেলতে চাই...।"

"আবু সুফিয়ান!" হযরত খালিদ (রা.) তার কথা শেষ না হতেই বলে উঠেন—"প্রকৃত যোদ্ধারা কখনও ভয় দেখায় না। স্বল্পসংখ্যক মুসলমানদের আপনি লড়তে দেখেন নি? কুরাইশদের শত বর্শাঘাতের মুখে খুবাইব ও যায়েদকে নারাধ্বনি দিতে শুনেন নি?... আমি শুধু এটাই বলতে এসেছি যে, আপন নেতৃত্বের মর্যাদা রক্ষা করুন এবং বদরে রওনা হওয়ার বাস্তব উদ্যোগ নিন।

॥ বত্রিশ ॥

পরের দিনই খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, মুসলমানরা যুদ্ধাস্ত্র ও রসদ-সামগ্রী নিয়ে মদীনা থেকে বদর অভিমুখে রওনা করেছে। সৈন্যদের যাত্রার নির্দেশ ছাড়া এরপর আবু সুফিয়ানের জন্য বিকল্প কোন পথ খোলা থাকে না। কুরাইশ সৈন্য সংখ্যা সর্বমোট দাঁড়ায় দুই হাজার পদাতিক আর একশ অশ্বারোহী। মূল নেতৃত্ব আবু সুফিয়ানের হাতেই ছিল। ইকরামা, সফওয়ান এবং হযরত খালিদ ছিলেন আবু সুফিয়ানের উপসেনাপতি। পূর্বের মত এবারও আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা, কতক বাঁদী এবং সঙ্গীত শিল্পীরা সৈন্যদের সাথে থাকে।

৬২৬ খৃস্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল, বুধবার। পূর্ব নির্ধারিত দিনক্ষণে মুসলিম বাহিনী রাসূল (সা.)-এর নেতৃত্বে বদর প্রাঙ্গণে পৌঁছে যান।

ওদিকে কুরাইশরা এ সময় আসফান নামক স্থানে এসে উপস্থিত হয়। তারা সেখানেই সারারাত অবস্থান করে। প্রত্যুষেই তাদের সামনে এগিয়ে যাবার কথা, কিন্তু পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে ভিন্নদিকে মোড় নেয়। সবাইকে অবাক করে দিয়ে আবু সুফিয়ান সকালে সৈন্যদের যাত্রা করার নির্দেশ দেয়ার পরিবর্তে এক স্থানে জমা করে বলেন ঃ

"কুরাইশ বাহাদুরগণ! মুসলমানরা তোমাদের নাম শুনতে আঁৎকে ওঠে। এটা হবে তাদের সাথে আমাদের চূড়ান্ত যুদ্ধ। মুষ্টিমেয় মুসলমানদের আমরা নিশ্চিহ্ন করে ছাড়ব। এরপরে পৃথিবীর বুকে কোন মুহাম্মাদ থাকবে না, রবে না তাঁকে স্মরণকারী কেউ। কিন্তু যে অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা যুদ্ধ করতে চলেছি, তা আমাদের অনুকূল নয়। আমরা সম্পূর্ণ প্রতিকূল অবস্থার শিকার, যা আমাদের পরাজয় ডেকে আনতে পারে। তোমরা জান, রসদ সামগ্রী আমরা পরিমিত আনতে পারিনি। সামনে রসদ পাবার সম্ভাবনাও নেই। স্মরণকালের ভয়াবহ খরা রীতিমত দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। তারপরে রোদ্রের প্রখরতা তো আছেই। আমি আমার বীর-বাহাদুর ভাইদেরকে ক্ষুধা-পিপাসায় তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে ছেড়ে দিতে পারি না; আমি চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য মোক্ষম সময়ের অপেক্ষা করব। আমি সামনে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিব না; বরং মক্কায় ফিরে চল।"

হযরত খালিদের মনে পড়ে, আবু সুফিয়ানের ভাষণের পর সৈন্যদের মধ্য হতে দু'ধরনের শ্লোগান ওঠে। একদল তাঁরই হৃদয়ের আওয়াজ প্রতিধ্বনি করছিল যে, আমরা এ অবস্থার মধ্য দিয়েই মুসলমানদের মোকাবেলা করব। অপর দলটি আবু সুফিয়ানের সিদ্ধান্তকেই স্বাগত জানায়। প্রত্যাবর্তনের এই নির্দেশ ছিল খোদ

নেতার। তাই সকলের জন্য তার আদেশই ছিল শিরোধার্য। কিন্তু হযরত খালিদ, ইকরামা এবং সফওয়ান আবু সুফিয়ানের এ নির্দেশ মানতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু আবু সুফিয়ানের বিরুদ্ধে তাদের এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণ মুখ থুবড়ে পড়ে। বিদ্রোহী তিন উপসেনাপতি সৈন্যদের উপর এক জরীপ চালিয়ে তাদের স্বপক্ষে কতজন আছে তা জানতে চেষ্টা করে। কিন্তু এ জরীপের ফলাফলও তাদের প্রতিকূলে যায়। অধিকাংশ সৈন্য আবু সুফিয়ানের নির্দেশে মক্কায় ফেরৎ যায়। ফলে বাধ্য হয়ে বিদ্রোহীদেরও সমমনা সৈন্যদের নিয়ে আবু সুফিয়ান বাহিনীর পিছু পিছু চলে আসতে হয়।

হযরত খালিদের স্পষ্ট মনে পড়ে, সেদিন এভাবে মক্কায় ফিরে আসার সময় তাঁর মস্তক ছিল অবনমিত। উপসেনাপতিদের কেউ একে অপরের দিকে তাকাবার অবস্থায় ছিল না। লজ্জা সকলকে গ্রাস করে নিয়েছিল। হযরত খালিদের বারবার মনে হচ্ছিল, যুদ্ধে তার একটি পা কাটা গেলে, হাত খোয়া গেলে, দুই চোখ নষ্ট হয়ে গেলে তেমন দুঃখ হত না, যেমনটি আজ বিনা যুদ্ধে প্রত্যাবর্তনের কারণে হচ্ছে। তিনি অনুভব করেন, তাঁর অস্তিত্ব বলতে এতদিন যা ছিল তা মরে গেছে। এখন ঘোড়ার পিঠে তাঁর মরদেহ মক্কায় ফিরে যাচ্ছে। রাসূল (সা.)-এর হত্যা ছিল তাঁর প্রধান টার্গেট; যা পূরণ করা ছাড়াই সে ফিরে চলছে। এই ব্যর্থতাই তাকে অনবরত দংশন করে চলছিল।

হযরত খালিদের অতীত ছিল স্মৃতির ডিকশোনারী। যার বর্ণনা শেষ হবার নয়। বনূ নযীর, বনূ কুরাইজা এবং বনূ কায়নুকা তিন ইহুদী গোত্রের কথা তাঁর মনে পড়ে। তারা কুরাইশদেরকে মুসলমানদের মোকাবেলা হতে সরে যেতে দেখে ভীষণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। ইহুদীরা ছিল মুসলমানদের অস্তিত্বের শত্রু। তারা মক্কা যায় এবং কুরাইশদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। কিন্তু আবু সুফিয়ান তাদের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয় না। হযরত খালিদ চিন্তা করে পান না যে, আবু সুফিয়ানের দুরভিসন্ধি কি? মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নাম শুনে তার এই ঘাবড়ানোর কারণ কি?

এ বছরেরই শীত মৌসুমের শুরুর দিকে খয়বারের কতক ইহুদী মক্কায় যায়। তাদের নেতার নাম হুয়াই বিন আখতাব। এ লোকটি ইহুদী গোত্র বনূ নযীরের দলপতিও ছিল। ইহুদীরা ছিল বিশাল স্বর্ণ-রৌপ্যের মালিক। এই ইহুদী টিম আবু সুফিয়ান ও অন্যান্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দের জন্য মূল্যবান উপহার নিয়ে যায়। সাথে সুন্দরী-রূপসী ললনার উপঢৌকনও ছিল।

ইহুদীরা মক্কায় প্রথমে আবু সুফিয়ানের সাথে সাক্ষাতে মিলিত হয়। তাকে মূল্যবান উপহার হস্তান্তর করে এবং রাতে নৃত্যশিল্পীদের দ্বারা মনোজ্ঞ নৃত্য পরিবেশন করেও দেখায়। এরপর হুয়াই বিন আখতাব হযরত খালিদ, ইকরামা ও সফওয়ানের উপস্থিতিতে আবু সুফিয়ানকে বলে, যদি তারা এখনই মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন না করে এবং তাদের ক্রমাগ্রসরমান যাত্রার গতিরোধ না করে, তবে য়ামামাকেও একদিন তারা পদানত করে ছাড়বে। আর তাদের পা একবার য়ামামার মাটি স্পর্শ করলে, তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাহরাইন ও ইরাকমুখী কুরাইশদের বাণিজ্য রুট চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে। বাণিজ্য এ রুটটি ছিল কুরাইশদের শাহরগ এবং অর্থনীতির প্রতীক।

"যদি আপনারা আমাদের সাথে থাকেন।" হুয়াইবিন আখতাব বলে— "তাহলে আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোপন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিতে পারি।"

"সংখ্যায় দ্বিগুণ হওয়া সত্ত্বেও আমরা মুসলমানদের পরাজিত করতে পারিনি।" আবু সুফিয়ান বলে—"তিনগুণ বেশী হলেও তাদের পরাজিত করা যাবে না। যদি আরো কিছু গোত্র আমাদের সাথে এসে মিলে তবেই আমরা মুসলমানদের চিরতরে শেষ করতে পারি।"

"আমরা এ ব্যবস্থা পূর্বেই করে রেখেছি।" হুয়াই বিন আখতাব বলে— "গাতফান এবং বনূ আসাদ গোত্র আপনাদের সাথে থাকবে। আমাদের প্রচেষ্টায় আরো কতিপয় গোত্র আপনাদের সঙ্গে এসে যাবে।"

হযরত খালিদের স্মৃতিতে কোন কিছুই অস্পষ্ট নয়। গত দিনের সবই তার চোখের পাতায় ভাসতে থাকে। আবু সুফিয়ানের আতংকিত চেহারা তাঁর মনে পড়ে। আবু সুফিয়ান স্পষ্ট জানতেন, কুরাইশদের এভাবে উত্তেজিত করার পেছনে ইহুদীদের বড় স্বার্থ হল, তারা ইসলামের উত্থানকে ইহুদীবাদের জন্য খোলা চ্যালেঞ্জ বলে আশঙ্কা করত। কিন্তু ধূর্ত ইহুদীরা এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে আবু সুফিয়ানের সামনে এমন চিত্র তুলে ধরে, যার মধ্যে মুসলমানদের হাতে কুরাইশদের ধ্বংস ছিল ভোরের দিবাকরের মত স্পষ্ট। এতদ্ব্যতীত আবু সুফিয়ানের উপর হযরত খালিদ, ইকরামা এবং সফওয়ানের ক্রমবর্ধমান চাপও ছিল উল্লেখযোগ্য।

"আমরা আপনাকে নেতা মানি, কিন্তু তার জন্য আপনাকে নিজের কাপুরুষতার স্বীকৃতি দিতে হবে।"

"মৌসুমের প্রতিকূলতা এবং দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও যদি মুসলমানরা লড়তে আসতে পারে, তবে আমরাও লড়তে পারতাম।"

"আপনি মিথ্যাচার করে আমাদের প্রতারিত করেছেন।"

আবু সুফিয়ান ভীরু ...। সে পুরো গোত্রকেই কাপুরুষে পরিণত করেছে ...। এখন মুহাম্মাদের চেলা-চামুণ্ডারা আমাদের মাথায় এসে লাফিয়ে পড়বে।"

এ জাতীয় তিরস্কার ও বিদ্রূপাত্মক বিভিন্ন উক্তি শহরের অলি-গলিতে প্রদক্ষিণ করে ফিরতে থাকে। এ আওয়াজ উঠার পশ্চাতে ইহুদীদের হাত ছিল। কিন্তু কুরাইশদের স্বকীয়তা এবং প্রতিশোধ স্পৃহা তাদেরকে স্থির হতে দেয় না। আবু সুফিয়ানের অবস্থা এত নাজুক হয়ে ওঠে যে, তিনি বাইরে বের হওয়াও বাদ দেন।

হযরত খালিদের ঐদিনের কথা মনে পড়ে যেদিন আবু সুফিয়ান তাঁকে তার বাসভবনে আহ্বান করে। আবু সুফিয়ানের প্রতি একদা যে শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধ তাঁর অন্তরে ছিল এ সময় তা ছিল না। আবু সুফিয়ান যেহেতু তখনও সর্বোচ্চ নেতার আসন অলঙ্কৃত করে ছিল তাই অনীহা সত্ত্বেও তিনি তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি সেখানে গিয়ে ইকরামা ও সফওয়ানকে বসা দেখতে পান।

"খালিদ!" আবু সুফিয়ান বলে—"আমি মদীনায় হামলার স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" হযরত খালিদের মনে হয়েছিল, তিনি যেন ভুল শুনছেন। বিস্মিত নেত্রে ইকরামা এবং সফওয়ানের পানে চান। তাদের উভয়ের ঠোঁটে ছিল মুচকি হাসির প্রচ্ছন্ন আভা।

"হ্যাঁ, খালিদ!" আবু সুফিয়ান বলে—"যত দ্রুত সম্ভব লোকদেরকে মদীনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত কর।"

॥ তেত্রিশ ॥

ইহুদীরা যে সমস্ত গোত্রকে কুরাইশদের সহযোগিতা করার জন্য রাজি করেছিল—সকল গোত্র বরাবর বার্তা প্রেরণ করা হয়।

৬২৭ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস। এ সময় বিভিন্ন গোত্রের যোদ্ধারা দলে দলে মক্কায় সমবেত হতে থাকে। গাতফান গোত্রের সৈন্য ছিল বেশী। প্রায় তিন হাজার। মুনিয়া ছিল তাদের কমান্ডার। বনূ সালেম ৭০০ সৈন্য প্রেরণ করে। বনূ আসাদও তুলাইহা বিন খুয়াইলাদের নেতৃত্বে এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সৈন্য পাঠায়। কুরাইশদের নিজস্ব সৈন্য ছিল ৪ হাজার পদাতিক বাহিনী; ৩ শত অশ্বারোহী এবং দেড় হাজার উষ্ট্রারোহী। সর্বশেষ যে বিশাল বাহিনী মদীনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয় তার সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ১০ হাজার। আবু সুফিয়ান ছিল এ সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান সেনাপতি। সে এ বাহিনীকে 'বহুজাতিক বাহিনী' নাম দেয়।

কয়েকটি গোত্র মক্কায় আসে না। তারা খবর পাঠায়, বহুজাতিক বাহিনী মদীনা অভিমুখে যাত্রা করলে তারা পথিমধ্যে মূল বাহিনীর সাথে এসে যোগ দিবে। বহুজাতিক বাহিনীর মদীনায় যাত্রা করার ঐতিহাসিক ক্ষণটির কথা হযরত খালিদের মনে পড়ে। এ বিশাল বাহিনীর একাংশের কমান্ডার ছিলেন তিনি। অপেক্ষাকৃত এক উঁচু স্থানে ঘোড়ার পিঠে বসে সৈন্যদের দিকে তাকান। বাহিনী এত বিশাল ছিল যে, শুরু এবং শেষ তার নজরে আসে না। দৃষ্টি যতদূর যায় সৈন্যদের এগিয়ে চলার দৃশ্যই শুধু দেখতে পান। বিভিন্ন বাদ্য-বাজনা, যুদ্ধ-সঙ্গীত এবং সৈন্যদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস হযরত খালিদের রক্তে শিহরণ তুলছিল। তিনি গর্দান সোজা করে মনে মনে বলেন, মুসলমানরা এবার নিশ্চয় পিষ্ট হয়ে মরবে। আর ইসলামের অণুকণা আরবের বালুর সাথে মিশে চিরদিনের জন্য অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। এটা ছিল তাঁর বদ্ধমূল বিশ্বাস।

৬২৭ খৃস্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী বহুজাতিক বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে গিয়ে পৌঁছে। উহুদের পূর্ববর্তী অবস্থান স্থলে গিয়ে কুরাইশরা এবারও তাঁবু স্থাপন করে। এটি ছিল বিপরীত দিক দিয়ে আসা দু'টি নদীর সংযোগস্থল, মিলন মোহনা। কুরাইশ ছাড়া অন্যান্য গোত্র উহুদের পূর্বপ্রান্তে শিবির স্থাপন করে।

মদীনাবাসী কুরাইশদের আগমন সম্বন্ধে অবগত কি-না তা পরীক্ষা করতে তারা দু'গুপ্তচরকে ব্যবসায়ীর ছদ্মাবরণে মদীনায় প্রেরণ করে। আবু সুফিয়ানসহ অন্যান্য উপসেনাপতিদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল মদীনাবাসীদের অগোচরেই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু পরের দিনই কুরাইশ কর্তৃক প্রেরিত এক ইহুদী গুপ্তচর মদীনা হতে ফিরে আবু সুফিয়ানকে জানায় যে, মুসলমানরা তাদের সকল কার্যক্রম সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

"মুসলমানদের মাঝে ভীতি এবং উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছিল।" ইহুদী গুপ্তচর বলে—"পুরো শহরে আতঙ্ক ছেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মুহাম্মাদ ও তাঁর একান্ত সহযোগিদের জ্বালাময়ী ভাষণে মুসলমানরা সীসাঢালা প্রাচীর হয়ে যায়। শহরের অলি-গলিতে নকীব জিহাদের আহ্বান করে ফিরছে। এতে সকলের মাঝে এক বিপুল সাড়া জেগেছে। সবাই যুদ্ধের জন্য সমবেত হচ্ছে। আমার ধারণামতে তাদের সংখ্যা তিন হাজারের বেশী হবে না।"

ঐতিহাসিকগণ লেখেন, বাস্তবেও মুসলমানদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। তারা পূর্বেই জানতে পেরেছিলেন যে, শত্রু বাহিনীর সংখ্যা দশ হাজার। অশ্বারোহী এবং উষ্ট্রারোহীর সংখ্যা প্রচুর। ইতিপূর্বে আরবভূমি এমন বিশাল বাহিনী একসাথে এত লোকের সমাবেশ আর কখনো দেখেনি।

সৈন্যসংখ্যা এবং সমরাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে লড়াই ছাড়াই মুসলমানদের আত্মসমর্পণ করা নতুবা রাতের আঁধারে মদীনা ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও আত্মগোপন করা উচিত ছিল। কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে, তিন হাজার মুসলমান দশ হাজার সৈন্যের মোকাবেলায় মুহূর্তের জন্য দাঁড়াতে পারবে। দশ হাজার মানুষ মদীনার এক একটি ইট পর্যন্ত খুলে নিবে অনায়াসে। কিন্তু এটা ছিল হক ও বাতিলের যুদ্ধ। সত্য-মিথ্যার সংঘাত। আল্লাহ্র পূজারী ও মূর্তি পূজারীদের সংঘর্ষ। সত্যের বিজয় নিশ্চিত করা ছিল অনিবার্য। ঐ মহান আহ্বানের মর্যাদা রক্ষাও ছিল অপরিহার্য, যা আল্লাহ্ পাক হেরা গুহায় এক আরব রত্নের মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে সম্প্রচার করেছিলেন এবং তাকে নবুওয়াতের মর্যাদায় ভূষিত করেছিলেন।

"যারা সত্য এবং সততার উপর থাকে আল্লাহ্ তাদের সাথে থাকেন।" মদীনার আনাচে-কানাচে নবী করীম (সা.)-এর এই বাণী গুঞ্জন তুলে ফিরছিল— "কিন্তু মনে রেখ, আল্লাহ্র সাহায্য ঐ সময় লাভ করবে, যখন অন্তর থেকে ভয়-ভীতি দূর করে পরস্পর হাত ধরে রণাঙ্গনে এগিয়ে যাবে এবং আল্লাহ্র রাহে জীবন উৎসর্গের দৃঢ় শপথ করবে। যারা খোদা হিসেবে একমাত্র আল্লাহকে বিশ্বাস করে না এবং ইসলাম ধর্মের সত্যতা স্বীকার করে না তারা আমাদের শত্রু। তাদের হত্যা করা ফরয। মনে রেখ, মার দিতে গেলে অনেক সময় মার খেতেও হয়। ঈমান থেকে বলীয়ান এমন কোন শক্তি নেই যা শত্রুর হাত হতে তোমাদের রক্ষা করতে পারে। মদীনা নয়, লালিত চেতনা ও ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস সংরক্ষণই এখন প্রধান কাজ। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে অগ্রসর হলে তখন ১০ হাজারের মোকাবেলা করেও বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হবে। হতবল এবং ভীতুদের অনুকূলে আল্লাহ্ পাক কখনো অলৌকিকতা প্রদর্শন করেন না। আকীদা হেফাজত এবং স্বীয় ভূখণ্ড রক্ষায় তোমাদেরই সর্বোচ্চ নৈপুণ্য ও বীরত্বের চমক দেখাতে হবে।"

এভাবে জ্বালাময়ী ভাষণের মাধ্যমে রাসূল (সা.) মদীনাবাসীদের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চার এবং তাদের হিম্মত এমন পর্বতসম করে দেন যে, তারা এর থেকেও বিশাল বাহিনীর মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। আগত বিশাল জনস্রোতের হাত থেকে মদীনাকে রক্ষায় রাসূল (সা.)-এর পেরেশানীর অন্ত ছিল না। আল্লাহ্ পাক সাহায্য করবেন নিশ্চিত। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের সাহায্যের পাশাপাশি বান্দাদেরও তো কিছু করা চাই। কিন্তু কি করা যেতে পারে? চিন্তার সাগরে ডুব দেন তিনি। কিন্তু না, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করা যায় এমন কোন পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসে না।

॥ চৌত্রিশ ॥

আল্লাহ্ পাক এক ব্যক্তির মাধ্যমে মুসলমানদের সাহায্যের ব্যবস্থা পূর্বেই করে রেখেছিলেন। লোকটি জীবনের শেষ দিকে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর নাম হযরত সালমান ফার্সী (রা.)। তিনি প্রথমে অগ্নিপূজারীদের ধর্মীয় গুরু ছিলেন। কিন্তু দিন-রাত সত্যের তালাশে ব্যাকুল থাকেন। তিনি আগুন পূজা করলেও আগুনের স্ফুলিঙ্গ এবং তার শিখায় ঐ রহস্য উদঘাটন করতে ব্যর্থ হন, যার জন্য তিনি বড়ই উদগ্রীব ও উতলা ছিলেন। পাণ্ডিত্য এবং বিচক্ষণতায় তার সাথে টেক্কা দেয়ার মত কেউ ছিল না। অগ্নিপূজকরা আগুনের মত তারও পূজা-অর্চনা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করত।

হযরত সালমান ফার্সী (রা.) যখন বার্ধক্যের কোঠাও অতিক্রম করে যান তখন তাঁর কানে আরব ভূখণ্ডের এক ব্যতিক্রমধর্মী আহ্বান পৌছে—"আল্লাহ্ এক। মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্র রাসূল।" স্বদেশে অবস্থানকালে এ আহ্বান তাঁর কানে পৌছে না; বরং জ্ঞানের অন্বেষণে তিনি জীবনভর বিভিন্ন দেশ সফর করে ফেরেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি এ সময় একটি বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে সিরিয়া আসেন। এখানে ব্যবসার উদ্দেশে কুরাইশ ও মুসলমান বণিকদের আনাগোনা হত। কুরাইশ বণিকরাই সর্বপ্রথম উপহাস ও ঠাট্টাচ্ছলে তাঁর কানে এ খবর পৌছায় যে, তাদের গোত্রের এক ব্যক্তির মতিভ্রম ঘটেছে। সে নিজেকে নবী বলে দাবী করে।

দু'এক মুসলমান ধর্মীয়-বিশ্বাসের টানে হযরত সালমান ফার্সী (রা.)-কে নবী করীম (সা.)-এর ধর্মমত ও তার তাৎপর্য-মর্মবাণী সম্পর্কে অবগত করেন। তিনি মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শুনেন এবং চমকে ওঠেন। যে সত্যের অন্বেষায় তিনি স্বদেশ ছাড়া, যার খোঁজে সারা জীবন বিলীন করে দিয়েছেন, যে নূরের ঝলক দেখতে তিনি উদগ্রীব ছিলেন তার আভা যেন তিনি তাদের কথার মাঝে দেখতে পান। যে আবে-হায়াতের সন্ধানে তিনি দেশ-দেশান্তর পাড়ি দিয়ে ফিরছেন, তার ঠিকানা যেন তিনি সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাঝে আবিষ্কার করেন। সত্যের পিপাসা আরো বেড়ে যায়। তিনি আগ্রহভরে মুসলমান বণিকদের কাছে আরো কিছু জিজ্ঞাসা করেন। তারা তাদের জানা কথা তাঁকে জানিয়ে দেন। কিন্তু এতে তাঁর মন ভরে না। তিনি আরো বিস্তারিতভাবে জানতে চান। আলোর ছায়া অবলম্বনে তিনি আলোর দুয়ারে পৌছতে চান। সামান্য আলোচনা থেকেই তাঁর সত্যসন্ধানী হৃদয় এতই প্রভাবিত হয় যে, তিনি নবী করীম (সা.)-এর দরবারে পৌছার স্থির সিদ্ধান্ত নেন। দিন, রাত, মাস, বছর পেরিয়ে সময় নিজ গতিতে

চলতে থাকে। বহু ত্যাগ, সীমাহীন কুরবানী দিতে হয়। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত আর চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে আরব ভূমিতে পা রাখেন বর্ষীয়ান পারস্য বংশোদ্ভূত হযরত সালমান ফার্সী (রা.)। মহা জ্ঞানতাপস, সত্যানুরাগী এ ব্যক্তিত্ব দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এক সময় রাসূল (সা.)-এর মুবারক দরবারে গিয়ে উপস্থিত হন। প্রথম দর্শনেই তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন। হৃদয় স্পর্শী ভাষায় সত্যনিষ্ঠ আলোচনা এবং অমায়িক ব্যবহারের মাঝে তিনি ঐ সত্যের দিশা পেয়ে যান, যা তিনি সারা জীবন হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরছিলেন। রাসূল (সা.)-এর সত্তার মাঝে তিনি অমৃতের সন্ধান পান। সত্যপিপাসী সত্যের সন্ধান পেয়ে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করেন না। সত্যের বাহুবন্ধনে নিজেকে সঁপে দেন। এক বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাসূল (সা.)-এর মুবারক হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সময় হযরত সালমান ফার্সী (রা.) ছিলেন বার্ধক্যের সর্বশেষ সোপান অতিক্রমকারী তৎকালীন বিশ্বের সর্বাধিক বর্ষীয়ান ব্যক্তিত্ব।

স্বদেশে হযরত সালমান ফার্সী (রা.) কেবল ধর্মীয় গুরুই ছিলেন না, সমর বিদ্যাতেও ছিলেন অদ্বিতীয়। তখনকার যুগে ধর্মগুরুও যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং শক্তি পরীক্ষায় পারদর্শী হতেন। এক একজন বিজ্ঞ আলেমও সৈনিক হতেন। তবে আল্লাহ্ পাক হযরত সালমান ফার্সী (রা.)-কে অপূর্ব রণকুশলী প্রতিভা দান করেছিলেন। কঠিন মুহূর্তে অভূতপূর্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন করে প্রতিপক্ষকে হতবুদ্ধি ও অসহায় করতে তাঁর জুড়ি ছিল না। স্বদেশে কোন যুদ্ধ বাঁধলে কিংবা বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রমণের শিকার হলে তৎক্ষণাৎ বাদশা হযরত সালমান ফার্সী (রা.)-কে ডেকে নিতেন। সামগ্রিক পরিস্থিতি তাঁকে অবহিত করে জরুরী পরামর্শ চাইতো। প্রখ্যাত নামকরা সেনাপতিরাও তাঁর শিষ্য ছিল।

হযরত সালমান ফার্সী (রা.) স্বদেশে নন, মদীনায়। এখন তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী। রাসূল (সা.) তাঁর অপূর্ব সমর-কুশলতা সম্পর্কে জানতে পেরে পুরো পরিস্থিতি তাঁর সামনে তুলে ধরেন।

"শহর পরিবেষ্টনকারী পরিখা খনন করলে ভাল হয়।" গভীর চিন্তা-ভাবনা শেষে মন্তব্য করতে গিয়ে হযরত সালমান ফার্সী (রা.) বলেন।

রাসূল (সা.)সহ উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম এবং সেনাপতিগণ পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। হযরত সালমান ফার্সী (রা.)-এর কথা কেউ বুঝে উঠতে পারেন না। কারণ, আরবের লোকেরা পরিখা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না। এ নামটিও ছিল অপরিচিত। পারস্যের বিভিন্নাঞ্চলে পরিখা খননের প্রচলন ছিল। পরিখার কথা শুনে সবাইকে অবাক হতে দেখে হযরত সালমান ফার্সী (রা.)

পরিখার বিস্তারিত বিবরণ ও উপকারিতা বৈঠকে তুলে ধরেন। রাসূল (সা.)-এর মত ঐতিহাসিক রণকুশলী সেনাপতি সহজেই পরিখার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামগণ পড়েন দোটানায়। বিস্তৃত এ শহরের চারপাশ দিয়ে বেশ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থবিশিষ্ট গভীর পরিখা খনন তাদের পক্ষে অসম্ভব মনে হয়। কিন্তু রাসূল (সা.) পরিখা খননেরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলে তাদের আপত্তির কোন অবকাশ থাকে না। পরিখার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং গভীরতার পরিমাপ করা হয়। খননকারীদের সংখ্যাও হিসাব করা হয়। খননযোগ্য স্থান এবং খননকারীদের সংখ্যাকে সামনে নিয়ে হিসেব করে কতজন কতটুকু স্থান খনন করবে তা ভাগ করে দেয়া হয়। এ বণ্টন হিসেবে প্রতি ১১০ জনের ভাগে ৪০ হাত খননের ভার পড়ে। রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরামের আচার-উচ্চারণ থেকে অনুমান করেন যে, পরিখা কি এবং কেন—তা তাদের এখনও বুঝে আসেনি এবং পরিখা খনন করতে তারা কেমন যেন কাচুমাচু করছে। তিনি কোন কথা বলেন না। কোদাল নিয়ে খনন করতে শুরু করেন।

এ দৃশ্য দেখে সাহাবায়ে কেরামের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যায়। তারা কোদাল-বেলচা নিয়ে নারাধ্বনি দিয়ে জমিনের বুক চিরতে শুরু করেন। এ সময় কবি হাসসান বিন সাবেত (রা.)-এর আগমন ঘটে। নাতের জগতের তিনি ছিলেন তুলনাহীন নক্ষত্র। রাসূল (সা.) তাকে কাছাকাছিই রাখতেন। পরিখা খননকালে হযরত হাসসান (রা.) এমন আকর্ষণীয় কণ্ঠে গজল পরিবেশন করতে শুরু করেন যে, খননকারীদের মাঝে গভীর অনুরাগ ও জোশের সৃষ্টি হয়। পরিখার দৈর্ঘ্য কয়েক গজ ছিল না; বরং কয়েক মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শাইখাইন পর্বত থেকে বনী উবাইদ পর্বত পর্যন্ত খনন টার্গেট ছিল। মাটি কোথাও নরম এবং কোথাও পাথুরে ছিল। শত্রু নিকটবর্তী থাকায় এ খনন প্রকল্প দ্রুত সম্পন্ন করা আবশ্যক হয়ে পড়েছিল।

কুরাইশ বাহিনী এই অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অবস্থায় উহুদ পর্বতের অপর প্রান্তে ক্যাম্প স্থাপন করে অবস্থান করছিল।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

"এর পশ্চাতে অবশ্যই ইহুদীদের হাত ছিল।" চলতে চলতে হযরত খালিদের মন বলে ওঠে—"কুরাইশরা তো এক প্রকার হালই ছেড়ে দিয়েছিল। তাদের অন্তরে মুসলমান জুজু ভর করেছিল।"

ঘোড়া আপন মনে চলছিল। মদীনা এখনও ঢের দূর। হঠাৎ হযরত খালিদের দেহে লজ্জার শিহরণ বয়ে যায়। কুরাইশদের কাপুরুষোচিত যুদ্ধ-নীতি তাকে

ভীষণ লজ্জিত করেছিল। তিনি সহজে মেনে নিতে পারেন না যে, ইহুদীদের জোর প্রয়াসের পর কুরাইশ অধিপতি ও সেনাপতি আবু সুফিয়ান মদীনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। অবশ্য লড়াইয়ের সংবাদে তিনি খুব প্রসন্ন হন। ইহুদীদের প্রচেষ্টার ফলে আরবের মাটিতে এটাই সর্বপ্রথম বৃহৎ সৈন্য-সমাবেশ হলেও হযরত খালিদ সৈন্য-সমাবেশের পয়েন্টে বড্ড খুশী ছিলেন।

এ কথা ভেবে তিনি মনে মনে বড়ই আপ্লুত হন যে, বিশাল এ সেনাবাহিনী দেখেই মুসলমানরা মদীনা ছেড়ে পালিয়ে যাবে। আর যদিও বা সাহস করে যুদ্ধে নামে, তবে খুব অল্প সময়েই তাদের শোচনীয় পরাজয় ঘটবে। উহুদের অপর প্রান্তে সৈন্যরা ক্যাম্পে অবস্থানকালে তিনি অত্যন্ত প্রফুল্ল ছিলেন। যে প্রভাতে হামলার কথা ছিল তার পূর্বরাতে তাঁর মধ্যে এমন উত্তেজনা সৃষ্টি হয় যে, তিনি ঠিকমত নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না। চতুর্দিকে মুসলমানদের ছড়িয়ে থাকা লাশ আর লাশ তিনি কল্পনার চোখে দেখতে থাকেন।

পরদিন প্রভাতে বহুজাতিক বাহিনীর ১০ হাজার সৈন্য মদীনা আক্রমণের উদ্দেশে উহুদকে পিছে ফেলে মদীনা পানে এগিয়ে চলে সারিবদ্ধভাবে। বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে পৌঁছে আচমকা থেমে যায়। গভীর পরিখা তাদের পথরোধ করে দাঁড়ায়। সেনাপতি আবু সুফিয়ান সৈন্যদের মাঝভাগে ছিল। হঠাৎ সৈন্যদের থেমে যেতে দেখে সে ঘোড়া ছুটিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছে।

"বীর-বাহাদুর বাহিনী! থেমে গেলে কেন?" আবু সুফিয়ান উচ্চৈঃস্বরে বলতে বলতে আসে—"তুফানের মত এগিয়ে যাও এবং মুহাম্মাদের অনুসারী মুসলমানদেরকে পদতলে পিষ্ট কর। ... শহরের এক একটি ইট খুলে ফেল।"

আবু সুফিয়ান জ্বালাময়ী এ উচ্চারণ করতে করতে সামনে অগ্রসর হলেও কিছুদূর গিয়ে সে নিজেই ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে এবং সৈন্যদের ঘোড়ার ন্যায় তার ঘোড়াও থেমে যায়। সামনের গভীর পরিখা তাকে চ্যালেঞ্জ করে বসে। সে থমকে যায়। নীরবতা যেন তাকে ঘিরে ধরে।

"আল্লাহ্র কসম! এমন গর্ত এখানে আমি কখনো দেখিনি।" আবু সুফিয়ান ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে বলে—"আরবের যোদ্ধারা বিস্তৃত ময়দানে লড়াই করে আসছে।... খালিদ বিন ওলীদকে ডাক। ... ইকরামা এবং সফওয়ানকেও তলব কর।"

আবু সুফিয়ান পরিখার পাশ দিয়ে ঘোড়া নিয়ে চক্কর দিতে থাকে। কিন্তু সৈন্য পরিখা অতিক্রম করতে পারে এমন কোন স্থান তার নজরে পড়ে না। শাইখাইন নামক উঁচু পাহাড় থেকে নিয়ে বনূ উবাইদ এর উপর দিয়ে পশ্চাৎভাগ পর্যন্ত পরিখা খনন করা ছিল। মদীনার পূর্ব দিক শাইখাইন ও অন্যান্য পাহাড় কুদরতীভাবে মদীনা শহর হেফাজত করে রাখে।

॥ ছত্রিশ ॥

আবু সুফিয়ান বহু দূর পর্যন্ত পরিখার অবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। পরিখার ওপাশে সতর্ক প্রহরীর ন্যায় মুসলমানদের টহল দিতে দেখা যায়। সে কিছুক্ষণ পায়চারি করে ঘোড়া ঘুরিয়ে সৈন্যদের মাঝে ফিরে আসে। উল্টো দিক থেকে তিনটি ঘোড়া দৌড়ে এসে তার পাশে দাঁড়ায়। হযরত খালিদ, ইকরামা ও সফওয়ান ছিল ঘোড়াগুলোর আরোহী।

"দেখেছ, মুসলমানরা কত ভীতু?" আবু সুফিয়ান তিন উপসেনাপতিকে লক্ষ্য করে বলে—"পথিমধ্যে গতিরোধ করে কিংবা রাস্তায় গর্ত খনন করে শত্রুদের সাথে কখনো লড়েছ?"

সেদিন আবু সুফিয়ানের কথা শুনে হযরত খালিদ নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। আজ মদীনায় গমনকালে তাঁর মনে পড়ে যে, সেদিন তাঁর চুপ থাকার কারণ এই ছিল না যে, আবু সুফিয়ান মুসলমানদেরকে যে 'ভীতু' বলেছিল—তা ঠিক ছিল; বরং তিনি নীরবতা অবলম্বন করে এই ভাবনায় ডুব দিয়েছিলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিখা খনন কার্য কোন ভীতুর পরিচয় ছিল না; বরং বিচক্ষণতারই প্রমাণ ছিল। শহর প্রতিরক্ষার উপায় হিসেবে এ পরিকল্পনা যার, তিনি কোন সাধারণ মেধার অধিকারী নন। ইতিপূর্বেও তিনি আভাস পেয়েছিলেন যে, মুসলমানরা লড়াইয়ের ক্ষেত্রে কেবল দৈহিক শক্তির উপর নির্ভর করে না; মেধা এবং বিচক্ষণতাকেও কাজে লাগায়। হযরত খালিদের দেমাগও এ ধরনের যুদ্ধ-কৌশল প্রসব করত। মুসলমানরা সংখ্যায় স্বল্প হওয়া সত্ত্বেও বদর রণাঙ্গনে বিশাল কুরাইশ বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিল। হযরত খালিদ পরবর্তীতে নিভৃতে বসে এ পরাজয়ের হেতু বের করতে চেষ্টা করেন। পুরো রণাঙ্গন ও যুদ্ধের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন। তার সর্বশেষ রিপোর্টে মুসলমানদের বিজয়ের কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল প্রতিটি মুসলিম যোদ্ধার অপূর্ব বিচক্ষণতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

উহুদের যুদ্ধেও মুসলমানদের পরাজয় নিশ্চিত ছিল। কিন্তু তারপরেও মুসলমানদের বিস্ময়কর মেধা ও বিচক্ষণতার দরুন পরিশেষে জয়-পরাজয় ছাড়াই যুদ্ধ সমাপ্ত হয়।

"অন্য ব্যাপারও ছিল খালিদ!" তাঁর অন্তরে একথা উদিত হয়—"এ জয়ের পশ্চাতে অন্য কিছুরও দখল ছিল।"

"কিছু থাকলেও।" হযরত খালিদ (রা.) নিজেই জবাবে বলেন—"যাই কিছু থাকুক না কেন, এটা আমি মানতে পারব না যে, মুহাম্মাদের জাদু বলেই এমনটি

সম্ভব হয়েছে কিংবা তাঁর হাতে কোন জাদু আছে। আমাদের জ্ঞান-বিবেক যে কাজ ও বিষয়কে কভার করতে পারে না তাকে জাদু বলে চালিয়ে দেয়া আমাদের জাতীয় অভ্যাস। কুরাইশদের মাঝে এমন বিচক্ষণ একজনও নেই, যে মুসলমানদের মত জযবা ও দৃঢ়তা নিয়ে কুরাইশদেরকে মাতিয়ে দিবে এবং এমন যুদ্ধ পরিকল্পনা উদ্ভাবন করবে, যা মুসলমানদের চূড়ান্ত বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিবে।"

"খোদার কসম! মুসলমানরা আমাদের পথে পরিখা খনন করায় আমরা ফিরে যাব না।" আবু সুফিয়ান উপসেনাপতি হযরত খালিদ, ইকরামা ও সফওয়ানকে বলে। একটু পর সে আবার তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে—"পরিখা অতিক্রমের কোন পরিকল্পনা করা যায় কি?"

হযরত খালিদ (রা.) পরিকল্পনা উদ্ভাবনে গভীর চিন্তায় ডুবে যান। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে এ সন্দেহও সৃষ্টি হয় যে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সৈন্যরা পরিখা অতিক্রম করতে সক্ষম হলেও মুসলমানদের পরাজিত করা সহজ হবে না। চাই তাদের সংখ্যা যতই কম হোক না কেন। যারা অল্প সময়ে কংকরময় জমীনের বুক চিরে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করতে পারে, অনেক কষ্টের পরেই কেবল কোন বিশাল বাহিনী তাদের পরাজিত করতে পারে।

"ওলীদের বেটা! কি চিন্তা করছ?" আবু সুফিয়ান হযরত খালিদকে নিরুত্তর গভীর চিন্তামগ্ন দেখে জিজ্ঞাস করে—"আমাদের চিন্তা করারও সময় নেই। আমাদের দেরী দেখে মুসলমানরা এমনটি মনে করার সুযোগ যেন না পায় যে, আমরা তাদের কৌশল দেখে স্তম্ভিত। পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারণে আমরা দারুণ পেরেশান-দিশেহারা।

"পরিখা পুরোটাই পরখ করা দরকার।" ইকরামা মন্তব্য করে।

"এমন কোন স্থান অবশ্যই আবিষ্কৃত হবে, যেখান দিয়ে আমরা পরিখা অতিক্রম করতে পারব।" সফওয়ান বলে।

"অবরোধ।" হযরত খালিদ (রা.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে উচ্চারণ করেন—"মুসলমানরা পরিখা খনন করে অভ্যন্তরে অবস্থান করছে। আমরাও অবরোধ করে বহির্ভাগে অবস্থান করব। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে একদিন অবশ্যই তাদের পরিখার এপার আসতে হবে।

"ঠিক।" আবু সুফিয়ান সমর্থনের ভঙ্গিতে বলে—"এ ছাড়া অন্য কোন পন্থা দেখি না, যা পরিখা অতিক্রম করে এ পারে এসে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করবে।"

আবু সুফিয়ান তিন উপসেনাপতিদেরকে নিয়ে পরিখার পাশ দিয়ে পুরো পরিখা পর্যবেক্ষণ করতে বনূ উবাইদ পাহাড়ের দিকে রওনা হয়। মদীনা ও বনূ উবাইদ পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থলে 'সালা' নামক একটি পাহাড় ছিল। যুদ্ধকালীন সময়ে এখানেই ছিল মুসলমানদের হেড কোয়ার্টার। মুসলমানদের সৈন্য-স্বল্পতা দেখে আবু সুফিয়ানের ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি খেলে যায়। সে এখান থেকে একটু অগ্রসর হলে দ্রুত ধাবমান একটি ঘোড়া তার নিকটে এসে ব্রেক করে। অশ্বারোহী আবু সুফিয়ানের খুব পরিচিত। লোকটি একজন ইহুদী। বণিকবেশে সে মদীনায় গিয়েছিল। পাহাড়ের দীর্ঘ সারি অতিক্রম করে করে সে মদীনা হতে পরিখার এ পারে এসে কুরাইশ সৈন্যদের মাঝে পৌঁছে।

"ওপার থেকে এমন কোন সংবাদ নিয়ে এসেছ, যা আমাদের কাজে আসতে পারে?" আবু সুফিয়ান ইহুদীকে জিজ্ঞাসা করে এবং বলে—"আমাদের সাথে হাঁটতে থাক এবং সংবাদ একটু জোরে বল, যাতে আমার এই তিন কমান্ডারও শুনতে পারে।"

"শহর রক্ষা ও আবাসিক এলাকা হেফাজতের জন্য মুসলমানদের গৃহীত পদক্ষেপ হল" ইহুদী বলতে থাকে—"আপনাদের সকলেরই জানা আছে যে, মদীনা ছোট কেল্লাবিশিষ্ট এবং পরস্পর লাগোয়া কতক পল্লী ও আবাসিক এলাকার নাম। শহরের মহিলা, শিশু ও দুর্বল শ্রেণীদেরকে মুসলমানরা সর্বপশ্চাৎ কেল্লায় প্রেরণ করেছে। পরিখার উপর সতর্ক নজর রাখতে একটি সার্বক্ষণিক টিম গঠন করা হয়েছে। এ টিমের সদস্য ২০০ থেকে ২৫০ এর মত হবে। তাদের প্রত্যেকেই তলোয়ার, নিক্ষেপযোগ্য বর্শা এবং তীর-ধনুক অস্ত্রে সজ্জিত। পরিখাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রহরীর টিমটি দিনভর এবং সারা রাত পুরো পরিখা টহল দিয়ে ফিরছে। যেখান দিয়েই আপনারা পরিখা অতিক্রম করতে চান না কেন, মুহূর্তেই সেখানে পর্যাপ্ত সংখ্যক মুসলমান পৌঁছে যাবে এবং ঝাঁকে ঝাঁকে এত তীর তারা বর্ষণ করবে যে, পিছু হঁটা ছাড়া তখন আপনাদের আর করার কিছুই থাকবে না। শুধু তাই নয়, এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, রাতের আঁধারে মুসলমানরা পরিখার এ পার এসে গেরিলা আক্রমণ করে আবার ফিরে যাবে।"

"তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই কি করছে?" আবু সুফিয়ান উৎকণ্ঠার সাথে জানতে চায়।

"হে কুরাইশপতি!" ইহুদী গুপ্তচর বলে—"জীবনের অনেক বছর গত হলেও মানুষ চেনার যোগ্যতা এখনও আপনার হয়নি। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই একজন

মুনাফিক। মুসলমানদের কাছে সে 'মুনাফিক সর্দার' নামে পরিচিত। আমরাও তাকে ইহুদীদের একজন গাদ্দার বলেই মনে করি। সে মুসলমান হয়ে আমাদের সাথে গাদ্দারী করেছিল। মুসলমান হয়ে আপনাদের স্বার্থে সে তাদের সাথে প্রতারণা করেছে। উহুদে আপনারা বিজয় অর্জন করলে সে নিজেকে আপনাদেরই একজন বলে প্রচার করত। কিন্তু মুসলমানদের পাল্লা ভারী দেখে সে আপনাদের এবং ইহুদীদের থেকেও দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়। যার কোন ধর্ম নেই এবং যে বিশ্বস্ত নয় তার প্রতি ভরসা রাখা আদৌ ঠিক নয়।"

"আর হুয়াই ইবনে আখতাব কোথায়?" আবু সুফিয়ান জানতে চায়।

"সে যথাসম্ভব চেষ্টারত।" ইহুদী গুপ্তচর জবাবে বলে—"মদীনায় আমার আরো সাথী রয়েছে। তারা যতদূর সম্ভব মুসলমানদের ক্ষতি করতে থাকবে।"

মদীনায় গমনকালে এ কথা ভেবে হযরত খালিদের নিজের কাছে নিজেকে খুব হাল্কা মনে হয় যে, মক্কা থেকে রওনা হওয়ার পর দশ হাজার বিশাল বাহিনীর চলার দৃশ্য দেখে তার গর্দান উঁচু এবং গর্বে বুক কয়েক ইঞ্চি বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু মদীনার উপকণ্ঠে এসে সেই একই বাহিনীকে বালুর টিলার মত নিষ্প্রাণ ও জড় পদার্থ বলে মনে হয়। অবরোধের চিত্রও তাঁর মনে পড়ে। সৈন্যদের যে অংশটি তার নেতৃত্বাধীন ছিল, তাদেরকে তিনি অতীব নৈপুণ্যতার সাথে অবরোধ কার্যে বিন্যস্ত করে রেখেছিলেন।

অবরোধ দীর্ঘ বাইশ দিন অব্যাহত থাকে। দশদিন যেতে না যেতেই মদীনার মুসলমানরা খাদ্য-সংকট অনুভব করতে থাকে। কিন্তু এতে কুরাইশরা তেমন লাভবান হয় না। কারণ, তাদের রসদ-সামগ্রীও পরিমাণে কম ছিল। তারা মোটেও ভাবেনি যে, মুসলমানদের অবরোধে তাদেরকে এক দীর্ঘ সময় অবস্থান করতে হবে। খাদ্য-সংকট যেমনিভাবে মদীনার মুসলমানরা অনুভব করে তার থেকে কোন অংশেই কুরাইশদের খাদ্য-সংকট কম ছিল না। তীব্র খাদ্য-সংকটে সৈন্যদের মাঝে অস্থিরতা ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে থাকে।

ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম লেখেন, মদীনায় যখন খাদ্যের বিপুল মজুদ ছিল না এবং জনতাকে প্রত্যহ প্রয়োজনের অর্ধেক আহার দেয়া হচ্ছিল, ঠিক সেই স্পর্শকাতর মুহূর্তে মুনাফিক ও ইহুদীরা অলক্ষ্য হতে চক্রান্তে মেতে ওঠে। সর্বপ্রথম এ কথা কে উঠায় তার খোঁজ পাওয়া না গেলেও শহরের সর্বত্র গুঞ্জরিত হতে থাকে যে, "মুহাম্মাদ আমাদের মর্মান্তিক মৃত্যুর আয়োজন সম্পন্ন করেছে। কেননা, সে মুখে এ কথা বললেও যে, 'অচিরেই কায়সার ও কিসরার রাজভাণ্ডার আমাদের করতলগত হবে'; এখনও পর্যন্ত তার নবুওয়াতের স্বপক্ষে এ প্রমাণটুকু

দেখাতে পারেনি যে, খাদ্য-সংকটের এ মুহূর্তে আমাদের জন্য আসমান থেকে আহার সামগ্রী আসবে।"

মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলেও তারা তো রক্ত-মাংসেরই গড়া ছিল। পেটপূর্তির প্রশ্নটি ছিল তাদের দুর্বল পয়েন্ট। এ পয়েন্টে এসে তাদের মাঝে শহরের ঐ গুঞ্জনটি প্রভাব ফেলে। অনেকের চেহারায় হতাশা ও উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে ওঠে। এমতাবস্থায় আরেকটি আহ্বান তাদেরকে পেটের ভূতের হাত থেকে মুক্ত করে।

"তোমরা কি আল্লাহ্‌র সামনে এ কথা বলতে চাও যে, আমরা আল্লাহ্ পূজার তুলনায় অধিক পেটপূজারী ছিলাম।" এটা ছিল এক বজ্রধ্বনি, যা শহরের অলি-গলিতে বিরাট প্রতিধ্বনি তোলে—"আজ আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র তারাই বিবেচিত হবে, যারা আল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে ক্ষুধা-তৃষ্ণার্ত অবস্থায় জীবনবাজি রাখবে।... আল্লাহ্‌র কসম! এর থেকে বড় কাপুরুষতা এবং বেইজ্জতি মদীনাবাসীদের জন্য আর কি হতে পারে যে, আমরা মক্কাবাসীদের পদতলে গিয়ে লুটিয়ে পড়ব এবং দু'হাত জোড় করে বলব, আমরা তোমাদের দাস, আমাদেরকে কিছু খেতে দাও।"

রাসূল (সা.) শহর প্রতিরক্ষায় এমন ব্যতিব্যস্ত ছিলেন যে, তাঁর দিনরাত সব এক হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র প্রিয়নবী ছিলেন। তিনি চাইলে মোজেযাস্বরূপ কিছু দেখাতে পারতেন। কিন্তু তাঁর এই সতর্ক অনুভূতি ছিল যে, আমি নবী হলেও প্রত্যেক মানুষ তো আর নবী নয় এবং কেয়ামত পর্যন্ত আর কোন নতুন নবীর আবির্ভাব হবে না, তাই মানুষের সামনে এমন দৃষ্টান্ত রেখে যাওয়া চাই যে, মানুষ তার আল্লাহ্ প্রদত্ত নশ্বর দেহ এবং আত্মিক শক্তি দৃঢ়তার সাথে পূর্ণ কাজে লাগালে মোজেযার ন্যায় চমক দেখাতে পারে। অবরোধের যুগে রাসূল (সা.)-এর কর্মতৎপরতা এবং তাঁর অবস্থা একজন সেনাপতির পাশাপাশি একজন সৈনিকের মতও ছিল। রাসূল (সা.)-এর এহেন অবস্থা এবং তৎপরতা দেখে মুসলমানরা তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা সম্পূর্ণ ভুলে যায়। তাদের মধ্যে এমন জোঁশ ও প্রেরণা সৃষ্টি হয় যে, অনেকে আবেগতাড়িত হয়ে পরিখার কাছাকাছি পর্যন্ত চলে আসত এবং কুরাইশদেরকে কাপুরুষ বলে তিরস্কার করত।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

৬২৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ। আবু সুফিয়ান বিষণ্নচিত্তে হুয়াই বিন আখতাবকে ডেকে আনার নির্দেশ দেয়। তার বিষণ্নতার কারণ, দশদিনেই তার সৈন্যদের খাদ্য রসদ অনেক কমে যায়। সৈন্যরা আশেপাশের বস্তিগুলো হতে জোরপূর্বক লুণ্ঠন

করে কিছু খাদ্য সঞ্চয় করে। কিন্তু মরুভূমির বস্তিগুলোতেও বিশেষ কোন খাদ্য মজুদ ছিল না। খাদ্য-সংকটে কুরাইশ সৈন্যদের মাঝে অসন্তোষ দানা বাধতে থাকে। সৈন্যদের নাজুক অবস্থা দেখে আবু সুফিয়ান এক ইহুদী গোত্রপ্রধান হুয়াই বিন আখতাবকে জরুরী তলব করে। হুয়াই পূর্ব হতেই কুরাইশদের ভরপুর সাহায্যের উদ্দেশে নিকটবর্তী কোথাও অবস্থানরত ছিল। সে কুরাইশদের আহ্বান ও তার কাছে সাহায্য প্রার্থনার অপেক্ষায় ছিল।

মদীনার অনতিদূরে বনূ কুরাইযা ইহুদী গোত্রের বস্তি ছিল। এই গোত্রের নেতা কা'ব বিন আসাদ এ বস্তিতেই ছিল। রাতে গভীর ঘুমে নিমগ্ন। আচমকা দরজায় জোরে জোরে নক হওয়ায় তার একত্রিত চোখের পাতা দু'টো এদিক-ওদিক সরে যায়। গোলামকে ডেকে বলে—"দেখতো বাইরে কে?"

"হুয়াই বিন আখতাব এসেছেন।" গোলাম দরজার ছিদ্রপথে চোখ রেখে বলে।

"এই গভীর রাতে ব্যক্তিগত কোন স্বার্থেই সে এসেছে।" একটু রাগত স্বরে কা'ব বিন আসাদ বলে—"তাকে বলে দাও, আমার পক্ষে এখন তার কোন উপকার করা সম্ভব হবে না। দিনে আসলে চেষ্টা করা যেতে পারে।"

বনু কুরাইযা ইহুদীদের ঐ গোত্রের নাম, যারা মুসলমানদের সাথে মিত্রতা ও একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করার চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। বনূ কায়নুকা এবং বনূ নযীরও চুক্তিবদ্ধ ছিল। কিন্তু ইতিপূর্বেই তারা মুসলমানদের সাথে গাদ্দারী করায় মুসলমানরা তাদেরকে 'দেশান্তরের' শাস্তি দেয়। সিরিয়া গিয়ে তারা আস্তানা গাড়ে। একমাত্র বনূ কুরাইজা শ্রদ্ধার সাথে চুক্তি অক্ষুণ্ণ রাখে। নিষ্ঠার সাথে সন্ধি ফলো করায় পরিখা যুদ্ধে বনূ কুরাইযার পক্ষ হতে কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা মুসলমানদের ছিল না। বনূ কুরাইজার মনেও কোন দুরভিসন্ধি ছিল না। কিন্তু হুয়াই বিন আখতাব তাদের প্ররোচিত করে এবং চুক্তির উপর অটল থাকতে দেয় না। হুয়াই বিন আখতাব ছিল ইহুদী। সে কা'ব বিন আসাদকে একই ধর্মাবলম্বী মনে করে তার কাছে যায়। উদ্দেশ্য, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাকে উত্তেজিত করা এবং চুক্তি ভঙ্গ করতে অনুপ্রাণিত করা। তাই কা'বের গোলামের কথা শুনেও সে নড়ে না। যে কোন মূল্যে কা'বের সাথে দেখা করতে চায়। অবশেষে বাধ্য হয়ে বিষণ্ন হৃদয়ে কা'ব নাছোড়বান্দা হুয়াইকে ভেতরে আসার অনুমতি দেয়।

"এমন অসময়ে তোমার আগমনের উদ্দেশ্য জানতে আমার বাকী নেই।" কা'ব বিন আসাদ হুয়াইকে বলে—"তুমি আবু সুফিয়ানের পক্ষ হতে এলে তাকে

গিয়ে বলবে, আমরা মুসলমানদের সাথে যে চুক্তিকে আবদ্ধ, মুসলমানরা যথাযথভাবে তার উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা আমাদেরকে সত্যই মিত্র বলে জানে এবং চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্য অধিকার সবই প্রদান করেছে।"

"কা'ব বিন আসাদ! মাথা ঠাণ্ডা করে কথা বল।" হুয়াই বিন আখতাব বলে—"বনূ কায়নুকা এবং বনূ নযীরের পরিণতি দেখ। এ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় স্পষ্ট আমার চোখে ভাসছে। ইহুদীদের খোদার শপথ! দশ হাজার সৈন্য মুসলমানদের পিষ্ট করে ফেলবে। যুদ্ধে মুসলমানরা টিকতে না পেরে ইহুদীদেরকে এ পরাজয়ের কারণ চিহ্নিত করে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।"

"তোমার মতলব খুলে বল হুয়াই!" কা'ব বিন আসাদ ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করে।

পাহাড়ের পশ্চাৎভাগ দিয়ে কুরাইশ সৈন্যদের একটি অংশ তোমাদের নিকট এসে পৌঁছবে।" হুয়াই বলে যায়—"তোমাদের বর্তমানে এই গোপন বাহিনী পশ্চাৎ হতে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে পারে না। তুমি সগোত্র গিয়ে কুরাইশদের সাথে মিলে যাও। কৌশলে মুসলমানদের উপর এভাবে আক্রমণ কর যে, শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে ঠিকই কিন্তু দীর্ঘক্ষণ ময়দানে থাকবে না; বরং সুযোগ বুঝে পিছু হঁটে আসবে। এতে কুরাইশদের এই ফায়দা হবে যে, মুসলমানদের দৃষ্টি পরিখা থেকে ঘুরে যাবে আর এই সুযোগে কুরাইশরা পরিখা অতিক্রম করতে সক্ষম হবে।"

"তোমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার পর যদি আমরা ঘটনাক্রমে ব্যর্থ হই, তখন আমাদের সাথে মুসলমানদের আচরণ কেমন হবে বলে তুমি মনে কর?" কা'ব বিন আসাদ বলে—"মুসলমানদের কঠোরতা ও ক্রোধ সম্বন্ধে তোমরা নিশ্চয় অবগত। বনূ কায়নুকা এবং বনূ নযীরের কাউকে তোমাদের চোখের সামনে ঘুরতে দেখ কি?"

"আবু সুফিয়ান সবদিক চিন্তা করেই তোমার দিকে চুক্তির হাত বাড়িয়েছে।" হুয়াই বিন আখতাব বলে—"সত্যই যদি মুসলমানদের ক্রোধ ও কঠোরতা তোমাদের উপর নেমে আসে, তবে কুরাইশদের একটি বাহিনী তোমাদের হেফাজতের জন্য শাইখাইনসহ পার্শ্বস্থ পাহাড়ে বিদ্যমান থাকবে। তারা গেরিলা আক্রমণে অত্যন্ত পারদর্শী। এই চৌকস বাহিনী ক্ষিপ্রগতিতে 'এখন-তখন', 'এখানে-ওখানে' আক্রমণ করে মুসলমানদের এমন তটস্থ করে রাখবে যে, তারা তোমাদের দিকে চোখ তুলে তাকাবার ফুরসতও পাবে না।"

"তুমি আমাকে এমন সঙ্কটে নিক্ষেপ করছ, যা আমার পুরো গোত্রকে ধ্বংস করে ছাড়বে।" কা'ব বিন আসাদ বলে।

"তোমার গোত্র ধ্বংস হোক বা না হোক কুরাইশরা এই চুক্তির বিনিময়ে এত মূল্য দেবে যা তোমরা কল্পনাও করনি।" হুয়াই বলে—"অথবা সহযোগিতার মূল্য নিজেই বল ... যা বলবে, যেভাবেই চাবে তা পেয়ে যাবে। উপরন্তু তোমার গোত্র পাবে পূর্ণ নিরাপত্তা। মুসলমানরা ক'দিনের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাদের সাথে হাত মিলাও, যারা জীবিত থাকবে এবং যাদের হাতে থাকবে অসীম ক্ষমতা ও শক্তি।"

কা'ব বিন আসাদ ন্যায়নিষ্ঠ থাকলেও 'ইহুদী' ছিল তার ধর্মীয় পরিচয়। স্বর্ণ-রৌপ্য এবং হীরা-জওহারের টোপে সে শেষ পর্যন্ত হুয়াই বিন আখতাবের সাথে হাত মিলায়।

"কোন কুরাইশ সৈন্যের আমাদের এলাকার নিকট আসার প্রয়োজন নেই।" কা'ব বিন আসাদ বলে—"আমার লোকেরাই মুসলমানদের উপর গেরিলা আক্রমণ করতে থাকবে। রাতের আঁধারেই এ পরিকল্পিত হামলা হবে। যাতে মুসলমানরা ঘুণাক্ষরেও টের না পায় যে, গেরিলারা বনূ কুরাইযা।... আর হুয়াই!" কা'ব ঠোঁটে মুচকি হাসি টেনে বলে—"তুমি নিজেই দেখছ, আমি এখানে একা পড়ে থাকি। আমার রাত এভাবে একাকী কেটে যায়।"

"আজকের রাতটি একাকী কাটাও।" হুয়াই বলে—"কাল থেকে আর নিঃসঙ্গ রাত কাটাতে হবে না।"

"আমি দশ দিন সময় চাই।" কা'ব বলে—"গোত্রকে প্রস্তুত করতে হবে আমার।"

এভাবে হুয়াই বিন আখতাবের উপর্যুপরি প্রচেষ্টায় কুরাইশ এবং বনূ কুরাইযার মাঝে 'সহযোগিতা চুক্তি' স্থাপিত হয়।

॥ আটত্রিশ ॥

হযরত সা'দ বিন আতীক একজন সাধারণ লোক ছিলেন। মদীনায় তাঁর কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল না। খঞ্জর এবং তলোয়ার শান দেয়াই ছিল তাঁর পেশা। তার কণ্ঠটি ছিল বড়ই আকর্ষণীয় ও মধুর। শৌর্য-বীর্যও ছিল মোটামুটি। রাতে কোন অনুষ্ঠানে গীত পরিবেশন করলে মানুষ ঘরে বসে থাকতে পারত না। বাইরে এসে বাতাসে কান পাততো। কখনো সে শহরের বাইরে গিয়ে নিরিবিলি তরঙ্গে গান গাইতেন। রাসূল (সা.) মদীনায় হিজরত করে আসার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

এক রাতে তিনি শহরের বাইরে কোথাও মনোহরী কণ্ঠে গান শুরু করেন। তাঁর সুরে অভিভূত হয়ে এক অনিন্দ্য রূপসী যুবতী তাঁর সামনে এমনভাবে এসে দাঁড়ায়, যেন কোন অপ্সরী কিংবা জান্নাতী হুর আসমান থেকে মর্ত্যে নেমে এসেছে। ভয়ে সা'দ (রা.)-এর কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে। সুরের লহর থেমে যায়।

"যে মায়াবিনী কণ্ঠ আমাকে ঘর থেকে এখানে টেনে এনেছে তা থেকে বঞ্চিত কর না।" মেয়েটি আবেদনের ভঙ্গিতে বলে—"আমাকে দেখার কারণে যদি গান বন্ধ করে থাক, তবে আমি তোমার দৃষ্টির অন্তরালে চলে যাচ্ছি। তোমার গানকে হত্যা কর না।... তোমার কণ্ঠে বিরহ ঝরে পড়ছে, যেন কারো বিচ্ছেদে তুমি এ গান গাইছ।"

"তুমি কে?" সা'দ (রা.) বলেন—"তুমি পরী-অপ্সরী কি-না সত্য বল।"

এ কথায় জলতরঙ্গের মত মেয়েটির হাসি আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে। মরুভূমির নির্মল ভরা পূর্ণিমায় তার আঁখিদ্বয় হীরার মত চমকাতে থাকে।

"আমি বনূ কুরাইযার এক ইহুদীর কন্যা।" মেয়েটি জানায়।

"আর আমি মুসলমান।" সা'দ (রা.) বলেন।

"ধর্মকে মাঝখানে টেনে এনো না।" ইহুদী কন্যা বলে—সঙ্গীতের কোন ধর্ম নেই। আমি তোমার জন্য নয়; তোমার গীত ও কণ্ঠে অভিভূত হয়ে এসেছি।"

হযরত সা'দ (রা.) মেয়েটির রূপে বিমুগ্ধ আর ইহুদী মেয়েটি তার কণ্ঠে মোহিত হয়। কণ্ঠজাদু মেয়েটিকে এমন বন্ধনে আবদ্ধ করে, মৃত্যুও যে বন্ধন মুক্ত করতে পারে না। এ রাতের পরেও তারা পরস্পরে অভিসারে মিলিত হয়। একে অপরের মাঝে বন্দী হয়ে যায় তারা। একদিন ইহুদী মেয়েটি তাকে জানায়, হযরত সা'দ (রা.) চাইলে সে তার কাছে চলে আসবে এবং ইসলাম গ্রহণ করবে।

মাত্র দু-তিন দিন হয় কুরাইশরা মদীনা অবরোধ করেছে। যুদ্ধের সাজসাজ রব পড়ে যাওয়ায় কর্মকারের পেশায় নিয়োজিত হযরত সা'দ বিন আতীকের কাজও বেড়ে যায়। তাঁর কাছে মানুষ দলে দলে এসে তলোয়ার, খঞ্জর এবং বর্শার মাথা ছুঁচালো ও সূতীক্ষ্ণ করতে ভীড় জমাতে থাকে। কাজের চাপে রাতেও তাঁকে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে হয়।

একদিন ইহুদী মেয়েটি তার পিতার তলোয়ার নিয়ে হযরত সা'দ (রা.)-এর কাছে আসে।

"তলোয়ার ধারালো করার বাহানায় এসেছি।" মেয়েটি বলে—"আজ রাতেই এ স্থান ত্যাগ কর, নতুবা আর কখনো আমাদের সাক্ষাৎ হবে না।"

"ব্যাপার কি?" রাজ্যের উদ্বেগ নিয়ে হযরত সা'দ (রা.) জানতে চান।

"গত পরশু রাতে পিতা আমাকে বলেন, গোত্রপ্রধান কা'ব বিন আসাদ তাকে চায়?" ইহুদী কন্যা বলে—"পিতা হুয়াই বিন আখতাবের কথাও বলে। আমি কা'বের বাসভবনে যাই। সেখানে হুয়াই বিন আখতাব ছাড়াও আরো দু'ব্যক্তি ছিল। তাদের আলোচনা হতে যতদূর বুঝলাম তাতে মনে হল, মুসলমানদের অন্তিম মুহূর্ত দোর-গোড়ায়।

কা'ব বিন আসাদ, হুয়াই বিন আখতাব এবং কুরাইশদের মাঝে এই কন্যার উপস্থিতিতেই চুক্তি সম্পন্ন এবং পশ্চাৎ দিক হতে মুসলমানদের উপর আক্রমণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইহুদী কন্যাকে রাতভর কা'বের কাছে কাটাতে হয়। সকালে সে নিজের বাড়ি ফিরে আসে। মুসলমানদের ব্যাপারে মেয়েটির কোনই আগ্রহ ছিল না। তার ভালবাসা ছিল শুধু সা'দকে কেন্দ্র করে। তার কানে এ খবরও পৌঁছে যে, কা'ব তাকে স্বীয় মর্যাদা দিয়ে নিজের ঘরে চিরদিনের জন্য রেখে দিবে।

হযরত সা'দ (রা.) যুদ্ধ-ব্যস্ততার দরুন ইহুদী মেয়েটির কথা এক প্রকার ভুলে গিয়েছিলেন। মেয়েটি কিন্তু তাঁকে ভুলেনি। অস্ত্র ধারের বাহানা দিয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে আসে। কিন্তু সা'দ তাকে পূর্বের মত পাত্তা দেন না। তাকে বাড়ি ফিরে যেতে বলেন। এক ইহুদী কন্যা সূত্রে প্রাপ্ত খবর বিশিষ্ট এক মুসলমানকে সবিশেষ জানান। তিনি গুরুত্বপূর্ণ এ সংবাদ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে দেন। সেখান থেকে হেড কোয়ার্টারে রাসূল (সা.)-এর কানে এ খবর পৌঁছে যে, বনূ কুরায়যা অপর দু'ইহুদী গোত্র বনূ কায়নুকা ও বনূ নাযীরের মত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে শত্রুপক্ষের সাথে হাত মিলিয়েছে। রাসূল (সা.) বনূ কুরায়যা গোত্রপ্রধান কা'ব বিন আসাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে সংবাদটির সত্যতা যাচাই করা জরুরী মনে করেন। বনূ কুরাইযা যে বাস্তবেই কুরাইশদের সাথে নতুন গোপন চুক্তিকে আবদ্ধ হয়েছে, তার স্বপক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়েই তিনি তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চান।

আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দাদের সাহায্য করে থাকেন। এরই মধ্যে এমন এক ঘটনা ঘটে যাতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, বনূ কুরাইযা এবং কুরাইশদের মাঝে বাস্তবিকই এক বিপজ্জনক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

ঘটনা এই ঘটে যে, খন্দকের অনতিদূরে অবস্থিত বিভিন্ন ছোট ছোট কেল্লায় মহিলা ও বাচ্চাদের স্থানান্তর করা হয়। একটি কেল্লায় কিছুসংখ্যক নারী ও বাচ্চাদের সাথে রাসূল (সা.)-এর ফুফু হযরত সফিয়াহ (রা.)ও ছিলেন। একদিন তিনি কেল্লার ছাদে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ কি মনে করে নিচের দিকে তাকান। প্রাচীরের সাথে সেঁটে থাকা এক ব্যক্তির প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। তার চলার গতি ছিল সন্দেহপূর্ণ। একটু থেমে আবার কিছুদূর চলতে চলতে সে কেল্লার প্রাচীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিল। হযরত সফিয়াহ (রা.) অলক্ষ্যে তার গতিবিধি নিরীক্ষণ করতে থাকেন। একটু পরেই তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আগন্তুক কেল্লার অভ্যন্তরে প্রবেশের কোন বিকল্প পথ কিংবা উপায় বের করা যায় কি-না তা যাচাই করে দেখছে।

হযরত সফিয়াহ (রা.)-এর সন্দেহ গাঢ় হওয়ার কারণ হলো, তাঁর জানা ছিল শহরের সমস্ত পুরুষ পরিখার নিকটবর্তী ঘাঁটিতে অবস্থানরত কিংবা যুদ্ধ বিষয়ক অন্য কোন কাজে ব্যস্ত। যদি সন্দেহভাজন ব্যক্তি নিজেদের লোক হত এবং বিশেষ কোন প্রয়োজনে এসে থাকে তবে গোপন বা বিকল্প পথ না খুঁজে মেইন গেটে নক করত।

পুরো কেল্লায় বাচ্চা ও নারীদের সাথে মাত্র একজন পুরুষ ছিলেন। আরব-খ্যাত কবি হাসসান বিন সাবেত (রা.) ছিলেন সেই ব্যক্তিটি। হযরত সফিয়াহ (রা.) ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করে এখনই এর প্রতিবিধান করার জন্য হযরত হাসসান (রা.)-এর কাছে ছুটে যান এবং তাঁকে বলেন, নিচে এক সন্দেহভাজন প্রাচীরের গায়ে মিশে মিশে চলছে।

"আমার সন্দেহ, সে ইহুদী।" হযরত সফিয়াহ (রা.) হযরত হাসসান (রা.)-কে বলেন—"হাসসান! তোমার জানা আছে যে, বনূ কুরাইযা মৈত্রীচুক্তি ভঙ্গ করেছে। এ ব্যক্তিকে ইহুদীদের গুপ্তচর মনে হচ্ছে, বনূ কুরাইযা পশ্চাৎ হতে আমাদের উপর আক্রমণ করতে চায়, যাতে পরিখার নিকটে অবস্থানরত পুরুষদের দৃষ্টি পরিখা হতে সরে যায় এবং তারা আমাদের রক্ষার্থে পিছু হটে আসে। পুরুষদেরকে পরিখা হতে দূরে সরানোর এই পরিকল্পনা তখনই কার্যকর হতে পারে, যখন তারা নারী ও বাচ্চা ভরপুর এই কেল্লায় আক্রমণ করবে। ... জলদি নিচে যাও হাসসান! আল্লাহ্ তোমাকে হেফাজত করবেন। সন্দেহভাজনের গতিরোধ কর। সত্যই সে ইহুদী হয়ে থাকলে তাকে সেখানেই কতল করে দেবে। মনে রেখ, তার হাতে বর্শা আছে। পরিচিত আলখেল্লার অভ্যন্তরে লুকানো তরবারীও থাকতে পারে।"

"সম্মানিত ভদ্র মহিলা!" কবি হাসসান (রা.) বলেন—"আপনার কি জানা নেই যে, আমি একজন কবি বৈ নই। আমি মানুষের রক্তে আগুন ধরিয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত করতে পারি; নিজের মাঝে আলোড়ন তুলতে পারি না। এমন একজন কবি থেকে এই আশা করবেন না যে, সে একাকী বাইরে গিয়ে এমন এক ব্যক্তির মোকাবেলা করবে, যে বিরাট সাহসিকতা প্রদর্শন করে কেল্লা পর্যন্ত এসে পৌছেছে।"

ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম এবং ইবনে কুতাইবা (রা.) লেখেন, আরবের এই প্রখ্যাত কবির উত্তর শুনে রাসূল (সা.)-এর ফুফু হযরত সফিয়াহ (রা.) ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকান এবং এত উত্তেজিত হয়ে ওঠেন যে, নিজেই ঐ সন্দেহভাজনকে ধরতে কিংবা হত্যা করতে তৎক্ষণাৎ রওনা হন। তাঁর এটা ভাবার ফুরসৎ ছিল না যে, এক সশস্ত্র পুরুষের মোকাবেলা করতে যাবার কালে তাঁর হাতে কোন্ অস্ত্র রয়েছে। দ্রুত যাবার সময় পথিমধ্যে হতে যে অস্ত্র তার সংগ্রহ হয়, তা কোন বর্শা কিংবা তলোয়ার ছিল না। একটি লাঠি কোনমতে হাতে পেয়েই তিনি শত্রুর উদ্দেশে ছুটে যান। পথ আবিষ্কার করতে সচেষ্ট সন্দেহভাজনকে কোনরূপ আত্মগোপন কিংবা পলায়নের সুযোগ দেন না। সন্দেহভাজনের অবস্থান চিহ্নিত করে সরাসরি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ান।

"কে তুমি?" হযরত সফিয়াহ (রা.) ক্রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন।

সন্দেহভাজন চমকে পিছনে তাকায়। অসৎ উদ্দেশে না এসে থাকলে তার আচার-আচরণ অন্য রকম হত। সে চোখের পলকে বর্শা উঁচু করে নিক্ষেপের প্রস্তুতি নেয়। ইতিমধ্যে সন্দেহভাজনের চেহারায় হযরত সফিয়াহ (রা.)-এর চোখ পড়লে তার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না যে, লোকটি একজন ইহুদী এবং সে বনূ কুরাইযার লোকই হবে। সন্দেহভাজনও এরই মধ্যে নিশ্চিত হয়ে যায় যে, আগন্তুক যেহেতু এক নারী বৈ নয় এবং তার হাতে একটি সাধারণ লাঠি মাত্র, তাই সে তাকে বিশেষ কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

"তোর উপর খোদার গজব পড়ুক।" হযরত সফিয়াহ (রা.) উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন—"তুমি বনূ কুরাইযার গুপ্তচর নও কি?"

"মুহাম্মাদের ফুফু! এখান থেকে চলে যাও বলছি!" ইহুদী গুপ্তচর বলে—"তুমি কি আমার হাতে মরতে চাও?... হ্যাঁ, আমি বনূ কুরাইযার লোক।"

"তবে তুমি জীবিত ফিরে যাবার আশা করো না।" হযরত সফিয়াহ (রা.) তার পরিচয় পেয়ে বলেন।

গুপ্তচর ইহুদী সজোরে হেসে ওঠে এবং দু'পা সামনে এগিয়ে বর্শা ছুঁড়ে মারে। বর্শার গতি অপেক্ষা অধিক দ্রুত হযরত সফিয়াহ (রা.) একদিকে সরে যান। এতে ইহুদীর আক্রমণ চরমভাবে ব্যর্থ হয়। সাথে সাথে সে নিজের ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে খানিকটা আগে বেড়ে যায় এবং পা স্বস্থান হতে উঠে যায়। হযরত সফিয়াহ (রা.) এই সুযোগ পূর্ণ কাজে লাগান এবং শরীরের সমস্ত শক্তি হাতে জমা করে প্রচণ্ডবেগে তার মাথায় আঘাত করেন। আঘাত লাঠির হলেও তাতে খোদায়ী শক্তির সংযোগ ঘটেছিল। ইহুদী টাল সামলাতে সামলাতে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তার মাথা ঘুরতে থাকে। হযরত সফিয়াহ (রা.) তাকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসার সুযোগ না দিয়ে পুনরায় তার মাথায় বজ্রের মত আঘাত করেন।

ইহুদী এক আঘাত খেয়ে যদিও বা দাঁড়াতে যাচ্ছিল কিন্তু উপর্যুপরি দ্বিতীয় আঘাত তাকে দাঁড়াতে দেয় না। হাত থেকে বর্শা খসে পড়ে যায়। আপনাতেই হাঁটু তার মাটিতে এলিয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে মাথার আহত স্থান থেকে রক্ত বেরিয়ে তার পোষাক রক্ত-রঞ্জিত করতে থাকে। তথাপিও হযরত সফিয়াহ (রা.) তার মাথায় আরেক ঘা দেন। সে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তিনি বিষাক্ত সাপের মাথা থেতলে দেয়ার ন্যায় তার মাথা লাঠিযোগে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে থাকেন। তিনি ঐ সময় হস্ত সংবরণ করেন, যখন ইহুদীর মাথা পূর্ণ থেতলে যায় এবং শরীর হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ নিস্তেজ, নিথর। মৃত্যু নিশ্চিত করেই তবে তিনি কেল্লায় ফিরে যান।

"হাসসান!" হযরত সফিয়াহ (রা.) কবি হাসসানকে লক্ষ্য করে বলেন—"যে কাজ তোমার করার ছিল তা আমি করে এসেছি। এখন গিয়ে ঐ ইহুদীর অস্ত্র নিয়ে এস। তার বস্ত্রের অভ্যন্তরে যা পাবে তাও নিয়ে আসবে। আমি নারী। কোন পর-পুরুষের কাপড়ের অভ্যন্তরে হাত ঢুকানো একজন নারীর জন্য শোভনীয় নয়। ... চাইলে এই সমুদয় মালে গনীমত তুমি নিয়ে নিতে পার। এ সবের আমার কোনই প্রয়োজন নেই।"

"আল্লাহ্ আপনার মান-মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষা করুন।" হযরত হাসসান (রা.) কবিসুলভ মুচকি হেসে বলেন—"গনীমতের মালের আমারও কোন প্রয়োজন নেই।" একথা বলেই তিনি দ্রুত স্থান ত্যাগ করেন। তিনি এর মাধ্যমে সম্ভবত এটাই জানাতে চান যে, তাঁর এই সাহসও নেই যে, মাথা থেতলে যাওয়া এক লাশের দেহ তিনি স্পর্শ করবেন।

ঐতিহাসিকগণ লেখেন, ইহুদীদের এহেন আচরণের সংবাদ রাসূল (সা.) অবগত হলে তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হন। শহরে খাদ্য-সংকট চরমরূপ ধারণ করে মাথা পিছু প্রত্যেক ব্যক্তি তার মৌলিক প্রয়োজনের এক-চতুর্থাংশ আহার পায়. তীব্র খাদ্য-সংকটে পতিত হয়ে রাসূল (সা.) আল্লাহ্র দরবারে আশু সাহায্য কামনা করেন। সাথে সাথে সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকরী বিকল্প কোন পন্থা বের করার চেষ্টা করেন।

॥ উনচল্লিশ ॥

এদিকে পরিখার উভয় পাড় ছিল তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ। তখনকার অস্বাভাবিক অস্থিরতা ও চরম উত্তেজনার কথা হযরত খালিদ (রা.)-এর মনে ছিল। তিনি পরিখার পাড় বেয়ে বারংবার অশ্ব প্রদক্ষিণ করেন। কোন স্থানে নাক গলিয়ে পরিখা অতিক্রম করা যায় কি-না এই ছিল তাঁর মূল পরিকল্পনা। তিনি ছিলেন চির লড়াকু। রণাঙ্গনের বীর সৈনিক। লড়াই ছাড়াই ফিরে যাওয়া তিনি নিজের জন্য অপমান মনে করতেন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্মুখ যুদ্ধের কোন পরিবেশ ও সুযোগ ছিল না। এখানে এই প্রক্রিয়ায় যুদ্ধ চলে যে, পরিখার যে স্থানে মুসলমানরা শিবির স্থাপন করে অবস্থান করছিল উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কুরাইশ সৈন্য তার নিকটে গিয়ে মুসলমানদের উপর তীর বর্ষণ করত। মুসলমানরা তীরের জওয়াব তীর দ্বারাই দিত। কুরাইশ কোন সৈন্য অপর স্থানে টহলরত সান্ত্রীর উপর তীর ছুঁড়লে তৎক্ষণাৎ একদল মুসলিম সৈন্য তার সাহায্যে পৌঁছে যেত। মুসলমানদের পক্ষ হতে রাতে পরিখায় টহলরত সান্ত্রীর সংখ্যা দ্বিগুণ করা হত। কুরাইশদের সকল পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় তারা পরিখা হতে পিছু হঁটে ক্যাম্পে গিয়ে অবস্থান নিত।

মদীনায় খাদ্য-সংকট দুর্ভিক্ষের রূপ পরিগ্রহ করার বিষয়টি রাসূল (সা.)-এর যেমনি জানা ছিল, তেমনি তাঁর হাতে এ তথ্যও ছিল যে, কুরাইশ সৈন্যরাও অধিকাংশ অভুক্ত। এক প্রকার না খেয়েই তাদের দিন কাটছে। এটা এমন এক নাজুক পরিস্থিতি যা মানুষকে পরস্পরের শর্ত মেনে নেয়া এবং চুক্তি স্থাপন ও সমঝোতায় উপনীত হতে বাধ্য করে।

ইতিহাস ঐ ব্যক্তির নাম লেখেনি, রাসূল (সা.) যাকে গোপনভাবে কুরাইশের মিত্রগোত্র 'গাতফানের' সেনাপ্রধান 'আইনিয়া' এর নিকট এই উদ্দেশে পাঠান যে, সে তাকে কুরাইশদের সখ্যতা ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করবে। তাকে মুসলমানদের সাথে মিলে যাবার প্রস্তাব দেয়া হয় না। রাসূল (সা.)-এর উদ্দেশ্য শুধু এটুকুই ছিল যে, প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে গাতফান এবং আইনিয়া সৈন্য প্রত্যাহার করে নিলে

বহুজাতিক বাহিনী নিশ্চিত দু'হাজার সৈন্য হারাবে। এ আশাও ছিল যে, গাতফানের অনুকরণে অন্যান্য গোত্রও কুরাইশদের টা-টা জানাবে এবং বহুজাতিক বাহিনী হতে বেরিয়ে যাবে।

"মুহাম্মাদ কি আমাদেরকে শুধু মৌখিক চুক্তিতে আবদ্ধ হবার আহ্বান জানাচ্ছে?" সেনাপতি আইনিয়া রাসূল (সা.)-এর দূতের কাছে জানতে চায়—"এ পর্যন্ত আমাদের যে অর্থ ব্যয় হয়েছে তা বহন করবে কে?"

"আমরা বহন করব" রাসূল (সা.)-এর দূত বলে—"নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা স্বীয় গোত্র প্রত্যাহার করে এলাকায় ফিরে গেলে এ বছর মদীনায় যত খেজুর উৎপন্ন হবে তার এক-তৃতীয়াংশ পাবে তোমরা। তোমরা নিজেরাই মদীনা এসে খর্জুর বীথিকা নিজ চোখে দেখে যাবে এবং চুক্তিবদ্ধ খেজুর নিজেরাই সংগ্রহ করে নিয়ে যাবে।"

সেনাপতি আইনিয়া রণাঙ্গনে যুদ্ধ করা ও করানোতে বেশ পারঙ্গম ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট অনভিজ্ঞ ছিলেন। ঐতিহাসিক ইবনে কুতাইবা লেখেন, এ ঘটনার কিছুদিন পর রাসূল (সা.) তাকে 'নিরেট গর্দভ' আখ্যা দেন। বলিষ্ট দেহ এবং শারীরিক শক্তিসম্পন্ন এক সদা হাস্যোজ্জ্বল সুপুরুষ ছিল আইনিয়া। রাসূল (সা.)-এর দূতের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের পর সে গাতফান সর্দারের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করে।

"খোদার কসম! মুহাম্মাদ আমাদের দুর্বল মনে করে এই বার্তা পাঠিয়েছে" গাতফান বলে—"তাঁর দূতের কাছে জিজ্ঞাসা কর, মদীনায় যারা আছে তারা কি প্রায় অনাহারে দিন কাটাচ্ছে না? আমরা তাদেরকে এভাবে অভুক্ত রেখে তিলে তিলে হত্যা করব।"

"ক্ষুধার তাড়নায় আমাদের সৈন্যদের কাহিল অবস্থার কথা কি আপনার জানা নেই।" সেনাপতি আইনিয়া বলে—"মদীনাবাসী না খেয়ে থাকলেও নিজ নিজ বাড়িতে আছে। আর আমরা এলাকা ছেড়ে মরুভূমিতে পড়ে আছি। সৈন্যদের হতাশা ও উদ্বেগ আপনার নজরে পড়েনি? আপনি কি এটাও লক্ষ্য করেন নি যে, আমাদের ধনুক থেকে বেরিয়ে যাওয়া তীর এখন আর ততদূরে যায় না, তীরন্দাজদের পেট ভরা থাকলে যতদূর যেত? ক্রমে তাদের বাহুবল দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে আসছে।"

"মুহাম্মাদের প্রস্তাবের জবাব কি হবে তার সিদ্ধান্ত তুমি দিবে?" গাতফান উত্তেজিত কণ্ঠে জানতে চায়—"না-কি গোত্রপ্রধান হিসেবে আমিই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিব?"

"খোদার কসম! রণাঙ্গনের প্রয়োজনে যে সিদ্ধান্ত আমি গ্রহণ করতে পারঙ্গম, তা আপনি নিতে পারেন না।" সেনাপতি আইনিয়া বলে—"পক্ষান্তরে যুদ্ধ ছাড়া অন্য বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত আপনি নিতে সক্ষম, তা আমার দ্বারা কখনও সম্ভব নয়। আমার জ্ঞান তলোয়ার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি এত জটিলরূপ ধারণ করেছে যে, এখানে আমার সৈন্যদের তলোয়ার, বর্শা এবং তীর অকেজো ও হতাশ হয়ে গেছে। পরিখার কিনারায় যেতেও আমরা অক্ষম। অতএব, এ মুহূর্তে মুহাম্মাদের প্রস্তাবকে স্বাগত জানানোই হবে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।"

গোত্রপতি ও সেনাপতির রুদ্ধদ্বার বৈঠক শেষে মুহাম্মাদের প্রস্তাবে সাড়া দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দূত অনুকূল জবাব নিয়ে ফিরে আসে। মুসলমানদের বিরাট কূটনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিজয় অর্জিত হয়। সতর্ক দূত সংগোপনে যায় এবং কার্যসিদ্ধ করে নিরাপদেই ফিরে আসে। কুরাইশ কেউ তাকে দেখতে পায় না। কারণ, গাতফানের সৈন্যরা পৃথক এক স্থানে অবরোধ করে অবস্থান করছিল।

॥ চল্লিশ ॥

আল্লাহ্র রাসূল (সা.)-এর বিরোধিতা কিংবা সিদ্ধান্ত অমান্য করার শক্তি কারো ছিল না। তথাপি রাসূল (সা.) শরীয়তের শিক্ষা অনুযায়ী সকল সাহাবাকে ডেকে পাঠান এবং সকলের মতামত গ্রহণ করেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, মত প্রকাশে সবাই স্বাধীন। তিনি এখন যে বিষয়ে আলোকপাত করতে চান, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত থাকলে সে খোলা মনে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে পারে। আসলে রাসূল (সা.) সকলের অবিসংবাদিত নেতা হলেও তিনি একক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। ফলে তিনি সকলের সামনে তাঁর পরিকল্পনা ও গৃহীত পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করে শুনান। গাতফানের সাথে এ যাবত যে আলোচনা হয় তাও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তুলে ধরেন। যাতে কোনরূপ ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ না থাকে।

"এটা হতে পারে না।" রাসূল (সা.)-এর সিদ্ধান্তের বিপরীতে দু'তিনটি কণ্ঠ উচ্চকিত হয়-"আমাদের তলোয়ার যাদের রক্তের পিয়াসী, তাদেরকে আমাদের উৎপাদিত শস্যের একটি দানাও দিব না। এখনও তো যুদ্ধ হয়নি। তাই যুদ্ধ ছাড়াই কেন প্রকাশ করতে যাব যে, আমরা বর্তমানে যুদ্ধের পরিস্থিতিতে নেই।"

সমর্থনসূচক আরো কিছু ধ্বনি উত্থিত হয়। সাথে সাথে কিছু দলীল-প্রমাণও পেশ করা হয়। রাসূল (সা.) একে অধিকাংশের অভিমত মনে করে পূর্ব পরিকল্পনা স্থগিত রাখেন। তবে এই নতুন সিদ্ধান্ত জানাতে দূতকে পুনরায়

গাতফান ও আইনিয়ার কাছে পাঠানো হয় না। অধিকাংশের বিরোধিতার মুখে রাসূল (সা.) সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখলেও একথা সবাইকে স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দেন যে, কূটনৈতিক পদক্ষেপ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টা ছাড়া এই অবরোধ শেষ হবে না।

হক পন্থীদের সাহায্য করা আল্লাহ্র চিরায়ত নীতি। রাসূল (সা.) এ ব্যাপারে আল্লাহ্র কাছে যে সাহায্য চেয়েছিলেন, তা এক ব্যক্তির রূপে তার সামনে এসে দাঁড়ায়। ইনি হলেন হযরত নু'আইম বিন মাসউদ (রা.)। তিনি ছিলেন গাতফান গোত্রের। বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে তাঁর যথেষ্ট পরিচিতি ছিল। আল্লাহ্ পাক তাকে অসাধারণ মেধা দান করেছিলেন। কুরাইশ, গাতফান ও বনূ কুরাইযা তিন গুরুত্বপূর্ণ গোত্রের উপরেই তাঁর বিশেষ প্রভাব ছিল। একদিন সবাইকে অবাক করে দিয়ে গাতফান গোত্রের এই বিশিষ্ট ব্যক্তি মদীনায় রাসূল (সা.)-এর সামনে এসে দাঁড়ান।

"আল্লাহ্র কসম! তুমি অন্য গোত্রের লোক।" রাসূল (সা.) আগন্তুক হযরত নু'আইম বিন মাসউদ (রা.)-এর প্রতি দৃষ্টি ছুঁড়ে বলেন—"তুমি আমাদের লোক নও। এখানে কিভাবে এলে?"

"আমি আপনাদের নই ঠিকই কিন্তু আপনার লোক।" হযরত নু'আইম বিন মাসউদ (রা.) মুখে হাসি টেনে বলেন—"মদীনায় আমার সাক্ষী রয়েছে। অনেক আগেই আমি গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছি। এতদিন আপনার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পাইনি। গাতফান সৈন্যদের সাথে কেবল এই উদ্দেশেই এসেছি যে, সুযোগ করে আপনার দরবারে এসে হাজির হব। এতদিন সুযোগ করে উঠতে পারিনি। জানতে পেরেছি, আপনি আমাদের গোত্রপ্রধান ও সেনাপতিকে কুরাইশদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ ও রণাঙ্গন ছেড়ে চলে যাবার প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। এর বিনিময়ও আপনি তাদের জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আলোচনা মাঝপথে থমকে যায়। রহস্যজনকভাবে আপনি নীরবতা পালন করে চলছেন।"

"তোমার উপর আল্লাহ্র রহমত হোক।" রাসূল (সা.) এ কথা বলে সাথে সাথে এটাও জিজ্ঞাসা করেন—"তুমি কি আলোচনা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এসেছ?"

"না, হে আল্লাহ্র রাসূল!" হযরত নু'আইম (রা.) জবাবে বলেন—"আপনার কাছে আসাই আমার মূল লক্ষ্য। মদীনাবাসী ঘোর সংকটে নিপতিত। আমি কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে এখানে এসেছি। রাসূল (সা.) এবং ইসলামের কল্যাণে এই প্রাণ উৎসর্গ করেছি। যে কোন কাজে এই জীবন ব্যয় করতে আমার কোন

আপত্তি নেই।"...সেনাক্যাম্প থেকে সন্তর্পণে বেরিয়ে আসি। সুযোগ বুঝে পরিখায় নেমে পড়ি, কিন্তু সান্ত্রীদের উপস্থিতিতে এপার আসা আত্মহত্যার নামান্তর ছিল। ফিরে যাওয়াও নিরাপদ ছিল না। উভয় সংকটে পড়ি। উপায়ান্তর না দেখে আল্লাহ্‌র কাছে আপনার নাম নিয়ে কাকুতি-মিনতি করি। কায়মনোবাক্যে দুয়া করি। আল্লাহ রহম করেন। সান্ত্রী টহল দিতে দিতে কিছুটা দূরে চলে গেলে পরিখা পার হয়ে আসতে সক্ষম হই।

ইতিমধ্যে রাসূল (সা.)-কে হযরত নু'আইম (রা.)-এর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়। গোত্রে তাঁর অবস্থান কোন্ পর্যায়ে তাও জানানো হয়। তাঁর সাথে সামান্য আলাপেই রাসূল (সা.) অনুধাবন করেন যে, তিনি উঁচু পর্যায়ের এবং বিচক্ষণ একজন পুরুষ। রাসূল (সা.) এক পর্যায়ে হযরত নু'আইম (রা.)-কে জানান যে, বর্তমানে যে সংকটাপন্ন অবস্থা চলছে তা এড়াতে হলে বহুজাতিক বাহিনীর শরীক দলগুলোর মধ্যে কুরাইশদের ব্যাপারে সন্দেহ ও বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করে দেয়া একান্ত জরুরী। আর এটা তখনই সম্ভব হবে, যদি আমরা দু'তিনটি শরীক দলের সাথে গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারি।

"হে আল্লাহ্‌র রাসূল!" হযরত নু'আইম (রা.) বলেন—"যদি নিজস্ব পন্থায় এ কাজটির দায়িত্ব আমি গ্রহণ করি, তবে হযরত আমার উপর আস্থা রাখবেন কি?"

"নুআইম! আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহম করুন"-রাসূল (সা.) বলেন-"আমি তোমাকে এবং তোমার সদিচ্ছাকে আল্লাহ্‌র হাতে সঁপে দিচ্ছি।"

"আমি নিজ গোত্রে ফিরে যাব।" হযরত নু'আইম (রা.) বলেন—"কিন্তু একথা কাউকে জানাব না যে, আমি মদীনায় গিয়েছিলাম। এখন আমি কা'ব বিন আসাদের কাছে যাচ্ছি। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার সফলতার জন্য দোয়া চাই।"

॥ একচল্লিশ ॥

রাতে মদীনায় বড় জোরদার পাহারা ছিল। পশ্চাতে পরিখা ছিল না। ওদিকে সারি সারি পাহাড় প্রাকৃতিকভাবে প্রহরীর ভূমিকা পালন করে চলছিল। এদিকে পরিখাকে কেন্দ্র করে পাহারাদার ও টহলদার সান্ত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। শহরের কোন ব্যক্তির জন্যও এই নিশ্চিদ্র প্রহরা এড়িয়ে বাইরে বের হওয়া ছিল অসম্ভব। সান্ত্রী যাতে হযরত নু'আইম (রা.)-এর গতিরোধ না করে তার জন্য রাসূল (সা.) তার সাথে একজন লোক পাঠান। লোকটি হযরত নু'আইম (রা.)-কে নিরাপদে মদীনার বাইরে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসেন। হযরত নু'আইম (রা.) যখন বনূ কুরাইযার এলাকায় কা'ব বিন আসাদের ফটকে এসে পৌঁছান, তখন রাতের প্রথম প্রহর। নক করলে গোলাম গেট খুলে দেন।

"তুমি আমাকে চেন কা'ব?" হযরত নু'আইম (রা.) জিজ্ঞাসা করেন।

"নুআইম বিন মাসউদকে কে না চেনে?" কা'ব শয্যা থেকে উঠতে উঠতে বলে—"আমি যতদূর জানি গাতফান গোত্র তোমার মত নেতা পেয়ে সত্যই গর্বিত?...বল নুমাইম! এই গভীর রাতে আমি তোমার কি কাজে আসতে পারি?...আমি দশ দিনের টাইম চেয়েছি। কেবল ৬/৭ দিন হয়েছে। মুসলমানদের উপর গেরিলা হামলা চালাতে আমার লোক প্রস্তুত।... তুমিকি এ ব্যাপারটি নিশ্চিত হতে এসেছ?"

"এ জাতীয় বিষয়ে আলোচনা করতেই আমি এসেছি।" হযরত নু'আইম (রা.) বলেন—"তুমি একজন আস্ত গর্দভ কা'ব! কোন ভরসায় তুমি কুরাইশদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছ?...এ প্রশ্ন তোল না যে, তোমার প্রতি কেন আমার এই আন্তরিক সহমর্মিতা? আমি মুসলমানদেরও হিতাকাঙ্ক্ষী নই। তুমি ভাল করেই জান, আমি একজন নিরপেক্ষ মানবদরদী। আমার অন্তর তোমার গোত্রীয় যুবতী-রূপসী মেয়ে, কন্যা বধূ এবং বোনদের ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যথিত, যারা তোমার আত্মঘাতী চুক্তির কারণে দু'দিন পরেই মুসলমানদের বাঁদীতে পরিণত হবে। তুমি কুরাইশদের সাথে আত্মঘাতীমূলক চুক্তি করেছ। এ চুক্তির মাধ্যমে তুমি নিজেদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা বিকিয়ে দিয়েছ। মুসলমানরা আক্রমণ করলে কুরাইশরা তোমাদের নিরাপত্তার কোন গ্যারান্টি দিয়েছে কি? আমরাও কুরাইশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ; কিন্তু তার জন্য নিরাপত্তা গ্যারান্টিও তাদের থেকে আদায় করে নিয়েছি।"

"কুরাইশদের পরাজয় নিশ্চিত কি?" কা'ব বিন আসাদ ভ্রূ কুচকে জিজ্ঞাসা করে।

"তারা যুদ্ধে হেরে বসে আছে।" হযরত নু'আইম (রা.) বলেন—পরিখা তাদেরকে শহরে হামলা করার সুযোগ দেবে বলে মনে কর?...ক্ষুধা-তৃষ্ণা কুরাইশ সৈন্যদেরকে ভীষণ উদ্বিগ্ন করতে শুরু করেছে। আমার গোত্র ক্ষুধায় অস্থির। আমি চাই না যে, আগামীকাল তুমি এই বলে আমার গোত্রের বদনাম করবে যে, গাতফান তোমাদেরকে মুসলমানদের দয়া-করুণার উপরে ছেড়ে চলে গেছে। আমি চাই যেন এমনটি না হোক যে, ওদিকে যখন বাধ্য হয়ে আমরা ও কুরাইশরা অবরোধ তুলে ফিরে যাব তখন তুমি এদিকে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে নিজেদেরকে তাদের শত্রু হিসেবে পরিচিত করাবে। বনূ কায়নুকা এবং বনূ নযীরের পরিণতি নিশ্চয় তোমার মনে আছে। মুসলমানরা চুক্তিভঙ্গের দরুন তাদেরকে কেমন শাস্তি দিয়েছে তাও তোমার অজানা নয়।"

হযরত নু'আইম (রা.)-এর যুক্তিপূর্ণ এ কথায় কা'ব বিন আসাদ সম্পূর্ণ নীরব হয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ সে কিছু বলতে পারে না। নিজ হাতে সে ধ্বংসচুক্তি করেছে, হয়ত হৃদয় গহীনে তারই জল্পনা-কল্পনা হতে থাকে। চিন্তার কালো মেঘ ছেয়ে যায় তার কপোল-আকাশে। ভবিষ্যৎ চিন্তায় নিস্তব্ধ হয়ে যায় সে।

"আমার জানা আছে, কুরাইশদের থেকে তুমি এর কত বিনিময় লাভ করেছ।" হযরত নু'আইম (রা.) বলেন—কিন্তু কথা হলো, এ সকল ধন-দৌলত এবং রূপসী নারী, যা কুরাইশ ও হুয়াই বিন আখতাব সরবরাহ করেছে, তার মালিক পরিশেষে মুসলমানরাই হবে। শুধু তাই নয়, মৈত্রীচুক্তি ভঙ্গের অপরাধে তোমাদের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে।"

"তবে কি কুরাইশদের সাথে কৃত চুক্তি প্রত্যাহার করে নিব?" কা'ব উদ্বেগের সাথে জানতে চায়।

"এখনই চুক্তি প্রত্যাহার করা দরকার নেই।" হযরত নু'আইম (রা.) কৃত্রিম বিজ্ঞতাভাব ফুটিয়ে বলেন—"এতে তারা ক্রুদ্ধ হতে পারে। তবে নিরাপত্তার গ্যারান্টি অবশ্যই নেয়া চাই। আরবের রীতি অনুযায়ী কুরাইশদের গিয়ে বল, তাদের উচ্চপদস্থ কিছু লোক যেন জামিন হিসেবে প্রদান করে। যদি তারা দাবী অনুযায়ী সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় লোক প্রদান করে, তবে বুঝবে তারা চুক্তির ব্যাপারে ন্যায়-নিষ্ঠ ও আন্তরিক।"

"হ্যাঁ, নুআইম!" কা'ব বিন আসাদ বলে—"আমি জামিন হিসেবে তাদের লোক চাইব।"

॥ বিয়াল্লিশ ॥

হযরত নু'আইম (রা.) কা'ব বিন আসাদের এখানে সফল মিশন শেষে রাতের আঁধার কেটে পাহাড় অভিমুখে এগিয়ে চলেছেন। কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত কুরাইশদের তাঁবুই এখন তাঁর প্রধান টার্গেট। সোজা রাস্তা নিকটবর্তী হলেও পথিমধ্যে পরিখা ছিল। তিনি দূর রাস্তা দিয়ে অনেক ঘুরে ঘুরে চলতে থাকেন। তিনি গতরাত থেকে লাগাতার চলছেন কিন্তু গোপনে চলায় এবং সাধারণ রাস্তা পরিহার করায় দ্বিগুণ সময় লেগে যায়। হযরত নু'আইম (রা.) যখন সুফিয়ানের নিকট পৌঁছে তখন ইতিমধ্যে আরেকটি রাত শুরু হয়ে যায়। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় তাঁর সারা শরীর ব্যথায় টনটন করছিল এবং পানির পিপাসায় জিহ্বাও শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। এক নিঃশ্বাষে ঢকঢক করে প্রচুর পানি পান করার পরেই তবে সে কথা বলার উপযুক্ত হয়ে ওঠে। আবু সুফিয়ান হযরত নু'আইম (রা.)-এর বিচক্ষণতা ও মেধার দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

"তোমার অবস্থাই বলছে তুমি স্বগোত্রীয় সৈন্যদের থেকে আসনি।" আবু সুফিয়ান হযরত নু'আইম (রা.)-কে আরো জিজ্ঞাসা করে—"কোত্থেকে আসছ?"

"অনেক দূর থেকে।" হযরত নু'আইম (রা.) দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন—"একটি গুপ্তচর টিমের সাথে সাক্ষাৎ করে আসছি। তোমরা বনূ কুরাইযার সাথে চুক্তি করেছ ঠিকই কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আমাদের সাথে তাদের দহরম-মহরম শুধু এই স্বার্থে যে, তারা আমাদের হাতে ইসলামের সলিল সমাধি ঘটাতে চায়।... বনূ কুরাইযার দুই বন্ধুর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। সৌভাগ্যক্রমে মদীনার এক পুরাতন বন্ধুর সাথেও দেখা হয়ে যায়। এদের থেকে যে তথ্য পেয়েছি তাতে স্পষ্ট যে, কা'ব বিন আসাদ মুহাম্মাদের সঙ্গ ছাড়েনি। উপরন্তু সে মুসলমানদের খুশী করার এক নতুন পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে। তোমরা তাকে মদীনা আক্রমণের অনুরোধ করেছ। কিন্তু সে কুরাইশ নেতৃস্থানীয় কিছু লোককে জামিন হিসেবে পেতে ইচ্ছুক। যাদেরকে সে মুসলমানদের হাতে উঠিয়ে দিবে আর মুসলমানরা তাদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করবে। এরপর ইহুদীরা ঘোষণা দিয়ে মুসলমানদের সাথে মিলে গিয়ে সম্মিলিত শক্তি নিয়ে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।... আমি তোমাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করতে এসেছি, যেন ইহুদীদের কথা শুনে জামিনস্বরূপ একজন লোকও না পাঠাও।"

"খোদার কসম নুআইম!" আবু সুফিয়ান উত্তেজিত কণ্ঠে বলে—"তোমার তথ্য সত্য প্রমাণিত হলে বনূ কুরাইযার বস্তি সম্পূর্ণ উৎখাত করে ছাড়ব। কা'ব বিন আসাদের লাশ আমার ঘোড়ার পিছে বেঁধে টানতে টানতে মক্কায় নিয়ে যাব। কোন্ দিবাস্বপ্নে সে আমাদের ধোঁকা দেয়ার সাহস করল?"

"শরাব এবং রূপসী নারীর জাদুতে আপনিই তার চিন্তাজগৎ আচ্ছন্ন করে দিয়েছেন।" হযরত নু'আইম (রা.) একটু শ্লেষের সাথে বলেন—"মদ এবং নারী কাউকে কখনো আন্তরিকতা ও সততার উপর টিকে থাকতে দেয়?"

"মদ এবং নারী কে তাকে সরবরাহ করেছে?" আবু সুফিয়ান অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে—"হতভাগা কা'বের কি এতটুকু বোঝারও শক্তি নেই যে, আমি তার সাথে যে চুক্তি করেছি তার মধ্যে তার জাতি ও ধর্মের নিরাপত্তা নিহিত? যদি মুহাম্মাদের ধর্ম বর্তমান গতিতে ছড়াতে থাকে তবে ইহুদীবাদ খতম হতে বাধ্য।"

"ইহুদীদেরকে তোমরা এখনও চেননি।" হযরত নু'আইম (রা.) মুখে গাম্ভীর্য টেনে বলেন—"শত্রুদের কাছেও তারা তাদের শত্রুতা প্রকাশ হতে দেয় না।...হুয়াই বিন আখতাবও একজন ইহুদী। সেই তোমাদের পক্ষ থেকে কা'বকে

শরাবের মটকা এবং দুই রূপসী যুবতী ললনা সরবরাহ করেছে। আমি যখন কা'বের সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়, তখন সে পূর্ণ মাতাল এবং তার দুই পাশে দুই নারী বিবস্ত্র অবস্থায় ছিল। সে নেশার ঘোরে আমাকে বলে, সে নাকি কুরাইশদেরকে আঙ্গুলের মাথায় নিয়ে নাচাচ্ছে।"

"নুআইম!" আবু সুফিয়ান তলোয়ারের বাটে হাত রেখে বলে—"আমি মদীনা হতে অবরোধ তুলে নিয়ে বনূ কুরাইযার বংশের মূলোৎপাটন করব। তার এ সাহস কিভাবে হল যে, সে কুরাইশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে জামিন হিসেবে পেতে চায়!"

"আবু সুফিয়ান! এভাবে উত্তেজিত হয়ো না।" হযরত নু'আইম (রা.) বলেন—"ধীর-স্থির ও সুস্থ মস্তিষ্কে ভাব এবং এ দৃঢ় সিদ্ধান্ত নাও যে, জামিন হিসেবে এক ব্যক্তিকেও কা'বের কাছে পাঠাবে না।"

"আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।" আবু সুফিয়ান দৃঢ়তার সাথে বলে—"মদীনাবাসী সম্পর্কে কোন তথ্য দিতে পার? তারা কোন অবস্থার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করছে? আর কতদিন তাদের পক্ষে ক্ষুধা-তৃষ্ণার যাতনা সহ্য করা সম্ভব?"

আবু সুফিয়ানের দুর্বল পয়েন্টে আঘাত হানার মোক্ষম সুযোগ হাতে এসে যায় হযরত নু'আইম (রা.) এর।

"আমি সত্যিই বিস্মিত আবু সুফিয়ান!" হযরত নু'আইম (রা.) কপালে কৃত্রিম ভাঁজ সৃষ্টি করে বলেন—"দীর্ঘ অবরোধ সত্ত্বেও মদীনাবাসী হাস্যোজ্জ্বল ও প্রাণাবন্ত। ক্ষুধার কোন নিদর্শন তাদের মধ্যে নেই। খাদ্যের স্বল্পতা অবশ্যই আছে, তবে মদীনাবাসীর প্রেরণা ও জযবা এত তীব্র যে, এটা কোন ব্যাপারই নয় এবং খাদ্যের আদৌ কোন প্রয়োজন তাদের নেই।"

"এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমাদের অবরোধ তাদের মাঝে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি।" আবু সুফিয়ান হতাশার সুরে বলে।

"একেবারেই না।" হযরত নু'আইম (রা.) হতাশার পরিধি বৃদ্ধি করতে আরো সংযোগ করে বলেন—অবরোধের ফলে তাদের উপরন্তু এই লাভ হয়েছে যে, তাদের প্রত্যেকেই এখন জযবা ও প্রেরণায় সমৃদ্ধ এবং টইটম্বুর।"

"অথচ আমাদের ইহুদী গুপ্তচরদের রিপোর্ট হলো, মদীনার খাদ্যশস্য প্রায় নিঃশেষের পথে।" আবু সুফিয়ান হাল্কা উদ্বেগের সাথে বলে।

"তারা মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করেছে।" হযরত নু'আইম (রা.) তাকে আরো উদ্বেগের মধ্যে ঠেলে দিতে বলেন—আমি আবারও সতর্ক করছি যে, ইহুদীদের উপর আস্থা রাখা মোটেও ঠিক হবে না। 'মুসলমানদের অবস্থা ভাল নয়'—এই তথ্য পরিবেশন করে তারা তোমাদের উত্তেজিত করতে চায়। যেন মুসলমানদেরকে দুর্বল ভেবে তোমরা পরিখা অতিক্রম করে মদীনা আক্রমণ কর। তারা মূলত সুকৌশলে এক ঢিলে দুই পাখী মারতে চায়। কুরাইশ এবং আমার গোত্র গাতফানকে মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করাই তাদের প্রধান টার্গেট।"

"আমি তাদের উদ্দেশ্য ফের যাচাই করে দেখছি।" আবু সুফিয়ান এ কথা বলে এক গোলামকে আসতে বলে।

"ইকরামা এবং খালিদকে ডেকে আন।" আগত গোলামের উদ্দেশে আবু সুফিয়ান নির্দেশের সুরে বলে।

"যাই, গাতফান গোত্রপ্রধানকে খবরটা জানিয়ে আসি।" একথা বলে হযরত নু'আইম (রা.) প্রস্থান করেন।

॥ তেতাল্লিশ ॥

হযরত খালিদ (রা.) এবং ইকরামা এলে আবু সুফিয়ান হযরত নু'আইম (রা.) কর্তৃক বর্ণিত কা'ব বিন আসাদ সংশ্লিষ্ট সমুদয় ঘটনা খুলে বলে।

"আবু সুফিয়ান! অপরের ভরসায় আর যা কিছু হোক লড়াই করা যায় না।" হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"আপনি এ দিকটি কখনো ভাবেন নি যে, বনূ কুরাইযা মুসলমানদের ছায়ায় অবস্থানরত। তারা ভূ-অভ্যন্তর দিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু মুসলমানদের করুণার উপরই যে তারা বেঁচে আছে-এ কথা ভুলে গেলে চলবে না। আপনি যুদ্ধ করতে এসে থাকলে একজন যোদ্ধার মতই লড়াই চালিয়ে যান।"

"এ মুহূর্তে তোমাদের যে কোন একজনের কা'ব বিন আসাদের কাছে যাওয়া কি সঙ্গত নয়?" আবু সুফিয়ান জানতে চায়—নুআইমের কাছে জামিনের কথা বললেও তোমরা গেলে হয়ত এমনটি বলবে না।... সৈন্যদের অভুক্ত অবস্থা দেখছ না? এমতাবস্থায় তাদের পক্ষে পরিখা অতিক্রম করা আদৌ কি সম্ভব? এখন সঙ্কট উত্তরণের এটাই একমাত্র উপায় যে, কা'ব মদীনার অভ্যন্তরে মুসলমানদের উপর গেরিলা হামলার কার্যকর ব্যবস্থা করবে।"

"আমি যাব।" ইকরামা বলে—"আমি এটাও বলে যাচ্ছি যে, কা'ব যদি আমার কাছেও জামিনের শর্ত উল্লেখ করে, তবে আমি আপনার কাছে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করা ছাড়াই চুক্তি বাতিল করে দিব।"

"ইকরামার সাথে আমিও যাব?" হযরত খালিদ (রা.) অনুমতি প্রার্থনার সুরে আবু সুফিয়ানের কাছে জানতে চান এবং বলেন—"তার একাকী যাওয়া ঠিক হবে না।"

"না।" আবু সুফিয়ান দৃঢ়তার সাথে জানায়—"বিপদের মুখে এক সাথে দুই সেনাপতিকে আমি ঠেলে দিতে পারি না। ইকরামা আত্মরক্ষার্থে যত সৈন্য চায় নিয়ে যেতে পারে।"

ইকরামা তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে যায়। সাথে ছিল চার সশস্ত্র বডিগার্ড। অনেক বিদঘুটে এবং বন্ধুর পথ অতিক্রম করে তাকে বনূ কুরাইযায় পৌঁছতে হয়। ৬২৭ খৃস্টাব্দের ১৪ মার্চ। শুক্রবার। অনেক কষ্টে পাহাড়ের পর পাহাড় মাড়িয়ে ইকরামা কা'ব বিন আসাদের ভবনে গিয়ে পৌঁছে। ইকরামাকে দেখেই কা'ব তার আগমনের কারণ অনুমান করে ফেলে।

"এস ইকরামা!" কা'ব বিন আসাদ বলে—"আমি জানি তুমি কেন এসেছ। তোমার কষ্ট করে আসার প্রয়োজন ছিল না। আমি তো দশদিনের সময় চেয়ে নিয়েছি।"

কা'ব এক গোলামকে ডাক দেয়। গোলাম এলে তাকে শরাব এবং সুরাহী আনতে বলে।

"আগে আমার কথা শোন কা'ব।" ইকরামা সিদ্ধান্ত জানানোর ভাষায় বলে—"আমি শরাব পান করতে আসিনি। জলদি আমাকে ফিরে যেতে হবে। অবরোধকে দীর্ঘ করা আর আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা আগামী কালই মদীনায় আক্রমণ করতে যাচ্ছি। তুমি আমাদের সাথে চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে বিশেষ সৈন্যদের উপর কাল থেকেই আক্রমণ শুরু কর। আমাদের এ কথাও জানা আছে যে, তুমি বাহ্যিকভাবে আমাদের সাথে চুক্তি করেছ কিন্তু মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত মৈত্রী চুক্তি গোপনে ঠিকই অব্যাহত রেখেছ।"

এরই মধ্যে ডানাকাটা পরীসম এক রূপসী ললনা শরাবের বোতল এবং পানপাত্র নিয়ে কামরায় প্রবেশ করে। মেয়েটি ইকরামাকে দেখে মুচকি হাসে। ইকরামা তাকে দেখলে তার চেহারায় গাম্ভীর্যের ছাঁপ আরো গাঢ়ভাবে পড়ে।

"কা'ব!" ইকরামা চড়া গলায় বলে—"ভিত্তিহীন ও দু'দিনের এ সমস্ত বস্তুর বিনিময়ে তুমি নিজ ধর্ম ও জবান বিকিয়ে দিয়েছ?"

এ সময় কা'ব বিন আসাদের ইশারায় মেয়েটি ভিতরে চলে যায়।

"স্নেহের ইকরামা!" কা'ব বলে—"আমি তোমার চেহারায় মনিবসুলভ ভাব লক্ষ্য করছি। মনে হচ্ছে, গোলাম মনে করে তুমি আমাকে হুকুম দিতে এসেছ। মুসলমানদের সাথে আমাদের চুক্তি হয়েছিল বনূ কুরাইযার শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থেই। আর তোমাদের সাথে আমার চুক্তি হয়েছে তোমাদের বিজয় আর মুসলমানদের পরাজয়ের লক্ষ্যে। মুলমানদের বিনাশ করা আমার ধর্মীয় নির্দেশ। তোমাদের সাথে চুক্তি স্থাপন এ ধারাবাহিকতারই একটি প্রচেষ্টা মাত্র। নিজের ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতে আমি তোমাদের ব্যবহার করব। হুয়াই বিন আখতাবকে আমি স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছি, গাতফান এবং কুরাইশরা যেন বনূ কুরাইযার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। যাতে পরিস্থিতি এমন রূপ ধারণ না করে যে, তোমরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবে আর মুসলমানরা আমাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে।"

হযরত নু'আইম (রা.) দু'পক্ষের মুখে যে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দেন, তা ইকরামার অন্তরে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। হযরত নু'আইম (রা.) আবু সুফিয়ানের মাধ্যমে পূর্বেই ইকরামাকে জানিয়ে দেন যে, কা'ব জামানত পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাই কা'বের মুখ থেকে 'জামানত' শব্দ বের হতেই ইকরামা উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

"আমাদের উপর তোমার আস্থা নেই?" ইকরামা গর্জে উঠে বলে—"তুমি কি মনে করছ যে, আমরা হয়ত ভুলে গেছি যে, মুহাম্মাদ আমাদের এবং তোমাদের সম্মিলিত শত্রু?"

"আসলে তুমি যেটা বলছ তা আমার কথা নয়।" কা'ব বলে—"তবে এটা অবশ্যই সত্য যে, আমাদের সম্মিলিত শত্রুকে যতটুকু আমরা জানি ততটুকু তোমরা জান না। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, খোদা মুহাম্মাদকে যে অসাধারণ মেধা দান করেছেন, তা আমাদের কারো নেই।... আমার পরিষ্কার কথা, আমি জামানত চাই।"

"বল, কোন্ ধরনের জামানত তোমার প্রয়োজন?" ইকরামা ক্রুদ্ধকণ্ঠে জানতে চায়।

"কুরাইশ এবং গাতফান গোত্রের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোক আমাদের এখানে পাঠিয়ে দাও।" কা'ব জামানতের ব্যাখ্যা করে বলে "ইকরামা! এটা কোন নতুন কথা নয়। এটা তো আমাদের এবং তোমাদেরই পূর্ব নিয়ম। এ রীতি এবং শর্ত সম্পর্কে তোমরা সবিশেষ অবগত। আমি জামানত হিসেবে দাবীকৃত

লোকের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলিনি। সংখ্যা নির্ণয়ের ভার তোমাদের উপরেই রইল। তোমাদের ভাল করেই জানা আছে যে, চুক্তির বিপরীত কোন কিছু করলে আমরা তোমাদের এ নেতৃস্থানীয় লোকদের সোজা হত্যা করে ফেলব।"

"তাদেরকে তোমরা হত্যা করবে না।" ইকরামা উত্তেজনা মিশ্রিত কণ্ঠে বলে—"তুমি তাদেরকে মুসলমানদের হাতে তুলে দিবে।"

"একি বলছ ইকরামা?" কা'ব গভীর উৎকণ্ঠা আর একরাশ বিস্ময় নিয়ে বলে—"তুমি আমাকে এতই হীন মনে কর যে, প্রতারণা করে আমি তোমাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের মুসলমানদের হাতে হত্যা করাব? আমার উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পার।"

"ইহুদীদের উপর আস্থা রাখা সাপের উপর আস্থা রাখার ন্যায়।" ইকরামা চাপা ক্ষোভের সাথে বলে—"নিজেকে এত বিশ্বস্ত মনে করলে কালই মদীনার ঐ ছোট কেল্লায় আক্রমণ করে দেখাও তো, যেখানে মুসলমানদের স্ত্রী-বাচ্চারা অবস্থান করছে!"

"কাল!" কা'ব চোখ কপালে তুলে বিস্ময় ঝরা কণ্ঠে বলে—"কাল সাপ্তাহিক সুনির্দিষ্ট দিবস। এটি ইহুদীদের নিকট অত্যন্ত পবিত্র দিবস। আমরা একে 'সাবত' বলে অভিহিত করি। ইবাদাত ছাড়া দ্বিতীয় কোন কাজ আমরা এ দিবসে করি না। কোন ইহুদী সাবতের দিন কোন কাজ অথবা কারবার করলে কিংবা কারো উপর চড়াও হলে ইহুদীদের খোদা ঐ ব্যক্তিকে শূকর বা বাঁদর আকৃতিতে পরিবর্তন করে দেন।"

ইতিমধ্যে ইকরামা কা'বের নিয়তের গোলমাল সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যায়। কা'ব মদ গিলে চলছিল। ইকরামা শরাব্ ছুঁতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। সে আবু সুফিয়ানকে বলে গিয়েছিল যে, চূড়ান্ত ফায়সালা করেই তবে সে ফিরবে।"

"তুমি কাল হামলা কর অথবা একদিন পর হামলা কর সর্বাবস্থায় তোমাদের ইচ্ছার বাস্তব প্রতিফলন ঘটতে দেখার পরেই আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিব যে, জামিন হিসেবে আমাদের লোক তোমাদের দেয়া যায় কি-না!" ইকরামা বলে।

আমার কথাও বলে দিয়েছি যে, জামিন ছাড়া আমি কিছুই করব না।" কা'ব পাল্টা হুমকির সুরে বলে—"তোমাদের লোক আমাদের কাছে এসে পৌঁছলেই আমরা তোমাদের মর্জি মোতাবেক মদীনার অভ্যন্তরে গোলযোগ সৃষ্টি করব। তোমরা দেখবে, মুহাম্মাদের পিঠে কিভাবে একের পর এক ছুরি গেঁথে যায়।"

ইকরামা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় এবং রাগতস্বরে বলে—"তোমার মনে দুরভিসন্ধি আছে। যদি তাই না হত, তবে বলতে, আমার কোন জামানতের

প্রয়োজন নেই। এসো, সবাই মিলে মদীনাতেই মুসলমানদের সমাধি রচনা করি।"

"কারো নির্দেশেই যদি আমাকে মানতে হয় তবে মুহাম্মাদের নির্দেশ মেনে চলাকেই আমি শ্রেয় মনে করি।" কা'ব ইকরামার রাগকে আমলে না এনে পাল্টা পদক্ষেপ ঘোষণা করে বলে—"মুসলমানদের সাথেই আমাদের উঠাবসা। তারা আমাদের নিরপত্তা দিতে যতটুকু সক্ষম, তা তোমাদের পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়।"

ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম এবং ইবনে সা'দ লেখেন, হযরত নু'আইম (রা.)-এর নিক্ষিপ্ত তীর টার্গেট গিয়ে স্পর্শ করে। আর এ সবই ছিল তার কার্যকর প্রতিক্রিয়া। ইকরামা রাগান্বিতভাবেই কা'বের ঘর থেকে বের হয়। এভাবে কা'বের ঘরের নিভৃতেই ঐ চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে, ইহুদীবাদ ও কুরাইশদের মাঝে যা বাস্তবরূপ পেলে মুসলমানদের কোমর ভেঙ্গে দিত। ইহুদীদের গুপ্ত হামলা যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করত, তা সামাল দেয়া মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব হত কি-না তা কুদরতই ভাল জানে। কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় তারা এক বড় বিপর্যয় এড়াতে সক্ষম হয়।

॥ চুয়াল্লিশ ॥

এদিকে যখন ইকরামা কা'ব বিন আসাদের ভবন লক্ষ্যে চলছে ওদিকে হযরত নু'আইম (রা.) তখন গাতফান গোত্রের সর্দারের নিকট উপবিষ্ট। কা'ব সংশ্লিষ্ট যে তথ্যবৃত্তির মাধ্যমে তিনি আবু সুফিয়ানকে উত্তেজিত করেন, গাতফান সর্দারের কানেও সে তথ্যগুলো তুলে ধরেন। গাতফান সংবাদের গুরুত্ব অনুধাবন করে তৎক্ষণাৎ সেনাপতি আইনিয়াকে ডেকে পাঠায়।

"শুনেছ, কা'ব আমাদের কিভাবে প্রতারণা করে চলছে?" গাতফান আইনিয়াকে বলে—"সে জামানত হিসেবে রাখতে আমাদের নেতৃত্বস্থানীয় লোক চায়। এটা কি আমাদের অপমান নয়?"

"শ্রদ্ধেয় নেতা!" সেনাপতি আইনিয়া বলে—"আমি আপনাকে আগেও বলেছি, যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই কেবল আমার সাথে আলোচনা করবেন। আমি শুধু সামনাসামনি লড়াই করতে জানি। আমি তাকে ঘৃণা করি যে পশ্চাৎ হতে এসে আক্রমণ করে। তার প্রতিও আমার ঘৃণা, যে এভাবে পিঠে পশ্চাৎ আক্রমণের সুযোগ দেয়।... এত কিছুর পরেও আপনি ইহুদীদের উপর আস্থা রাখতে চান? যদি কা'ব বিন আসাদ দাবী করে বসে যে, জামানত হিসেবে আমাকে গাতফান গোত্রপ্রধানকে দিতে হবে, তাহলে কি আমি আপনাকে তার হাতে তুলে দিব?"

"কেউ এরূপ দাবী করলে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব।" হযরত নু'আইম (রা.) হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বলেন—"আমি ইহুদীদেরকে জামানত স্বরূপ মানুষ তো দূরের কথা একটি ভেড়া-বকরী পর্যন্তও দিব না।... খোদার কসম! কা'ব নিশ্চিতই আমাদের অপমান করেছে।"

"আবু সুফিয়ানের অভিমত কি?" গাতফান হযরত নু'আইম (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করে।

"ঘটনা শুনে আবু সুফিয়ান তো রাগে-উত্তেজনায় একেবারে কাঁপতে থাকে" হযরত নু'আইম (রা.) বলেন—"আবু সুফিয়ান কা'ব থেকে এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছে।"

"তাকে প্রতিশোধই নেয়া উচিত।" সেনাপতি আইনিয়া বলে—"বনূ কুরাইযার অবস্থানই বা আরকি! আমাদের এবং মুসলমানদের মাঝখানে চাপা পড়ে তারা এমনভাবে পিষ্ট হবে যে, আরব ভূখণ্ড হতে তাদের নাম-নিশানা সম্পূর্ণ মুছে যাবে। তাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

মদীনায় চলতি পথে হযরত খালিদের (রা.) স্পষ্ট মনে পড়ে ঐ সময়ের কথা যখন ইকরামা বনূ কুরাইযা হতে প্রত্যাবর্তন করেছিল। তিনি দৌড়ে তার কাছে যান। ওদিক দিয়ে আবু সুফিয়ানও ঘোড়া ছুটিয়ে ইকরামার কাছে এসে পৌঁছে। ইকরামার চেহারায় ক্রোধ এবং বিষণ্নতার গভীর ছাপ ছিল।"

"কি খবর বল।" আবু সুফিয়ান দূর থেকেই তাকে জিজ্ঞাসা করে।

"খোদার কসম!" ইকরামা ঘোড়ার পিঠ হতে নামতে নামতে বলে—"কা'বের থেকে জঘন্য কোন মানুষ ইতিপূর্বে আমি দেখিনি। নুআইমের রিপোর্ট বর্ণে বর্ণে সত্য।"

"জামানত হিসেবে আমাদের লোকের দাবী সে কি পুনরায় উত্থাপন করেছে?" হযরত খালিদ (রা.) কথার ফাঁকে জিজ্ঞাসা করেন।

"হ্যাঁ, খালিদ!" ইকরামা মাথা নেড়ে বলে—"সে আমার সামনে মদ পেশ করে এবং এমনভাবে কথাবার্তা বলে যেন আমরা তার কাছে ঋণাবদ্ধ।... সে স্পষ্ট জানায় যে, আগে জামানত হিসেবে লোক পাঠাও তারপরে আমি মদীনায় গুপ্তহামলা চালাব।"

"তাকে কেন বললে না যে, কুরাইশদের বিপরীতে বনূ কুরাইযার অবস্থান উটের সাথে ইঁদুর যেমন।" হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"তার মাথা ধড় থেকে কেন আলাদা করে দিলে না?"

"বড় কষ্টে হস্ত সংবরণ করেছি"-ইকরামা বলে-"তার সাথে আমাদের যে চুক্তি হয়েছিল তা ডিশমিশ করে এসেছি।"

"তুমি ঠিকই করেছ।" আবু সুফিয়ান অনেকটা ধরা গলায় বলে—"তুমি ঠিক কাজই করেছ।" অতঃপর সে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে চলে যায়।

এটা বেশী দিন আগের কথা নয়। আনুমানিক দেড়-দুই বছর পূর্বের ঘটনা। তার পরেও আজ মদীনায় যাবার কালে তাঁর কাছে চির পরিচিত পথ-ঘাটগুলো কেমন যেন অপরিচিত-অচেনা মনে হয়। এমনকি মাঝে মাঝে তাঁর নিজেকেও নিজের কাছে অচেনা লাগে। তন্ময় ও আনমনা হয়ে পথ চলতে থাকেন। আবু সুফিয়ানের সেদিনের ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ চেহারা এ সময় তাঁর নয়ন তারায় ভেসে ওঠে। হযরত খালিদ (রা.) সেদিন আবু সুফিয়ানের প্রস্থানের অবস্থা দেখে স্পষ্ট অনুধাবন করেন যে, আবু সুফিয়ান মদীনায় হামলা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সে চলে যাবার পর হযরত খালিদ (রা.) এবং ইকরামা সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকেন।

"কি চিন্তা করছ খালিদ?" মাথা উঁচিয়ে ইকরামা এক সময় জানতে চায়।

"এ কথা বললে আমায় দুষবে কি যে, আবু সুফিয়ান গোত্রপ্রধান বলেই তার উপস্থিতি ও নির্দেশ এখনও আমি মেনে চলছি?" হযরত খালিদ (রা.) সমর্থনের আশায় ইকরামার দিকে চেয়ে বলেন—"আবু সুফিয়ান থেকে অধিক ভীরু ও কাপুরুষ নেতা কুরাইশরা কখনো পায়নি আর পাবেও না।... তুমি জানতে চেয়েছ আমি কি ভাবছি।... আমি আর বেশী অপেক্ষা করতে পারছি না। আমি খন্দকের এ প্রান্ত হতে ও প্রান্ত ঘুরে ঘুরে দেখেছি। পরিখার এক স্থান যেমনি সংকীর্ণ তেমনি অগভীর। এ স্থান থেকে পরিখা অতিক্রম করা যাবে বলে মনে হয়। তুমি আমার সাথে থাকলে আজ এখনই ঐ স্থান হতে কতক অশ্বারোহীকে পরিখা অতিক্রম করাতে চাই। আবু সুফিয়ান কোন গায়েবী সাহায্য এবং সহযোগিতার অপেক্ষা করতে চাইলে করতে থাকুক।"

"আমি তোমার পাশে কেন থাকব না খালিদ?" ইকরামা উৎসাহিত কণ্ঠে বলে—"আমার দ্বারা মুসলমানদের ঐ অট্টহাসি সহ্য করা সম্ভব হবে না, যা তারা লড়াই ছাড়াই আমাদের পিছপা হবার কালে দিতে থাকবে। চল, আমি তোমার সাথে আছি।

॥ ছেচল্লিশ ॥

জুবাব পাহাড়ের পশ্চিমে এবং সালা' পাহাড়ের পূর্বে ছিল ঐ সংকীর্ণ স্থানটি। এখানে পরিখার প্রস্থ এতটুকু ছিল যে, তাজি ঘোড়ার পক্ষে তা লাফিয়ে পার

হওয়া সম্ভব। এখন প্রয়োজন শুধু.বাছাই করা বীর-যোদ্ধার। পদাতিক সৈন্য পরিখায় নেমে ওপারে যেতে পারবে। তবে এর ধারে কাছেই মুসলমানরা তাঁবু ফেলে আছে।

হযরত খালিদ (রা.) দূর থেকে আলোচিত স্থানটি ইকরামাকে দেখান।

"সর্বপ্রথম আমার অশ্বারোহী বাহিনী পরিখা পাড়ি দিবে।" ইকরামা বলে— "তবে এখনই আমি সমস্ত বাহিনীকে অতিক্রম করাব না। ওপারে গিয়ে মুসলমানদেরকে একজনের মোকাবেলায় একজনকে আহ্বান করব। তারা এ নীতির ব্যতিক্রম করবে না।... আমার সাথে এস খালিদ! আমি বাছাই করা অশ্বারোহী নিয়ে সামনে অগ্রসর হব। তুমি এখনই পরিখার ওপার যাবে না। আমরা উভয়ে নিহত হলে কুরাইশদের ভাগ্য-ললাটে পরাজয়ের তিলক ছাড়া আর কিছুই জুটবে না। আবু সুফিয়ান বলতে গেলে অবরোধ তুলে নিয়েছে। এখন ঘোষণা দেয়াটা শুধু বাকী। যুদ্ধের প্রেরণা তার সম্পূর্ণ নিস্তেজ হয়ে গেছে।

যে স্থান দিয়ে ঘোড়া লাফিয়ে কোন রকমে ওপারে যাবার সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছিল, তা এমন স্থানে অবস্থিত ছিল যে, টহলদার সান্ত্রী অতি নিকটে এসে স্থানটি পর্যবেক্ষণ করে যেতে পারত। ইকরামা দেখে-শুনে সাত অশ্বারোহী বাছাই করে। এর মধ্যে বিরাট বপুধারী বরং দৈত্য সমতুল্য আমর বিন আবদূদও ছিল। বিশালকায় দেহের সুবাদে তার নাম-খ্যাতি দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। ইকরামা বাছাইকৃত সাত অশ্বারোহীকে নির্ধারিত স্থানের অনতিদূরে নিয়ে গিয়ে এমনভাবে স্থানটি পর্যবেক্ষণ করায়, যেন তারা ঘোড়াকে টহল দিয়ে ফিরছে। মুসলমান প্রহরীর অন্তরে তাদের এই টহলে কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক করে না।

"প্রথমে আমিই পরিখা অতিক্রম করব।" ইকরামা হাঁটতে হাঁটতে সাত অশ্বারোহীকে তার পরিকল্পনা জানায়।

"সর্বপ্রথম আমার ঘোড়া পার হওয়াই কি সমীচীন হবে না?" আমর বিন আবদূদ আবেগের সাথে বলে।

"না, আমর!" ইকরামা তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করে বলে— "প্রথমে আমিই যাব। যদি আমার ঘোড়া পরিখায় পড়ে যায়, তবে তোমাদের কেউ পরিখা অতিক্রমের চেষ্টা করবে না। প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় তো তোমাদের সেনাপতিই দিবে।"

এ কথা বলেই ইকরামা ঘোড়ার লাগাম ধরে ঝটকা টান দেয়। ঘোড়া পরিখামুখী হলে ইকরামা ঘোড়ায় জোরে পদাঘাত করে। আরব-উন্নত জাতের

ঘোড়া বাতাসের বেগে চলতে থাকে। ইকরামা লাগাম আরো ঢিল করে দেয় এবং চলতি ঘোড়ায় পুনরায় পদাঘাত করে। ঘোড়ার গতি অস্বাভাবিক দ্রুততর হয়। পরিখার কিনারে গিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে ইকরামা উঁচু হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ঘোড়া নিজেকে বাতাসে ছুঁড়ে দেয়। ওপারের উদ্দেশে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হযরত খালিদ (রা.) দূরে দাঁড়িয়ে ইকরামার পরিখা অতিক্রমের দৃশ্য দেখতে থাকেন। কুরাইশদের বহু সৈন্যও অঘোষিতভাবে দর্শকের কাতারে এসে দাঁড়ায়। আসমান-জমিন নয়ন তুলে তাকায়। ইতিহাসও বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে থাকে।

ঘোড়ার সামনের পা পরিখার ওপার কিনারার সামান্য আগে এবং পিছনের পা ঠিক কিনারায় গিয়ে পড়ে। ঘোড়া গতির জোরে সামনে এগিয়ে যায়। ঘোড়ার সামনের দুই পা ভাঁজ হয়ে ডবল হয়ে যায়। তার মুখ মাটিতে গিয়ে ঠেকে। ইকরামা পড়তে পড়তে বেঁচে যায়। ঘোড়া দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসে। ইকরামাও নিজেকে সামলে নেয়। এমন সময় পশ্চাৎ হতে একটি দ্রুততম কণ্ঠ তার কানে ভেসে আসে।

"ইকরামা! আগে গিয়ে দাঁড়াও!"

ইকরামা চকিতে ফিরে তাকায়। আমর বিন আবদূদের ঘোড়াকে বাতাসে উড়ে আসতে দেখে। আমর রেকাবে ভর দিয়ে সম্মুখপানে ঝুঁকে ছিল। কারো আশা ছিল না যে, বিশাল ওজনের আরোহীর ঘোড়াটি পরিখা অতিক্রম করতে পারবে। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে আমরের ঘোড়াটি ঠিক ঐ স্থানে গিয়ে পড়ে যেখানে ইকরামার ঘোড়া ইতিপূর্বে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল। আমরের ঘোড়ার পাগুলো এমনভাবে ভাঁজ হয়ে যায় যে, ঘোড়া ভারসাম্য হারায় এবং একদিকে কাত হয়ে পড়ে যায়। আমর ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গড়াগড়ি খাওয়ার উপক্রম হয়। ক্ষণকাল পরে ঘোড়া উঠে দাঁড়ায়। আমরও সোজা হয়ে দাঁড়ায় এবং চোখের পলকে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যায়।

আমরের পিছন পিছন ইকরামার আরো দু'অশ্বারোহী ঘোড়া নিয়ে উড়াল দেয়। পরিখার কিনারায় এসে উভয় আরোহী নিজ নিজ ঘোড়ার পিঠ খালি করে দেয় এবং গর্দানের দিকে ঝুঁকে পড়ে। উভয় ঘোড়া নিরাপদে পরিখা পার হয়ে আসে।

কুরাইশ সৈন্যরা প্রাথমিক প্রচেষ্টার সফলতার খুশিতে গগনবিদারী শ্লোগান তোলে। হঠাৎ নারাধ্বনি শুনে মুসলিম পাহারাদারগণ দৌড়ে আসেন। এরই মধ্যে ইকরামার আরো দু'টি অশ্ব তাদের আরোহীকে পিঠে তুলে পরিখার পাড়ে এসে

বাতাসের হাতে নিজেদের সমর্পণ করে। এদের দেখাদেখি সাত অশ্বারোহীর বাকীরাও নিজ নিজ ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। সকলে নিরাপদে পরিখা অতিক্রম করে যায়।

"থামো!" ইকরামা মুসলিম সান্ত্রীকে উচ্চকণ্ঠে বলে—"আর কোন ঘোড়া পরিখা অতিক্রম করে আসবে না। মুহাম্মাদকে ডাকো। তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহাদুরকে আসতে বল। সে আমাদের কোন একজনকেও যদি ভূপাতিত করতে পারে তবে বিনা যুদ্ধে আমাদের হত্যা করার অধিকার তোমাদের থাকবে।... খোদার কসম! আমরা তোমাদের রক্ত এই তৃষ্ণার্ত বালুকে পান করিয়েই তবে ফিরে যাব।"

॥ সাতচল্লিশ ॥

মুসলিম ক্যাম্পে হুলস্থুল পড়ে যায়। একটি আহ্বান চারদিক গুঞ্জন করে ফেরে—"কুরাইশ এবং গাতফানরা পরিখা অতিক্রম করে ফেলেছে।... মুসলমানগণ! তোমাদের পরীক্ষার সময় আগত। ... হুশিয়ার ... সাবধান... শত্রু এসে গেছে।"

রাসূল (সা.) মুসলমানদেরকে নিয়ন্ত্রণহীন ও উৎকণ্ঠিত হতে দেন না। তিনি দেখেন যে, কুরাইশরা পরিখার এপারে দাঁড়িয়ে অট্টহাসি দিচ্ছে। তারা মুসলমানদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যও করে। চটকদার উক্তি এবং কৌতুকও করতে থাকে। ইকরামা আর তার সৈন্যদের দিকে রাসূল (সা.) এগিয়ে যান। হযরত আলী (রা.)ও তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে অনুধাবন করেন যে, ইকরামা মল্লযুদ্ধ লড়ার জন্য এসেছে। রাসূল (সা.) এবং হযরত আলী (রা.)-কে দেখে আমর বিন আবদূদ ঘোড়া সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়।

"হুবল এবং উযযার কসম!" আমর চিৎকার করে বলে—"তোমাদের মধ্যে এমন একজনও দেখছি না, যে আমার বিপরীতে লড়তে সক্ষম।"

ঐতিহাসিক আল্লামা আইনী (রহ.) প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে লেখেন, মুসলমানদের নীরবতা পরিষ্কার সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, তারা আমর-ভীতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। এর কারণ হল, আমরের বিশাল শরীর এবং প্রচুর শক্তির এমন এমন ঘটনা আরবের মুখে মুখে ছড়িয়ে ছিল যার দরুন সবাই তাকে মনুষ্য নয়, অসুর শক্তির অধিকারী বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করত। কোনদিন কেউ দেখেছে বলে জানা যায় না; কিন্তু এ কথা সবাইকে বলতে শুনা যায় যে, আমর শক্তিশালী ঘোড়াকে পর্যন্ত অনায়াসে কাঁধে তুলতে পারে এবং পাঁচশ অশ্বারোহীকে সে

একাই পরাজিত করতে সক্ষম। তাঁর ব্যাপারে সবার এই বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, আজ পর্যন্ত তাকে কেউ ভূপাতিত করতে পারেনি আর অদূর ভবিষ্যতে পারবেও না।

আবু সুফিয়ান ভগ্নহৃদয়ে পরিখার পাড়ে দাঁড়িয়ে ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিল। হযরত খালিদ (রা.) এবং সফওয়ানও নির্নিমেষ তাকিয়েছিল। গাতফান, আইনিয়া এবং তার অধীনস্থ তামাম লশকরও ওপারের প্রতিটি দৃশ্য অবলোকন করতে থাকে। সকলের মাঝে পিনপতন নীরবতা। এপারে যেন কবরের নিস্তব্ধতা। গভীর উৎকণ্ঠার ছাপ ছিল শুধু হযরত নু'আইম বিন মাসউদ (রা.)-এর চেহারায়। ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি ছিলেন মূক, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কিংবাকবিমূঢ় হয়ে অসহায় ভঙ্গিতে অমুসলিম সৈন্যদের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনিও সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন ওপারের শাসরুদ্ধকর প্রতিটি নাটকীয় দৃশ্যের প্রতি।

"আমি জানি, তোমাদের কারো আমার মোকাবেলায় এগিয়ে আসার সাহস হবে না।" আমরের আহ্বানে কেউ সাড়া না দেয়ায় সে নিজের বক্ষে হাত মারতে মারতে গর্ব করে বলতে থাকে।

পরিখার ওপারে হাসির রোল ওঠে। একাধিক চুটকিও ওপারের বাতাস এপারে সম্প্রচার করে।

হযরত আলী (রা.) অনুমতি লাভের আশায় রাসূল (সা.)-এর পানে চান। রাসূল (সা.) তাঁর মনোভাব বুঝতে পারেন। তিনি স্বীয় পাগড়ী মাথা হতে খুলেন এবং হযরত আলী (রা.)-এর মাথায় নিজ হাতে বেঁধে দেন। নিজের তরবারীটিও হযরত আলী (রা.)-এর হাতে তুলে দেন। ঐতিহাসিক ইবনে সা'দ লেখেন, এ সময় রাসূল (সা.)-এর জবান মুবারক থেকে নিঃসৃত হয়—"আলীর সাহায্যকারী একমাত্র তুমিই হে আল্লাহ্!"

রাসূল (সা.) কর্তৃক হযরত আলী (রা.)-কে প্রদত্ত তলোয়ার সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ লেখেন, কুরাইশের প্রখ্যাত যোদ্ধা মুনাব্বেহ বিন হাজ্জাজের তলোয়ার ছিল এটি। বদর যুদ্ধে সে নিহত হয়। বিজয়ী মুজাহিদগণ তলোয়ারটি রাসূল (সা.)-কে বিশেষভাবে প্রদান করেন। রাসূল (সা.) এরপর থেকে সর্বদা নিজের সাথে এই তলোয়ারটিই রাখতেন। এখন সে তলোয়ারটি হযরত আলী (রা.)-কে দিয়ে আরবের এক দৈত্যের মোকাবেলায় পাঠান। ইতিহাসে এ তরবারীটি 'জুলফিকার' নামে প্রসিদ্ধ।

হযরত আলী (রা.) রাসূল (সা.)-এর দোয়া নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে আমর বিন আবদূদের সামনে গিয়ে দাঁড়ান।

"আবু তালেবের পুত্র!" আম্র ঘোড়ার পিঠ থেকে সম্বোধন করে বলে—"তোমার কি মনে নেই তোমার পিতা আমার কত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল? এটা কি অশোভনীয় নয় যে, আমি আমার প্রিয় বন্ধুর পুত্রকে নিজ হাতে হত্যা করব?"

"পিতৃবন্ধু!" হযরত আলী (রা.) উদাত্ত কণ্ঠে জবাব দেন—"বন্ধুত্বের পরিচয় অনেক আগেই ছিন্ন ভিন্ন হয়েছে। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তোমাকে একবারের জন্য এ সুযোগ দিচ্ছি যে, তুমি আল্লাহ্‌কে সত্য এবং মুহাম্মাদ (সা.)-কে আল্লাহ্‌র রাসূল বলে মেনে নিয়ে আমাদের একজন হয়ে যাও।"

"তুমি একবার এসব উচ্চারণের সুযোগ পেয়েছ।" আমর তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে বলে—"দ্বিতীয়বার এ কথা আমার কানে আর আসবে না।"... মনে রেখ, আমি সব সময় বলব, আমি তোমাকে হত্যা করতে চাইনি।"

"কিন্তু আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই, আমর!" হযরত আলী (রা.) তার স্নেহসুলভ উক্তি প্রত্যাখ্যান করে বলেন—"ঘোড়া থেকে নেমে আমার মোকাবেলা করতে আস। চেষ্টা করে দেখ, আল্লাহ্‌র রসূলের তলোয়ার থেকে নিজেকে বাঁচাতে পার কি-না?"

॥ আটচল্লিশ ॥

আমরের পরিচয় দিতে গিয়ে ঐতিহাসিকগণ লেখেন, সে ছিল বর্বর, জংলী। ক্রোধান্বিত হলে তার চেহারা পশুর ন্যায় হিংস্র ও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত। সে ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নামে এবং মুহূর্তে তলোয়ার বের করে হযরত আলী (রা.)-এর উপর প্রথম আক্রমণ এত দ্রুত করে যে, দর্শকরা এক প্রকার নিশ্চিত হয়ে যায় যে, তার তলোয়ার হযরত আলী (রা.)-কে কেটে দু'টুকরো করে ফেলেছে। কিন্তু সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে হযরত আলী (রা.) সুকৌশলে এই মারাত্মক আক্রমণ এড়াতে সক্ষম হন। প্রথম আঘাত অকল্পনীয়ভাবে ব্যর্থ হতে দেখে আমর ক্রোধে অধীর হয়ে উপর্যুপরি হামলার পর হামলা চালাতে থাকে। হযরত আলী (রা.)ও অপূর্ব রণকৌশলে নিজেকে রক্ষা করতে থাকেন। আমর বাস্তব এ দিকটা নিয়ে কখনো ভাবেনি যে, যে শরীর ও শক্তির উপর তার এত অহংকার, তা সর্বত্র কাজে আসে না। অসি পরিচালনায় যে রকম দ্রুততা ও স্বাচ্ছন্দতা হযরত আলী (রা.) প্রদর্শন করে চলেছেন, তা আমরের দ্বারা কখনো সম্ভব নয়। কারণ আমরের তুলনায় হযরত আলী (রা.)-এর দেহ ছিল কম ভারী এবং আকারে স্বল্প দৈর্ঘ্যের। আমর শক্তিবলে ঘোড়াকে কাঁধে উঠাতে সক্ষম হলেও ঘোড়ার গতি তার মাঝে কখনো আসতে পারে না। এ বৈশিষ্ট্য একমাত্র ঘোড়ার। একজন মানুষ যতই শক্তিধর হোক না কেন, কৌশলের কাছে তার

পরাস্ত হওয়াটা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। হযরত আলী (রা.) একটি আক্রমণও করেন না। আমর একে 'ভীতির প্রভাব' মনে করে। আমর সর্বোচ্চ শৌর্য প্রদর্শন করতে বিরামহীন আঘাত করে চলে। হযরত আলী (রা.) ধৈর্যের সাথে সুকৌশলে কখনো এদিক কখনো ওদিকে নিজেকে ছুঁড়ে দিয়ে আত্মরক্ষার চরিত্রে সুনিপুণ অভিনয় করতে থাকেন। শক্তির মোকাবেলা অনেক সময় বুদ্ধির দ্বারা করতে হয়। হযরত আলী (রা.) দৈত্যকায় আমরের মোকাবেলায় এ কৌশলই অবলম্বন করেন। তাই তিনি আক্রমণে না গিয়ে আত্মরক্ষার ভূমিকা অবলম্বন করে আমরকে লাগাতার মুক্ত আক্রমণের সুযোগ করে দেন। যাতে বিশাল বপুধারী আমর উপর্যুপরি আক্রমণ করে অল্প সময়ের মধ্যে হাঁফিয়ে ওঠে এবং ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে নিস্তেজ ও শক্তিহীন হয়ে যায়। গবেট আমর এ চাল না ধরতে পেরে হযরত আলী (রা.)-এর পাতা ফাঁদে পা দিয়ে ক্রমেই নিজেকে ঘূর্ণাবর্তের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত করতে থাকে। এক সময় চাতুর্যের জয় হয়, বিশাল শক্তি শোচনীয় পরাজয় বরণ করে।

পরিখার ওপারে কুরাইশ সৈন্যরা হযরত আলী (রা.)-এর অসহায়ত্ব দেখে এতক্ষণ হেসে লুটিপুটি খাচ্ছিল। কিন্তু আচমকা তাদের অট্টহাসি থেমে যায়। কারণ, দৈত্যসম আমর আক্রমণ করতে করতে এক সময় থেমে যায়। অস্ত্র নিম্নমুখী করে কাঠের মত দাঁড়িয়ে থাকে। প্রচণ্ড হাফাচ্ছিল। হয়ত সে এ কারণে দারুণ বিস্মিত হয় যে, এত আক্রমণ সত্ত্বেও তার দেহের তুলনায় এক-বিশাংশ পরিমাণ ক্ষুদ্র দেহের অধিকারী এই নব যুবকটি কেন প্রভাবিত হচ্ছে না! আমর ক্লান্তও হয়ে পড়েছিল বেশ।

হযরত আলী (রা.) যখন নিশ্চিত হয়ে যান যে, আমর শরীরের সমস্ত শক্তি উপর্যুপরি আঘাত করতে করতে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দিয়েছে এবং এখন হত-বিহ্বল ও কিংবাকবিমূঢ় ঠাঁই দাঁড়িয়ে আছে। তখন তিনি সবাইকে অবাক করে দিয়ে তরবারী একদিকে ছুঁড়ে মেরে বিদ্যুৎ গতিতে আমরের দেহ জাপটে ধরেন এবং লাফিয়ে উঠে তার গর্দানকে নিজের বাহুবন্ধনে নিয়ে নেন। সাথে সাথে আমরের পায়ের সাথে নিজের পা লতার মত পেচিয়ে অভিনব পন্থায় তাকে ধরাশায়ী করেন। আমর চিৎ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। হযরত আলী (রা.) তার বুকে চেপে বসেন।

শেষ মুহূর্তে আমর হযরত আলী (রা.)-এর হস্তবন্ধন হতে গর্দান মুক্তির জোর প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু হযরত আলী (রা.)-এর শক্তিশালী বাহুবন্ধন হতে সে গর্দানকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়। এক সময় হযরত আলী (রা.) গর্দান হতে এক

হাত সরিয়ে নিজের কোমর হতে খঞ্জর উঠিয়ে নেন এবং তার অগ্রভাগ আমরের শাহরগে চেপে ধরেন।

"এখনও আমার আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনলে আমি তোমার প্রাণ ভিক্ষা দিব" হযরত আলী (রা.) বলেন।

আমর যখন দেখে যে, সারা আরব তার যে শক্তির উপর গর্ববোধ করত, তা অর্থহীন পর্যবসিত হয়েছে, তখন সে এই ঘৃণ্য আচরণ করে যে, বক্ষের উপর উপবিষ্ট হযরত আলী (রা.)-এর চেহারা লক্ষ্য করে থু থু নিক্ষেপ করে।

দর্শকদের আরেকবার বিস্মিত হবার পালা। সবার ধারণা হযরত আলী (রা.)-এর খঞ্জর আমরের শাহরগ ভেদ করে দেহ থেকে গর্দান এতক্ষণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু না, সবাইকে অবাক করে তিনি আমরের বুক থেকে উঠে আসেন। খঞ্জরকে খাপে ঠেলে দিয়ে হাত দ্বারা চেহারা পরিষ্কার করেন। আমর হযরত আলী (রা.)-এর হস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এমনভাবে উঠে দাঁড়ায় যেন তার শরীরে শক্তি বলতে কিছুই নেই। শুধু আমরের নয়, বরং প্রতিটি দর্শকের ধারণা ছিল হযরত আলী (রা.) এবার তাকে জিন্দা রাখবেন না। কিন্তু তিনি কিছুই না বলে স্বাভাবিকভাবে পাশে সরে গিয়ে দাঁড়ান।

"আমর!" হযরত আলী (রা.) তাঁর এ অবাক করা আচরণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন—"মহান আল্লাহ্র নামে আমি তোমার সাথে জীবন-মৃত্যু পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলাম। কিন্তু মুখে থু থু দিয়ে তুমি আমার অন্তরে ব্যক্তিগত শত্রুতার সঞ্চার করেছ। এখন তোমাকে হত্যা করলে সেটা হতো আমার ব্যক্তিগত শত্রু হতে প্রতিশোধ গ্রহণ। কিন্তু ব্যক্তিগত শত্রুতার দরুণ আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই না। কারণ, হতে পারে আমার আল্লাহ্ এ প্রতিশোধ গ্রহণ সমর্থন করবেন না। ... প্রাণ ভিক্ষা দিলাম। নিরাপদে চলে যেতে পার।"

আমর বিন আবদূদ পরাজয় স্বীকার করার মত লোক ছিল না। ঐতিহাসিকগণ লেখেন, এটাই ছিল তার জীবনের প্রথম পরাজয়। তাই কোনক্রমেই সে এটাকে মেনে নিতে পারে না। সে এরই মধ্যে পরাজয়কে জয়ে পরিণত করার ফন্দী আঁটে। আমরকে ফিরে যেতে বলে হযরত আলী (রা.)ও চলে যেতে উদ্যত হন। কিন্তু নরাধম আমর প্রস্থান করে না। সে অলক্ষ্যে তলোয়ার বের করে কাপুরুষোচিতভাবে হযরত আলী (রা.)-এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হযরত আলী (রা.) এই আচমকা হামলার জন মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু আল্লাহ্র রাসূল (সা.) তাঁর হেফাজতের জন্য দোয়া করেছিলেন। তাই একেবারে শেষ মুহূর্তে যখন আমরের তলোয়ার এবং হযরত আলী (রা.)-এর

গর্দানের মাঝে দু'চার আঙ্গুল ব্যবধান ছিল তখন হযরত আলী (রা.) উদ্যত আঘাত সম্পর্কে অবগত হয়ে দ্রুত ঢাল পেতে দেন। আমরের আঘাত এত ক্ষিপ্রগতির ছিল যে, তার তলোয়ার হযরত আলী (রা.)-এর ঢালকে দ্বিখণ্ডিত করে দেয়। ঢালের ভগ্নাংশ হযরত আলী (রা.)-এর কানের নিকটে মাথার উপর পড়ে। এতে আঘাতপ্রাপ্ত স্থান আহত হয় এবং টপটপ করে রক্ত গড়িয়ে পড়ে।

আমর আক্রমণ করে ঢাল থেকে তলোয়ার মুক্ত করছিল। ইতিমধ্যে রাসূল (সা.) প্রদত্ত হযরত আলী (রা.)-এর তরবারী অতি দ্রুত খাপ থেকে বের হয়ে আমরের গর্দান লক্ষ্যে জোর লাফ দেয়। তরবারী স্থান পেয়েই কাজ শুরু করে। আমরের গর্দান কেটে যায়। পুরো গর্দান না কাটলেও শাহরগ ঠিকই দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। আঘাতের ভারে আমরের তলোয়ার হাত থেকে ছিটকে গিয়ে পড়ে। তার শরীরও ঢুলতে থাকে। হযরত আলী (রা.) দ্বিতীয় কোন আঘাত করেন না। প্রথম আঘাতের ফলাফল দেখেই তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, এ আঘাতই যথেষ্ট। আমরের পা জড়িয়ে যায়। হাঁটু মাটিতে গিয়ে ঠেকে। এক সময় কাটা কলাগাছের মত মাটিতে আঁছড়ে পড়ে। মদীনার মাটি তার রক্ত আকণ্ঠ চুষতে থাকে।

পরিখার ওপারে শত্রু-সৈন্যের মাঝে এমন নীরবতা নেমে আসে, যেন পুরো সেনাবাহিনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মারা গেছে। এর বিপরীতে পরিখার এপারে মুসলমানদের নারাধ্বনি আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে।

আরব রীতি অনুযায়ী যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়ে যায়। মুসলমানদের এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য ইকরামা এবং তার অন্যান্য সহযোগিদের উপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ক্ষুদ্র এ কুরাইশ দলটির জন্য লেজ তুলে পালানো ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায় ছিল না। তারা প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে লড়তে থাকে। এই সংঘর্ষে কুরাইশদের একজন মারা যায়। ইকরামা পলায়ন করতে পরিখা অভিমুখে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। পরিখা অতিক্রমের সুবিধার্থে ইকরামা বর্শা ছুঁড়ে ফেলে। খালিদ বিন আব্দুল্লাহ নামে এক অশ্বারোহী পরিখা পার হতে পারে না। তার ঘোড়া পরিখার ওপারের কিনারার সাথে ভীষণ ধাক্কা খায়। ঘোড়া আরোহীকে নিয়ে নিচে পড়ে যায়। অশ্বারোহী নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে উপরে উঠার চেষ্টা করে। কিন্তু মুসলমানরা পাথর মেরে তার চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। প্রস্তরাঘাতে জর্জরিত হয়ে সেখানেই সে মারা যায়।

॥ উনপঞ্চাশ ॥

যে স্থান দিয়ে পরিখা অতিক্রমের ঘটনা ঘটে রাসূল (সা.) সেখানে জোরদার প্রহরার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন।

পরের দিন হযরত খালিদ (রা.) অধীনস্থ বাহিনী হতে বাছাই করা কতক দুর্ধর্ষ যোদ্ধা নিয়ে পুনরায় পরিখা অতিক্রম করতে রওনা হন।

"খালিদ থামো!" আবু সুফিয়ান হযরত খালিদের মনোভাব বুঝতে পেরে বলে—"গতকাল ইকরামা বাহিনীর শোচনীয় পরিণতি দেখনি? আজ নিশ্চয় মুসলমানরা সেখানে আরো কড়া পাহারার ব্যবস্থা করে থাকবে।"

"লড়াই ছাড়াই পিছু হঁটার তুলনায় এটা কি ভাল নয় যে, তোমরা আমার লাশ আমার ঘোড়ায় চড়িয়ে মক্কায় নিয়ে যাবে?"

হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"যদি আমরা একে অপরের পরিণতি দেখে এভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হই, তবে সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন আমরা মুসলমানদের গোলামে পরিণত হব।"

"দোস্ত! আমি তোমার পথের অন্তরায় হব না" ইকরামা হযরত খালিদকে আবেগজড়িত কণ্ঠে বলে—"তবে আমার একটি কথা শুনে যাও। যদি তুমি আমার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে চলে থাক তবে যেয়ো না। আর যদি কুরাইশদের মান-মর্যাদা বিবেচনায় যেতে চাও তবে অবশ্যই যাও।"

মদীনায় যাবার পথে আজ হযরত খালিদ (রা.)-এর সেদিনের কথা পুনরায় মনে পড়ে। পরিখা অতিক্রম করুক বা না করুক উভয় অবস্থায় মৃত্যুই তার অনিবার্য পরিণতি হওয়া সত্ত্বেও কোন্ আকর্ষণে সেদিন তিনি পরিখা অভিমুখে রওনা হন-এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর সেদিনও তার কাছে ছিল না এবং আজও নেই।

৬২৭ খৃস্টাব্দের ১৬ মার্চ। দিনের তৃতীয় প্রহর; অপরাহ্ন। হযরত খালিদ (রা.) বাছাই করা কতক অশ্বারোহী নিয়ে পরিখার দিকে এগিয়ে যান। তিনি পরিখা অতিক্রম করতে একটু দূর হতে ঘোড়া ছুটিয়ে দেন। কিন্তু গোপন ঘাঁটিতে অবস্থানরত মুসলিম প্রহরীরা বৃষ্টির মত তীর বর্ষণ শুরু করে। হযরত খালিদ (রা.) পূর্ণশক্তিতে লাগাম টেনে ধরেন। ঘোড়া প্রচণ্ড ঝাঁকি দিয়ে পরিখার ঠিক কিনারায় এসে জোরে ব্রেক কষে। হযরত খালিদ (রা.) ঘোড়া পশ্চাৎমুখী করেন এবং তীরন্দাজদের ডেকে পাঠান। তিনি এভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন যে, তীরন্দাজ বাহিনী মুসলমানদের প্রতি অঝোর ধারায় তীর বর্ষণ করলে তারা

মাথা উঁচু করতে সক্ষম হবে না। আর এই ফাঁকে তিনি পরিখা অতিক্রম করে যাবেন। কিন্তু মুসলমানরা দ্বিগুণ হারে তীর চালাতে থাকে। পরিখার ওপারের মেঘ যেন এপারে তীরের বৃষ্টি বর্ষণ করে চলে। মুষলধারায় তীর-বৃষ্টি হযরত খালিদের পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে দেয়। ব্যর্থ, হতাশ আর ভগ্নাহত হৃদয়ে তাঁকে ফিরে আসতে হয়।

হযরত খালিদ (রা.) দমবার পাত্র নন। একবার ব্যর্থ হলেও পুনরায় ঝুঁকি গ্রহণের পরিকল্পনা করেন। তিনি এমনভাবে অশ্বারোহীদের সেখান থেকে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যান, যেন পরিখায় আর কোন আক্রমণের পরিকল্পনা তাঁর আদৌ নেই। উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিকদের মধ্যে ইবনে হিশাম এবং ইবনে সা'দ লেখেন, এটা ছিল হযরত খালিদ (রা.)-এর এক নয়া চাল। তিনি চলতে চলতে অধীনস্থ বাহিনী হতে নিজের সাথে আরো কিছু অশ্বারোহী বৃদ্ধি করে নেন। তাঁর ধারণা, তাদের এভাবে চলে যেতে দেখলে মুসলিম প্রহরীরা এদিক-ওদিক চলে যাবে। একটু পর তিনি অকুস্থলে দৃষ্টি ফেললে সেখানে একজনও তার গোচরীভূত হয় না। তিনি দ্রুত অশ্বারোহীদের পরিখামুখী করে অপেক্ষাকৃত সরু স্থানে গিয়ে বাতাসের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দেন।

হযরত খালিদ (রা.)-এর এই অভিনব চাল এতটুকু কার্যকর হয় যে, তার তিন-চার অশ্বারোহী পরিখা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। হযরত খালিদ (রা.) ছিলেন সবার আগে। মুসলমান প্রহরীরা মুহূর্তে তাদের ঘিরে ফেলে। ওপারে যে সমস্ত অশ্বারোহী পরিখা অতিক্রমের অপেক্ষায় ছিল এপার থেকে মুসলিম সান্ত্রীরা তাদের প্রতি এমন বিরতিহীনভাবে তীর বর্ষণ করে যে, তাদের অগ্রযাত্রা রুদ্ধ হয়ে যায়। তারা আর এগুতে পারে না। হযরত খালিদ (রা.) ও তাঁর সাথীদের জন্য মুসলমানদের ঘেরাও হতে বের হওয়া দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। এটা ছিল বাঁচা-মরার লড়াই। হযরত খালিদকে এদিক-ওদিক ঘোড়া ছুটিয়ে এবং বারবার স্থান পরিবর্তন করে এ ভয়াবহ লড়াই লড়তে হয়। তাঁর সাথীরাও ছিল যথেষ্ট অভিজ্ঞ এবং স্বাচ্ছন্দময়। অসীম সাহসিকতা আর অপূর্ব ভঙ্গিমায় তারা লড়ে যায়। মুসলমানদের হাতে একজন মারা যায়। হযরত খালিদ (রা.) ক্রমে কোণঠাসা হয়ে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ শুরু করেন। তাঁর হাতে কয়েকজন মুসলমান আহত হয়। পরে তাদের একজন শাহাদাত বরণ করেন। এক পর্যায়ে তিনি পালাবার সুযোগ পেলে তাঁর ঘোড়া পরিখা অতিক্রম করে চলে আসে। আর সাথীদের মধ্যে যারা জীবিত ছিল, তারাও পরিখা পার হতে সক্ষম হয়।

এরপরে কুরাইশদের আর কেউ পরিখা পার হওয়ার সাহস করেনি। ইকরামা এবং হযরত খালিদের ব্যর্থতার পর বহুজাতিক বাহিনীর মাঝে পূর্ব হতে বিদ্যমান হতাশা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। খাদ্যশস্য চলে গিয়েছিল শূন্যের কোঠায়। কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের সর্বাধিনায়ক আবু সুফিয়ান অনেক পূর্বেই আশা ছেড়ে দেয় এবং যুদ্ধ হতে হাত-পা গুটিয়ে নেয়। হযরত খালিদ (রা.), ইকরামা ও সফওয়ান বহুজাতিক বাহিনী যে সদা সচেতন, তৎপর ও উজ্জীবিত তা প্রকাশ করতে চাতুর্যপূর্ণ এ মহড়া অব্যাহত রাখে যে, মাঝে মাঝে পরিখার নিকটে গিয়ে মুসলিম সেনা ছাউনিতে তীর বর্ষণ করে। এর সমুচিত জবাব দিতে মুসলমানরাও পরিখার কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ সৈন্য সমাবেশ ঘটায়। তাঁরা তীরের জবাব তীর দ্বারা প্রদান করে। এভাবে তীর চালাচালি মাত্র একদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে।

॥ পঞ্চাশ ॥

কুরাইশ, গাতফানসহ অন্যান্য গোত্র যে মুহাম্মাদ (সা.)-কে পরাজিত করতে আসে, তিনি কোন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন না। তিনি ছিলেন আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এক গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম এবং পবিত্র রেসালাতের দায়িত্ব দিয়ে প্রদান করেন। রাসূল (সা.) আল্লাহ্র কাছে সাহায্যের দরখাস্ত করেছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে সাহায্য না করে কিভাবে নিরাশ করতে পারেন। এদিকে মদীনায় মুসলমানদের স্ত্রী-পরিজন, সন্তান-সন্ততি দিন-রাত সফলতা এবং পরিত্রাণের প্রার্থনায় রত। এত দুয়া কিভাবে ব্যর্থ হবে?

৬২৭ খৃস্টাব্দের ১৮ মার্চ। মঙ্গলবার। মদীনার আবহাওয়ায় আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে। চারদিকে নিস্তব্ধতা নেমে আসে। বাতাস থেমে যায়। শীত শীত অনুভূত হয়। সব মিলিয়ে নান্দনিক পরিবেশ, থমথমে অবস্থা। কিন্তু এটা ছিল ঝড়ের পূর্বাভাস। তুফানের সিগন্যাল। হঠাৎ পৃথিবী অন্ধকারে ছেয়ে যায়। ঘূর্ণিঝড় শুরু হয়। বায়ু এত বেগে প্রবাহিত হয় যে, তাঁবু দোল খেতে থাকে এবং উড়ে যাবার উপক্রম হয়। বাতাসের ঝাপটা বড়ই শীতল। আঁধারের তীব্রতা এবং বজ্রধ্বনিতে ঘোড়া, উট ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে রশি ছেড়ার উপক্রম হয়।

মুসলিম ক্যাম্প সালা পাড়ার সংলগ্ন এলাকায় ছিল। যার ফলে ঘূর্ণিঝড় কুরাইশদের মত তাদের পর্যুদস্ত করে না। মক্কার সৈন্যরা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ছিল। ঘূর্ণিঝড় তাদের রসদ-সামগ্রী উড়িয়ে নিয়ে যায়। তাঁবু উৎক্ষিপ্ত কিংবা মুখ থুবড়ে পড়েছিল। নেতৃস্থানীয় এবং সাধারণ সৈন্য সকলেই ব্যক্তিগত বস্ত্র গায়ে জড়িয়ে নিথর-অসাড় বসে ছিল। তাদের জন্য ঘূর্ণিঝড় খোদার গজব হয়ে দেখা দেয়। থেকে থেকে বিকট বজ্রধ্বনি তাদের কানে শেলের মত আঘাত হানছিল।

আবু সুফিয়ান এই মহাদুর্যোগ সহ্য করতে পারে না। সে উঠে পড়ে কিন্তু ঘোড়া খুঁজে পায় না। নিকটে একটি উট শুয়ে আরাম করছিল। আবু সুফিয়ান তার পিঠে চড়ে বসে। উটকে দাড় করায়। ঐতিহাসিক ইবনে হিশামের বর্ণনামতে আবু সুফিয়ান যাবার সময় চিৎকার করতে থাকে—"কুরাইশগণ! ...গাতফান সম্প্রদায়! কা'ব বিন আসাদ তোমাদের সাথে প্রতারণা করেছে। ঘূর্ণিঝড়েও আমরা দারুণভাবে বিধ্বস্ত। এখানে অবস্থান করা আত্মঘাতির শামিল। মক্কায় ফেরৎ চল।...আমি চলে যাচ্ছি।... আমি চললাম।"

সে কারো উত্তর বা কোন কিছুর অপেক্ষা করে না। একাই উট মক্কাপানে হাঁকিয়ে দেয়।

আজ হযরত খালিদের চোখে ভাসতে থাকে একটি বেদনার দৃশ্য। যে বহুজাতিক বাহিনী মক্কা ছেড়ে রওনা হলে হযরত খালিদের বুক ফুলে দ্বিগুণ হয়েছিল, তারা আবু সুফিয়ানের আহ্বানে তার পিছু পিছু ভীতু বাঘের ন্যায় দৌড়ে পালাতে শুরু করেছিল। হযরত খালিদ এবং আমর ইবনুল আসের ব্যক্তিগত ধারণা ছিল, হয়ত মুসলমানরা পিছু হঁটা সৈন্যদের উপর পশ্চাৎ হতে চড়াও হতে পারে। তাই তারা স্বীয় বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে রেখে সৈন্যদের একেবারে পশ্চাতে গিয়ে সতর্ক অবস্থান নেয়। আবু সুফিয়ান সর্বাধিনায়ক হয়েও নিরাপত্তার এদিকটা মাথায় আনে না। পলায়নের চিন্তায় সে ছিল বিভোর। মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষার্থী।

পিছু হঁটা এই বাহিনীতে তারা ছিল না যারা ইতিপূর্বে বিভিন্ন ঘটনায় নিহত হয়েছে। জীবিতদের মধ্যে একমাত্র অনুপস্থিত ছিল হযরত নুআইম বিন মাসউদ (রা.)। ঘূর্ণিঝড় চলাকালে যখন কুরাইশ সৈন্যরা ফিরে যায় তখন তিনি সুযোগ করে পরিখায় নেমে পড়েন এবং সোজা রাসূল (সা.)-এর কাছে চলে যান।

আজ হযরত খালিদ (রা.) ঐ পথ দিয়ে মদীনায় চলছেন, ক'দিন পূর্বে যে রাস্তা দিয়ে তাঁর সৈন্যরা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গিয়েছিল। দূরে শাইখাইন পাহাড় এ সময় তাঁর নজরে পড়ে।

॥ একান্ন ॥

প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ইসলামী ইতিহাসের গতি পাল্টে দেয়। বিশ্ব-ইতিহাস নতুন দিকে মোড় নেয়।

ঘূর্ণিঝড় পৃথিবীর সামনে এ বাস্তবতা তুলে ধরে যে,আল্লাহ্ সত্যপূজারীদের সাথে থাকেন।

শত্রুদের পশ্চাদপসারণ ছিল অনেকটা ঐ তৃণের মতো যা ঘূর্ণিঝড়ের তোড়ে উড়ে যায় অথচ একে অপরের কোন খবর রাখে না।

হযরত খালিদের এই আশঙ্কা ছিল যে, মুসলমানরা পশ্চাদ্ধাবন করবে। কিন্তু মুসলমানরা স্বপ্নেও এ চিন্তা করে না। স্মরণকালের ভয়াবহ এ ঘূর্ণাবর্তে পশ্চাদ্ধাবন করলে তা হিতে বিপরীত হতে পারত। আল্লাহ্ নিজেই যাদের ভাগিয়ে দিচ্ছেন তাদের পিছু নেয়াটা আদৌ বুদ্ধিমানের কাজ হত না। অবশ্য সর্বোচ্চ সতর্কতা হিসেবে রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে শত্রুদের উপর নজর রাখার জন্য কয়েকজনকে উঁচু স্থানে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়। যেন এমনটি না হয় যে, দুশমন কিছু দূর গিয়ে থেমে যাবে এবং পুনরায় সংগঠিত হয়ে ফিরে আসবে।

ঘূর্ণিঝড় আরবের মাটি এবং বালু এত পরিমাণ উড়ায় যে, সামান্য দূরের কিছুও দেখা যাচ্ছিল না। দীর্ঘক্ষণ পর তিন-চার মুসলমান অশ্বারোহী ঐ স্থান দিয়ে পরিখা অতিক্রম করে, ইকরামা এবং হযরত খালিদের ঘোড়া যে স্থান দিয়ে পরিখা পার হয়। তারা দূর-দূরান্ত পর্যন্ত যায়। উৎক্ষিপ্ত ও নৃত্যরত ধুলা-বালু ছাড়া আর কিছুই তাদের নজরে পড়ে না। তারা যাত্রাবিরতি করে কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফিরে আসে না।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে ঘূর্ণিঝড় একটু হ্রাস পায়। ঝড় থেমে যায়। আবহাওয়া স্বাভাবিক হয় এবং চোখ বহুদূর পর্যন্ত কাজ করে। দূরের দিগন্তে ভূ-পৃষ্ঠ হতে ধূলিমেঘ উঠছিল। বহুজাতিক বাহিনীর পশ্চাদপসারণ ছিল এ ধূলিমেঘের উৎস। ডুবন্তপ্রায় সূর্যের বিদায়ী কিরণে এ ধূলিমেঘ স্পষ্টরূপে দেখা যায়। ধুলার কুণ্ডলী মক্কার দিকে যাচ্ছিল। পশ্চাদ্ধাবনে যাওয়া মুসলিম অশ্বারোহী দল গভীর রাতে কেন্দ্রে ফিরে আসে।

"আল্লাহ্র শপথ!" অনুসন্ধান টিম রিপোর্ট পেশ করে—"যারা আমাদের আকীদা-বিশ্বাস ধ্বংস এবং মদীনার ইট খুলে ফেলতে এসেছিল, তারা এত ভীতি ও উদ্বেগ নিয়ে ফিরে গেছে যে, পথিমধ্যে কোথাও থামেনি। কোথাও যাত্রাবিরতি করেনি। মুসাফিররা রাতেও কি যাত্রাবিরতি করে না? সৈন্যরা কি রাতেও যাত্রা অব্যাহত রাখে?... কেবল তারাই রাখে, যারা অতি দ্রুত মঞ্জিলে পৌঁছতে চায়।"

হাদীস এবং ঐতিহাসিকদের বর্ণনার আলোকে জানা যায়, রাসূল (সা.) যখন নিশ্চিত হয়ে যান যে, শত্রুরা অতিশয় ঘাবড়ে ভেগে গেছে এবং সংগঠিত হয়ে পুনরায় ফিরে আসার কোনই সম্ভাবনা নেই, তখন তিনি তরবারী, খঞ্জর আপনাপন হোলেস্টার থেকে বের করে রেখে দেন এবং আল্লাহ্ পাকের শুকরিয়া আদায় করে গোসল করেন।

এ রাতের গর্ভ হতে যে প্রভাতের প্রসব হয়, তা মদীনাবাসীদের জন্য মহান বিজয়, অপূর্ব প্রাপ্তি আর বর্ণাঢ্য খুশী ও উৎসবের প্রভাত ছিল। দিক-বিদিক 'আল্লাহু আকবার' এবং উল্লাস ধ্বনিতে মুখরিত ছিল। সবচে' বেশী আনন্দ প্রকাশ করে নারী এবং শিশু-কিশোররা, যাদেরকে নিরাপত্তার জন্য ছোট ছোট কেল্লায় রাখা হয়েছিল। তারা বিজয়ের আনন্দে হৈ-হুল্লোড় করতে করতে কেল্লার ফটক থেকে বের হয়। মদীনার অলি-গলিতে মুসলমানরা উল্লাস-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ফেরে।

বিজয়ের এই আনন্দ উদ্‌যাপনে বনূ কুরাইযার ইহুদীরাও যোগ দেয়। রাসূল (সা.) শান্তি ও নিরাপত্তার বিনিময়ে তাদেরকে একটু ছাড় দিয়ে রেখেছিলেন। বাইরে তারা নিজেদেরকে মুসলমানদের বন্ধু বলে প্রচার করত এবং বন্ধুর মতই উঠা-বসা করত। কুরাইশদের পিছু হঁটার দরুন তারা মুসলমানদের মতই আনন্দ-উল্লাস করে। কিন্তু তাদের সর্দার কা'ব বিন আসাদ স্বীয় কেল্লায় ছিল। তার পাশে স্বগোত্রেরই অপর তিন নেতৃস্থানীয় ইহুদী বসা ছিল। সমকালীন যুগের অসাধারণ সুন্দরী ইহুদী নারী ইউহাওয়াও সেখানে উপস্থিত ছিল। কুরাইশদের পিছু হঁটে যাবার সংবাদ পেয়ে সে গতকাল সন্ধ্যায় এখানে আসে।

"মুসলমানদের উপর আক্রমণ না করে আমরা কি সঠিক কাজ করিনি?" কা'ব বিন আসাদ বলে—"নুআইম বিন মাসউদ আমাকে সঠিক পরামর্শ দিয়েছিল। চুক্তির জামানত হিসেবে সে আমাকে কুরাইশদের থেকে 'মানব জামিন' চাওয়ার কথা বলেছিল। সে এ তথ্যও জানায় যে, কুরাইশরা দ্বিগুণ সৈন্য নিয়ে এলেও পরিখা অতিক্রম করতে পারবে না। নুআইম কুরাইশ পক্ষীয় হওয়ায় আমি তার পরামর্শ গ্রহণ করি।"

"সে কুরাইশ পক্ষীয় নয়।" এক ইহুদী জানায়—"সে মূলত মুহাম্মাদের অনুসারী।"

"ইহুদীদের খোদার শপথ! তোমার কথা সত্য হতে পারে না।" কা'ব বিন আসাদ চ্যালেঞ্জের সুরে বলে—"সে কুরাইশদের সাথে এসেছিল, কিন্তু তাদের সাথে ফিরে যায়নি।"

পূর্বের ইহুদী পুনরায় জানায়—"মদীনায় গতকাল সন্ধ্যায় আমি তাকে মুসলমানদের সাথে দেখেছি। অথচ এ সময়ের মধ্যে কুরাইশ সৈন্য মদীনা ছেড়ে অনেক দূরে গিয়ে পৌঁছেছে।"

"তারপরেও তুমি কিভাবে জানলে যে, সে মুহাম্মাদের অনুসারী?" কা'ব ভরা উদ্বেগে জিজ্ঞাসা করে—"এমন কথা আমি মানতে পারি না, যা তুমি কারো থেকে শুনে নিশ্চিত হওনি।"

"এক মুসলিম দোস্তকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।" ইহুদী হার না মানার ভঙ্গিতে বলে—"নুআইমকে দেখে দোস্তকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, মুসলমানরা কি কুরাইশ যুদ্ধবন্দীদের মুক্তাবস্থায় রাখছে।... দোস্ত জবাবে জানায়, অনেক আগে থেকে নুআইম মুসলমান। সুযোগ না হওয়ায় এতদিন আসতে পারেনি। এখন সুযোগ পেয়ে চলে এসেছে।"

"তাহলে তো সে আমাদেরকে মুসলমানদের থেকে বাঁচায়নি; বরং মুসলমানদেরকে আমাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।" কা'ব বিন আসাদ বিজ্ঞের মত বলে—"তবে সে যা কিছুই করুক না কেন, তা আমাদের অনুকূলে গেছে। যদি আমরা কুরাইশদের কথা মেনে নিতাম তাহলে ...।"

"তাহলে মুসলমানরা আমাদের দুশমন হয়ে যেত।" কা'বের উক্তি কেড়ে নিয়ে আরেক ইহুদী বলে—"তুমি এটাই বলতে চেয়েছিলে কা'ব? মনে রেখ, তারপরেও মুসলমানরা আমাদের দুশমন। মুহাম্মাদের নয়া ধর্মমত অঙ্কুরেই বিনাশ করা চাই। নতুবা একদিন আমাদেরই খতম করবে মুহাম্মাদ।"

"খবর আছে, ইসলাম নামে যে ধর্মমতের উপদ্রব শুরু হয়েছে তা কত দ্রুত গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে চলেছে?" অশীতিপর তৃতীয় ইহুদী এই প্রথম মুখ খোলে—"ক্রমবর্ধমান এ পথে আমাদের ব্যারিকেড দিতে হবে। থামাতেই হবে এ ঊর্ধ্বগতি।"

"কিন্তু কিভাবে?" কা'ব চাপা উত্তেজনা প্রকাশ করে উপায় জানতে চায়।

"কতল!" অশীতিপর ইহুদী ক্রুর হেসে বলে—"মুহাম্মাদের হত্যার মাধ্যমেই কেবল তা সম্ভব।"

"এমন দুঃসাহস কে করবে?" কা'ব বিন আসাদ চমকে উঠে বলে—"তুমি বললে একজন ইহুদীও এই ঘাতক হতে পারে। যদি সে ঘটনাক্রমে ব্যর্থ হয় এবং রশি ছিঁড়ে থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়ে তবে বনূ কায়নুকা ও বনূ নযীরের পরিণামের কথা আরেকবার স্মরণ কর। বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে মুসলমানরা যেভাবে তাদের গণহত্যা করে আর যারা তাদের হাত থেকে রেহাই পায় তারা যেভাবে ঊর্ধ্বশ্বাসে দূর-দূরান্তের দেশে পালিয়ে যায় তাও মনে রাখা দরকার, না ভুলা চাই।"

"ইহুদীদের খোদার শপথ!" অশীতিপর ইহুদী চোখ বন্ধ করে দূরদর্শীর ভঙ্গিতে বলে—"আমার বিবেক তোমার থেকে বেশী না চললেও একেবারে কমও চলে না। তুমি আজ যেটা চিন্তা করছ, তা আমি এবং লাঈছ বিন মোশান অনেক পূর্বেই চিন্তা করে রেখেছি। নিশ্চিত ও নিরুদ্বেগ থাক, কোন ইহুদী মুহাম্মাদকে হত্যা করতে যাবে না।"

"তবে কে হবে এই ঘাতক?" কা'ব বিন আসাদ দ্রুত প্রশ্ন করে।

"কুরাইশ গোত্রেরই এক যুবক।" অশীতিপর ইহুদী হেলান দেয়া থেকে সোজা হয়ে বসতে বসতে জবাব দেয়, "লাঈছ বিন মোশান তাকে ট্রেনিং দিয়ে প্রস্তুত করেছে। আমার মতে, কাজটি সেরে ফেলার সময় এসে গেছে।"

যখন এর বিস্তারিত তথ্য ও পরিকল্পনা আমার জানা নেই, তখন বনূ কুরাইযার সর্দার হয়ে কিভাবে আমি তার অনুমতি দিতে পারি?" কা'ব জানতে চায়—"আবু সুফিয়ান তাকে তৈরী করেছে? খালিদ বিন ওলীদ প্রস্তুত করেছে?"

"শোন কা'ব!" অশীতিপর ইহুদী মুখে একথা বলে এবং অপ্সরীসম ইউহাওয়ার দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়।

দ্বিতীয় খণ্ডে বাকী অংশ পড়ুন

দৃষ্টি আকর্ষণ

☞ মরুভুমির বুক চিরে অশ্বেচেপে একাকী চলছেন এ মুসাফির কে? কোথায় তাঁর গন্তব্য? কেন তিনি স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন? মরুদস্যুদের এড়িয়ে তিনি কি স্বীয় গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন?

☞ আরবের নাম করা কুস্তিগীর রিকানা। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আজ পর্যন্ত তার সামনে কেউ টিকতে পারেণি...স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা:) এবার তার প্রতিপক্ষ কি হবে এ লড়াইয়ের ফলাফল ? অন্যদের মত রাসূলুল্লাহ (সা:) কি তার কাছে ধরাশায়ী হবেন ?

☞ মানুষের তাজা কলিজা মুখে পুরে চিবাচ্ছে এ কোন মহিলা? কেন তার এত আক্রোশ?... আরে তার গলায় এ কিসের মালা? মানুষের নাক এবং কানের?

☞ দশ হাজারের বিশাল বহুজাতিক বাহিনী দ্রুত ধেয়ে আসছে মদীনা অভিমুখে। ইসলাম ও মুসলমানদের তারা নিশ্চিহ্ন করতে চায়। কি হবে এখন উপায় ? প্লাবনের তোড়ে মদীনা ও মুসলমানরা ভেসে যাবে? নাকি তারা নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হবে। কিন্তু কিভাবে?

☞ স্থানে স্থানে নারীফাঁদ তৈরী করে চলেছে এ সুন্দরী কে? কি তার উদ্দেশ্য? ইসলামের বিরুদ্ধে কেন সে এত সরগরম? কারা তাকে ব্যবহার করছে?

☞ কেল্লার প্রাচীরে গা ঘেঁষে ঘেঁষে সন্দেহজনকভাবে এগিয়ে চলেছে এ লোকটি কে ? গুপ্তচর ?... সর্বনাশ! কি হবে এখন উপায়? কেল্লায় যে কোন পুরুষ নেই..... আরে কে এই বীরঙ্গনা ? ছুটে যাচ্ছে গুপ্তচরের মোকাবেলায় ! কিন্তু তার হাতে ওটা কি? সাধারণ লাঠি মাত্র? দুর্বল এক নারী সাধারণ লাঠি দ্বারা সশস্ত্র এক বীর পুরুষের মোকাবেলা করতে পারবে কি?

☞ বিশাল দৈর্ঘ্য-প্রস্থের পরিখা কাফের বাহিনীর গতিরোধ করেছে। কিন্তু তারা এ বাধা মানতে রাজি নয়। যে কোন মূল্যে পৌঁছতে চায় ওপারে। ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় কজন দুর্ধর্ষ বাহাদুর। ঘোড়া শূন্যে উড়ে চলছে! পারবে কি তারা পরিখা জয় করতে ? নির্বিঘ্নে ওপারে যেয়ে পৌঁছতে?

এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর জানতে পড়ুন 'নাঙ্গা তলোয়ার' ১।

মাকতাবায়ে এমদাদিয়া

পাঠক বন্ধু মার্কেট (আন্ডার গ্রাউন্ড)

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল ঃ ০১৭১-৩৭৮৫৩৩